

৪২ মোগল বংশ ।

১২৮৫

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত ।

১৮৭৮

"Man can be read by the heart of man. The heart is strengthened • • • • by what it hears and sees, and until it hears or sees the bad and the good, it knows neither sorrow nor joy in this world."—Tarikhu—s Subuktigin.



কলিকাতা,
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
প্রকাশিত ।

১৩১১ ।

১০১৮-৯

৯৫৪.০২১

১৮ ৫৭

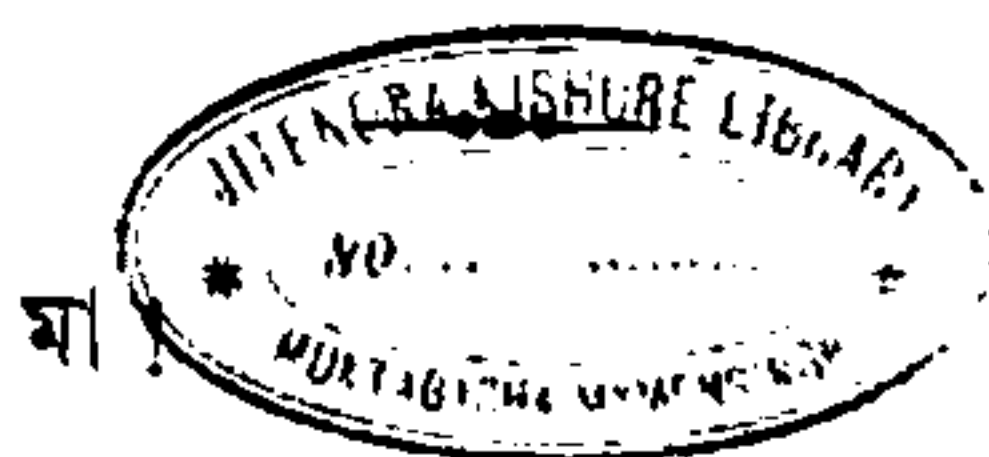
কলিকাতা,

৬নং কলেজ-স্কোয়ার,

সাবা-বয়ে প্রিন্টিং-প্রেসে প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ।



উৎসর্গ ।



সেবকের অর্থ্য গ্রহণ কর ।

কেদারপুর ।

৫ই শ্রাবণ,

১৩১১ ।

ভূমিকা ।

ভারতবর্ষে মোগলগণ কিঞ্চিদূর সার্কি দুইশত বৎসর রাজত্ব করেন । মোগল বংশোদ্ভব বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে মোগল শাসনের সূত্রপাত করেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মোগল সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সূচনা হয় । ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় । এই যুদ্ধের পরে দেশ মধ্যে অরাজকতা পরিণাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং মোগল শাসন বিলুপ্ত হয় ।

মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস ঘটনা বৈচিত্র্যে অতি মনোহর । এই ইতিহাসের অনুশীলন করিলে মহৎ জীবনের সাহচর্য্যে হৃদয় প্রশস্ত এবং নানারূপ লোক চরিত্র এবং ঘটনার পর্যালোচনায় চিত্তের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় । যে সকল কারণ পরম্পরায় মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে কার্য্য কারণ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির সার-তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয় । মোগল-ইতিহাস আমাদের কাছে এই শিক্ষা দেয় যে, স্বজাতি-প্রেম ও স্বার্থত্যাগই জাতীয় উন্নতির মূল, এবং তাহার অভাবেই জাতীয় অবনতি অবশ্যজ্ঞাবী ।

অন্য একটি কারণেও মোগল-ইতিহাস আমাদের প্রাণধান যোগ্য । ভারতবর্ষ এখন হিন্দু মোসলমানের দেশ ; এই অধঃপতিত ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন জন্য হিন্দু মোসলমানের সম্মিলন আবশ্যিক । কিরূপে হিন্দু মোসলমানকে প্রীতিমূর্ত্ত্রে আবদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহা একটি গুরুতর সমস্যা । পরম্পরের ইতিহাস অনুশীলন আমাদের অভীক্ষিত সম্মিলনের

উপায় বলিয়া নির্দেশ করা হইতে পারে। কিন্তু মোসলমানের
কর সম্বন্ধে পরামর্শের প্রার্থনা হইলে, সম্বলগত পণ্য প্রদত্ত
হইতে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু যদি মনে হয় যে, মোসলমান
সম্রাট
প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষিতর অর্থাৎ ছিল না, এবং তাহারা স্বাভাবিক
উন্নতি ও নতুন পথে দিকের লক্ষ্য রাখিয়াই অধিকাংশ দলে রাজকাৰ্য্য নিৰ্বাহ
করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মোসলমানের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষ কাবের
পরিবর্তে হ্রাস দেখা যাইত।

চতুর্থ বিষয়, বঙ্গভাষার মোগল রাজত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত পরিচালনা
সাধিত হইতেছে না। কতিপয় বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত হরিসাধন
মুখোপাধ্যায় মহাশয় মোগল সম্রাটগণ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ বাসিন্দা-কাগজে
প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিসাধন দাবী বাতীত অন্য কোন বঙ্গীয় লেখক
মোগল সম্রাটগণ সম্বন্ধে দাবী বাতীত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া
আমার জানা নাই।

পাঁচ বৎসর পূর্বে কোন এক উপলক্ষ্যে আমার মনে মোগল রাজত্ব
সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা হইত। অতীত উপস্থিত হয়। কলিকাতা
শক্তি সামগ্রী, ভাষা ইত্যাদি এক প্রকার লিপিকা প্রকাশিত হয়। মোগল
চরিত্রের তালিকার আদি ১৩০৭ সন হইতে "সাহিত্য", "উৎসাহ", "আলোচনা"
ও "বাক্য" মোগল সম্রাটগণ সম্বন্ধে সমস্ত সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া
একপে সেই সকল প্রবন্ধ পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া "মোগল বংশ"
নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি কতিপয় সঙ্গীর সহায় হইতে সন্মত হইয়া
লাভ করিয়াছি। "সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সরকার
মহাশয় তাহা বিত্ত ও পরিচালিত করিয়া তৎকাল অধিকাংশ প্রবন্ধ
দেখিয়া দিয়াছেন। হারবর্ড নর্থল্যান্ড স্কুলের কেন্দ্র হাউস শ্রীযুক্ত বিদ্যেশ-

নাথ নিরোগী বি, এ, মহাশয় এবং টাঙ্গাইল বাণিকা বিজ্ঞানস্নেহ হেভ
 পা ৫৬ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ মহাশয় কোন কোন প্রবন্ধের পারি
 পাট বিধান অন্য যত্ন করিয়াছেন। “বাকুবের” সহকারী সম্পাদক
 শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় “মোগলের অধঃপতন” শীর্ষক প্রবন্ধের
 প্রথম অংশ দেখিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম ইন্টার-
 প্রেটরি কান্সি জজ্জল্ হক বি, এল, সাহেব প্রথম দুইটি প্রবন্ধের
 নামবাচক শব্দগুলির বর্ণবিভাগ বিধানে আমার সহায়তা করিয়াছেন।
 ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট রেন্জিট্টার মৌলবী আবদুল বাছেদ বা
 সাহেব সুস্তাখবুল লুঘাব নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের কোন কোন স্থানের
 অনুবাদ করিয়া উক্ত গ্রন্থ হইতে আমার উল্লেখ সংগ্রহ করিবার সুবিধা
 করিয়া দেন। টাঙ্গাইলের উকীল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার মহাশয়
 আকবর শাহ সংক্রমে দুই একটি তথ্যের সন্ধান বলিয়া দিয়া বহু পুরাতন
 দুই খণ্ড ধর্মতত্ত্ব আমাকে অর্পণ করেন। ময়মনসিংহের সুল সমূহের
 সবটনম্পেক্টর শ্রীযুক্ত মধুরানাথ গুহ মহাশয় গ্রন্থের মুদ্রণ তত্ত্ব উদ্ভোগ
 হইয়া প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সকল সজ্জন আমাকে
 অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের নিকট প্রাণের
 গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রবন্ধগুলি মাসিক কাগজে প্রকাশিত হইবার সময় সমালোচকগণ
 • অস্বকূল মন্তব্য দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদের
 উৎসাহ লাভ করিতে না পারিলে আমি আরও কাঁচা সম্পূর্ণ করিতে
 পারিতাম কি না সন্দেহ।

এই গ্রন্থে বহু স্থানে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে। গ্রন্থকার মফঃস্বলবাসী,
 এ কারণেও নানা দোষ সংঘটিত হইয়াছে। মফঃস্বলে বসিয়া ঐতিহাসিক
 গ্রন্থ সংগ্রহ করা দুর্লভ ব্যাপার। অনেক সময় যথোপযুক্ত অর্থ ব্যয়

সংশোধনীর প্রকৃষ্ট সংগ্রহ সংগ্রহে পানি নাই। একই কান
ন ইচ্ছাকৃতরূপে তাই নিষিদ্ধ হইলে পানি নাই। একই
সংগ্রহে বহু নুতন প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।
এই কারণে পানি নাই, এ কারণে সংশোধন পত্র দেওয়া

পরিশোধন নিশ্চয় এই যে, আমি বর্ণিত বিষয়গুলি সত্যাকার
ও জনসংগী কান বহু বহু ও পরিশোধন করা করি নাই, ও
সংগ্রহের প্রকৃষ্ট প্রকৃষ্টই সংগ্রহ বহু ও পরিশোধন সত্যক জ্ঞান বহু
অন্যতঃ বিস্তারিত।

কেন্দ্রপুত্র, টাঙ্গাইল।
ই প্রকৃষ্ট, ১৩১১ সাল।

স্বীকৃত প্রাণ ও প্র

সংশোধন।

চাচাচীরা শির্ষক অবস্থার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ১ম লাইনে "অবস্থাপ্রাপ্তি
হইল"র স্থানে "বোধপূরাধিপতির হইল" হইবে।

যে সকল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা
হইয়াছে, তৎসমুদয়ের নাম ।



Tabakta Nasiry. (Translated into English by G. H. Ravery.)

Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. VII.

Journals of the Asiatic Society.

Elliot's History of India, Vols. III—VIII.

Riaz-us-Salatin. (Persian Text.)

Stewart's History of Bengal.

Oriental Annals, 3 Vols.

Todd's Rajsthan.

Wheeler's History of India.

Ain-i-Akbari. (Translated into English by Francis Gladwin.)

Munta Khabu-Ilubab. (Persian Text.)

Stanley Lane Poole's Babar.

Dow's History of Hindustan.

Keene's Turks in India.

Akbarnanama. (Translated into English by H. Beveridge.)

Erskine's Babar and Humayun, Vol. I.

Elphinstone's History of India.

Malleson's Akbar.

Malleson's History of Afghanistan.

Stanley Lane Poole's Mediæval India.

R. C. Dutt's Ancient India.

Bernier's Travels.

Orm's Historical Fragments.

Stanley Lane Pool's Aurangzeb.

Marshman's History of India.

Keen's Fall of the Moghul Empire.

Duff's History of the Maharattas.

Cunnigham's History of the Sikhs.

Seir Mutakherin. (Translated into English by
Hazi Mustafa)

Beveridge's (A. S.) Emperor Akbar.

P. N. Bose's Hindu Civilisation during British Rule.

সাহিত্যে প্রকাশিত হরিসাধন বাবুর শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব
সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী ।

মোলবী আব্দুল করিম, বি, এ, প্রণীত মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত ।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত আখ্যকীর্তি ।

সাধনা, তৃতীয় বর্ষ ।

উৎসাহ, ১ম বর্ষ ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস ।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত ভারতের ইতিহাস ।

বন্দ্যোপাধ্যায় (পাক্ষিক পত্র, নববিধান সমাজ) ।



সূচীপত্র !

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ	...	...	১
তৈমুরলঙ্গ	...	...	৩৭
বাবর	...	...	৭৩
ইমামুন ও শেরশাহ	...	...	১০৬
আকবর শাহ	...	...	১৫১
জাহাঙ্গীর	...	...	২০৭
শাহজাহান	...	...	২৪৬
আলমগীর	...	...	২৭২
মোগলের অধঃপতন	...	...	৩০৭
মোগল সাম্রাজ্য	...	...	৩৬২

পরিশিষ্ট ।

আবুল ফজল	...	...	১
নিজাম উদ্দীন	...	...	১১
বদায়ুনি	...	...	১৭
ফেরিষ্টা	...	...	২২
খাফি খাঁ	...	...	৩০
গোলাম হোসেন	...	...	৩৪



চেঙ্গিস খাঁ ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ ।

উত্তর পশ্চিম এশিয়ার সুবিশাল ভূখণ্ডের সংখ্যাভীত অধিবাসীদিগকে ইউরোপীয়ান ইতিহাসবিদগণ সাধারণতঃ তুর্কি, তাতার এবং মোগল নামে অভিহিত করিয়া থাকেন । কিন্তু এই ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ ধর্ম ভাষা ও আচার ব্যবহারে পরস্পর বিরোধী তিনটির অধিক জাতি এবং অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত । যদিও স্বর্ণযুগের কাল হইতেই তাহারা দক্ষিণ এশিয়ার বহু-প্রান্ত জনপদ সমূহে দৈব বিপদের ভ্রায় পতিত হইয়া দেশ ছাড়বার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছে, অথবা কোন কোন বিজিত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে ; তথাপি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে ইহাদের কাহারও স্থায়ী অভ্যুদয় এবং প্রবল প্রতাপ সংঘটিত হয় নাই । খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর পশ্চিম এশিয়ার কোন কোন স্থানের অধিবাসী খলিফা সাম্রাজ্যে প্রথম প্রবেশ লাভ করে । তদবধি তাহারা পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, এবং সভ্যতা লাভ করে । কিন্তু তখনও এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসীই অসুন্নত ছিল । প্রাকৃতিক অভ্যুদয়ের নানাধিক দেড় শত বৎসর পরে চেঙ্গিস খাঁ মোগল জাতির বরলাস বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি এশিয়ার সুবিস্তৃত অংশ মণ্ডিত করিয়া সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপ কল্পিত করিয়া

ভুলেন । তারপর তদীয় পৌত্র হালাকু খলিফা সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন । (১)

আমরা চেন্সিস থা ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের বিবরণ পাঠক-বর্গকে উপহার দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি । কিন্তু এই বিবরণ বিশদ করিবার জন্য তাঁহার পূর্ব পুরুষগণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যিক ।

মোসলমান ইতিহাস বিদগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, পয়গম্বর নোয়া সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন । তাঁহার তিন পুত্র ছিল । মহাত্মা নোয়া শাসন-সৌকার্য্যার্থ আপনার দিগন্ত-বিস্তৃত সাম্রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্রত্রয়কে প্রদান করেন ।

তদনুসারে তৃতীয় পুত্র ইয়াকেস আধুনিক চীন, তুর্কিস্তান ও অক্সাস নদী বিধৌত প্রদেশের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া ভলগা নদীর তীরে রাজধানী স্থাপিত করেন । তুর্কি জাতি এই ইয়াকেসকে তাহাদের আদি পুরুষ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে ।

ইয়াকেসের আট (কাহারও কাহারও মতে এগার) পুত্র ছিল । ইয়াকেসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম তুর্ক । তুর্ক পিতৃ রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার পূর্বক উষ্ণ ও শীতল প্রান্তরপ্রদেশে অতিষিক্ত ও নরনাতিরাম শ্যামল ক্ষেত্রে শোভিত সিল-উক নামক স্থানে রাজধানী সংস্থাপিত করেন । তুর্কের অধিকৃত প্রদেশ তাঁহার নামানুসারে তুর্কিস্তান আখ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তদেশবাসিগণ তুর্কি বলিয়া প্রিন্সিপাল করিয়াছে ।

(১) মোহাম্মদ বর্দ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশ দ্বীপ শাসনাধীন করেন । তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ খলিফা নামে পরিচিত । তাঁহাদের আধিপত্য সুবিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । প্রথমতঃ মদিনার খলিফাদের রাজধানী ছিল, তারপর উহা ক্রমান্বয়ে ডামস্কাস ও বোগদাদে স্থানান্তরিত হয় ।

তুর্কের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের নাম অলিঙ্গা খাঁ । প্রথমে তাঁহার কোন পুত্রসন্তান হয় না । কিন্তু অবশেষে দুই যমজ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার গৃহ আলোকিত করিয়াছিল । অলিঙ্গা খাঁ বৃদ্ধ বয়সে পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া প্রকুরচিত্তে তাহাদিগকে তাতার খাঁ ও মোগল খাঁ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । পুত্রদ্বয় বয়সপ্রাপ্ত হইলে স্বরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে অর্পণপূর্বক জীবনের সারাছুকালে বিশ্রাম-স্থলসম্বোধে প্রবৃত্ত হন । ভ্রাতৃদ্বয় রাজ্যলাভ করিয়া একযোগে শাসন-কার্য্য নির্বাহ করিতেছিলেন ; কিন্তু কতিপয় বৎসর পরে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ব-স্ব-নাযানুসারে তাতার-আই-মাক ও মোগল-আই-মাক নামক দুইটি স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করেন ।

মোগল খাঁর অধস্তন নবম পুরুষ ইল খাঁর সমসময়ে তুর নামক একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন । পররাজ্যলোলুপ তুর ইল খাঁকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিবার মনন করেন । তাতার ও মোগল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করিলে, উভয় বংশে পুরুষানুক্রমে শত্রুতা চলিতেছিল । রাজা তুর, ইল খাঁকে আক্রমণ করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, তাতারবংশীর অধিপতি মুঙ্গ খাঁ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন । মোগলের একাধিক পুত্র ছিল । তাঁহার অনেক পুত্র ইগুর নামক এক স্বতন্ত্র বংশের প্রতিষ্ঠা করেন । ইগুর জাতিও জাতিশত্রুবিশেষের জন্য রাজা তুরের দলভুক্ত হইল । রাজা তুর বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে ইল খাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । মোগল জাতি ইল খাঁর একান্ত অনুরক্ত ছিল ; তাহারা শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিল । যুদ্ধক্ষেত্রে বহুসংখ্যক তাতার ও ইগুর যোদ্ধা শত্রুহস্তে জীবনবিসর্জন করিল ; রাজা তুর সৈন্যে রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন । মোগল সৈন্য শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন

করিল । এই সূত্রে মোগলের সর্বনাশ সাধিত হইল । রাজা তুর
মোগলদিগকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যেই পলায়ন করিয়াছিলেন ।
মোগল সৈন্য শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন জন্ত আপনাদের সুদৃঢ় অবস্থানভূমি পরি-
ভ্রমণ করিয়া বাহভঙ্গ করাতে দুর্বল হইয়া পড়িল । এই সুযোগে
শত্রুসৈন্য নিশাবসানে অতর্কিতভাবে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল ।
মোগল সৈন্য এই আকস্মিক আক্রমণের গতির প্রতিরোধ করিতে না
পারিয়া শত্রুহস্তে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল । কেবলমাত্র ইল খাঁর পুত্র
কারআন খাঁ ও শ্রালকপুত্র নগুজ খাঁ সঙ্গীক অন্তত ছিলেন বলিয়া শত্রু-
হস্ত হইতে নিস্তার পান । মোগল খাঁর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ আওজ
খাঁয় পিতৃব্যদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করায় তাঁহারা চীন রাজ্যে আশ্রয়
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তুর কর্তৃক সমস্ত মোগলবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া-
ছিল ; সুতরাং আধুনিক মোগল জাতি আওজের পিতৃব্যগণ, কারআন
খাঁ ও নগুজের বংশোদ্ভব ।

রাত্রি সমাগত হইলে এই চারি জন পুরুষ (কারআন খাঁ ও
তাঁহার স্ত্রী, এবং নগুজ ও তাঁহার স্ত্রী) ধন রত্ন ও গোমেষপাল লইয়া
পার্ব্বর্তী পর্বতে পলায়ন করিলেন । তাঁহারা দূরারোহ পথে নিরাপদ
স্থানে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক শস্ত্ররাজিস্থশো-
ভিত উপত্যকায় উপনীত হইলেন, এবং উহার প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ
হইয়া তথায় বাসভবন নির্মাণ করিলেন । এই স্থানে কারআন ও নগু-
জের বংশ কালক্রমে অত্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করাতে বহু শাখায় বিভক্ত
হইয়া পড়িল, এবং তথায় আর স্থানসমুদয় হইল না । আবুল ফজলের
মতানুসারে দুই সহস্র বৎসর ও আবুল গাজির মতানুসারে চারি শত
বৎসর মোগলগণ এই স্থানে বাস করিয়াছিল ।—কোন মত যথার্থ, তাহা
নির্ধার করিবার কোন উপায় নাই । এ জন্ত মোগল জাতি ইরগানাকুন

উপত্যকা (১) (এই উপত্যকায় তাহারা বাস করিতেছিল) পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল । তাহাদের পূর্বপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া ইরগানাকুন উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল, ভূকম্পনে তাহা রুদ্ধ হওয়ার নূতন পথ আবিষ্কার করিতে তাহাদিগকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । তাহারা নবাবিষ্কৃত পথে কিয়দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, লৌহ আকরে উহা রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । যাহা হউক, মোগলগণ অগ্নিসংযোগে পথ পরিষ্কার করিয়া পৈতৃক রাজ্যে উপনীত হইল । (২) এই সময় মোগলভূমি তাতার-আই-মাক জাতির হস্তগত ছিল । আগন্তুক মোগলগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনর্বার মোগলভূমি অধিকার করেন । মোগল খাঁর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ আশুজের পিতৃব্যবংশীয়গণও চীন রাজ্য হইতে মোগলভূমিতে উপনীত হইয়া কারআত (কারআন) ও ছরলাগিন (নগুজ) মোগলের সহিত সম্মিলিত হইল । মোগলগণের পৈতৃক রাজ্যে কিরিয়া আসিবার সময় তাহাদের অন্ততম শাখার অধিনেতৃপদে ইয়ালদাজ খাঁ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । আবুল ফজলের মতে ইয়ালদাজ খাঁ পারস্যের সুবিখ্যাত স্তায়পরায়ণ অধিপতি নোশেরওয়ার

(১) The mountains referred to are evidently those mighty ranges towards the sources of Salinga and its upper tributaries. Major H. G. Raverty.

(২) মোগলগণ ইরগানাকুন হইতে বহির্গত হইবার দিন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতি বৎসর উৎসব করিয়া থাকে । এই উপলক্ষে মোগলবংশীয় অধিপতিগণ অগ্নিকূণ্ডে এক খণ্ড লৌহ উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া থাকেন । ইরগানাকুন হইতে বহির্গত হইবার সময় মোগলগণ লৌহআকররুদ্ধ পথ অগ্নিসংযোগে পরিষ্কার করিয়াছিল । এই ঘটনার অনুরূপেই মোগল অধিপতিগণ এইরূপ অনুষ্ঠান করেন । কিন্তু কোন কোন ইতিহাসবেত্তা ইহার মন্তব্য ক্রমব্রজম করিতে অসমর্থ হইয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে, চেঙ্গিস খাঁ প্রথমে খিতা রাজ্যে লৌহকর্মকারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়াই মোগল অধিপতিগণ ঐদৃশ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ।

রাজত্বের সময় পৈতৃক বাসভূমি পুনর্বার অধিকার করিয়াছিলেন । নোশেরওয়া ৫৩১ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । নোশেরওয়ার রাজত্বকালে (খৃঃ ৫৭৮) পয়গম্বর মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়া আরবদেশ পবিত্র করেন । মহম্মদ তাদৃশ জন্মপরায়ণ ভূপতির রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করাতে, আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করিতেন ।

এই সময় মোগলজাতি বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল । তাহারা স্ব স্ব প্রধান ছিল, একে অন্নের আধিপত্য স্বীকার করিত না । মৃগয়ালব্ধ মাংস ও অনাদ্যসম্বৃত মৎস্যই তাহাদের আহাৰ্য্য ছিল । গৃহপালিত ও বন্য পশুর চৰ্ম্ম ও লোম দ্বারা তাহারা গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিয়া লজ্জা-নিবারণ করিত । ফলতঃ, তখন মোগলগণ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল ; সভ্যতার জ্যোতিঃ তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই ।

ইরানদাজ খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জুইনা বাহাদুর পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন । জুইনা বাহাদুরের আলানকোওয়া নামী এক সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল । তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র হুবুন এই কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন । পিতার জীবদ্দশায় এই বিবাহের ফলস্বরূপ দুইটি পুত্রসন্তান লাভ করিবার পর আলানকোওয়া বিধবা হন । জুইনা বাহাদুরের মৃত্যুর পর আলানকোওয়ার পুত্রদ্বয় তদীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন । তাঁহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া আলানকোওয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন ।

আলানকোওয়া পত্যস্তর গ্রহণ করেন নাই । একদা রাত্রিকালে তিনি নিদ্রাভিভূত ছিলেন । তখন এক অপূৰ্ণ রশ্মিমালা তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া সৰ্ব্বদা আচ্ছন্ন করাতে তিনি সসজ্জা হইলেন ।

চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ । ৭

এই সংবাদ প্রচারিত হইলে মোগলগণ ভৎকথিত বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার দুর্নাম রটনা করিতে লাগিল । যাহা হউক, নির্দিষ্টকাল সমাপ্ত হইলে আলানকোওরা এককালে তিনটি পুত্র প্রসব করিলেন । কালক্রমে এই পুত্রত্রয়ের সর্বকনিষ্ঠ বুজঙ্গর খাঁ মোগলিহানের একাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন । (১)

বুজঙ্গর খাঁর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষের নাম তোমনাই খাঁ । তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন । প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । দ্বিতীয়টির দুই যমজ পুত্র ছিল ; একের নাম কাবাল ও অন্দের নাম কাছুনি ।

একদা কাছুনি রাজ্যযোগে এক অপূর্ণ স্বপ্ন দেখিলেন । কাবাল খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে ক্রমাগত তিনটি জ্যোতির্গগন নক্ষত্র নির্গত হইয়া নির্লীণ প্রাপ্ত হইল । চতুর্থবার একটি অত্যাশ্চর্য্য উজ্জল নক্ষত্র তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া আলোকচ্ছটার সমস্ত দিগ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিল, এবং তাহার অতুচ্ছল প্রভার অন্তান্ত তারকা উজ্জলতর হইল । এইরূপ প্রভাদীপ্ত তারকামালা দ্বারা আকাশের প্রত্যেক বিভাগ আলোকিত হওয়াতে পূর্বোক্ত অত্যাশ্চর্য্য উজ্জল নক্ষত্রের অন্তর্দ্ব্যানের পরও পৃথিবী সমুজ্জল রহিল । ইহার পর কাছুনির নিদ্রাভঙ্গ হইল । অত্যন্ত কাল পরেই তিনি পুনর্বার নিদ্রাভিভূত হইলেন । তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন, এবার তাঁহার নিজের বক্ষঃস্থল হইতে সাতটি নক্ষত্র ক্রমাগত

(১) এই অসম্ভব গল্প কেন কল্পিত হইয়াছিল ? সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেজর রায়চাঁদ্রটি নির্দেশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ইতিহাসবেত্তা এই ঘটনা বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । বুজঙ্গর খাঁর বংশেই চেঙ্গিস খাঁ জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার জীবনবৃত্ত পৰ্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি আপনাকে দৈববলশালী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য সন্দেহা বহুবান ছিলেন । উত্তরকালে যে সময় চেঙ্গিস খাঁ উন্নতির চরম সীমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন দেবান্বিত বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য, এইরূপ অসম্ভব গল্প কল্পিত হইয়াছিল ।

বহির্গত হইয়া অদৃশ্য হইল । অষ্টমবার একটি বৃহদায়তন নক্ষত্র বহির্গত হইয়া আলোকচ্ছটার সমগ্র পৃথিবী উদ্ভাসিত করিল । তাহার পর এই বৃহদায়তন নক্ষত্র হইতে কতিপয় ক্ষুদ্র তারকা সমুদ্ভূত হইয়া দিগ্‌মণ্ডল সমুজ্জল করিল । এজন্ত নক্ষত্ররাজ অদৃশ্য হইলেও এই ক্ষুদ্র তারকামালার প্রভাৱ সমগ্র পৃথিবী পূর্ববৎ সমুজ্জল রহিল । রজনীর অবসান হইলে কাজুলি খাঁ পিতৃসমীপে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । তিনি বলিলেন, “কাবাল খাঁ, তোমার বংশীয় তিন জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিবেন ; তাহার পর যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইবেন, এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রত্যেকেই এক এক প্রদেশে রাজত্ব করিবেন । কাজুলি বাহাদুর, তোমার বংশে সাত জন পুত্রাদিক্রমে ক্রমান্বয়ে জন্মগ্রহণ করিবেন ; তাহার পর যিনি আবির্ভূত হইবেন, তাঁহার আধিপত্য সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর বিস্তার লাভ করিবে, এবং তাঁহার বংশধরগণের মধ্যেও প্রত্যেকেই পৃথিবীর এক এক বিভাগে রাজ্য-সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন ।” এই ব্যাখ্যা শেষ হইলে কাবাল খাঁ ও কাজুলি বাহাদুর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কাবাল ও তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিবেন, এবং কাজুলি বাহাদুর ও তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন । (১) তদনুসারে তোমিনাই খাঁর মৃত্যুর পর কাবাল খাঁ রাজপদে ও কাজুলি খাঁ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন ।

(১) সুপ্রসিদ্ধ এন্‌ক্রাইম সাহেব বাবর ও হুমায়ুন নামক গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠে নির্দেশ করিয়াছেন যে, তৈমুরলঙ্গ চেঙ্গিস খাঁর বংশধরগণ কর্তৃক শাসিত রাজ্যে আবির্ভূত হন । তৈমুরলঙ্গ রাজকমতার প্রতি সত্যক দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, আপনাকে চেঙ্গিস খাঁর বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত করিতে পারিলে সহজেই অতীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে । চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর কিকির্দধিক এক শত বৎসর পরে তৈমুরলঙ্গ

কাবাল খাঁ প্রবল প্রতাপাধিত শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া মোগল জাতির বিভিন্ন শাখা তাঁহার সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণে আবদ্ধ ছিল। এই সময় মোগলাধিকৃত রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে থিতা রাজ্য বিদ্যমান ছিল। তত্ৰত্য অধিপতি আলতান খাঁ কাবাল খাঁর সহিত মিত্রতাপূর্ণে আবদ্ধ হইবার বাসনার তাঁহাকে স্বরাজ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। কাবাল খাঁ থিতা রাজ্যে উপনীত হইলে তাঁহাকে আলতান সম্মানে ও সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কাবাল খাঁ মন্ততাবহার কোন দুর্কার্য্য করাতে আলতান খাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শিরস্ত্রাণ ও কোমরবন্ধ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। কাবাল খাঁ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এত সহজে কাবালকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারিষদবর্গ আলতান খাঁর নিন্দা করিতে লাগিলেন; এ জন্য তিনি তাঁহার অতিথিকে পুনর্বার রাজধানীতে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কাবাল খাঁ প্রত্যাবর্তন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। আলতান খাঁ তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কাবাল সানজুতি নামক জনৈক বন্ধুর শিবিরে বিশ্রাম করিতে-ছিলেন; এমন সময় সৈন্যদল তাঁহার নিকট উপনীত হইল। কাবাল খাঁ তাহাদের সঙ্গে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু সানজুতি

জয়গ্রহণ করেন; এই সময়ের মধ্যে চেঙ্গিস খাঁর বংশীয়গণ সংখ্যাধিক্যবশতঃ নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির পক্ষে তাহাদের স্বশ্রেণীভুক্ত হওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু পুরুষানুক্রমে চেঙ্গিসবংশীয়গণের সহিত সংশ্রবের বিষয় প্রচার করিলে জনসাধারণ সহজেই তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিবে, এবং তাহাতে তাঁহার গন্তব্য পথও স্বগম্য হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তৈমুরলঙ্গ এই গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার বংশীয়গণের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পরিচিত করেন। কাবাল খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত চতুর্থ নক্ষত্র চেঙ্গিস খাঁর ও কাজুলি খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত অষ্টম নক্ষত্র তৈমুরলঙ্গের আবির্ভাবের পূর্বাভাস সূচিত করিয়াছিল।

তাঁহাকে নিবারণ করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্ব প্রদান করিলেন । কাবাল এই বন্ধুর সাহায্যে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া আলতান খাঁর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন । আলতান খাঁর প্রেরিত সৈন্যদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মোগলিস্থানে উপনীত হইলে, রাজাজ্ঞায় তরবারিমুখে নিষ্কিপ্ত হইল ।

এই সময় কাবাল খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওকিনবরকাক দেশে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন ; তিনি দৈবদুর্কিপাকে মোগল জাতির চিরশত্রু তাতারগণের হস্তে পতিত হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলতান খাঁর নিকট সমর্পণ করিল । আলতান খাঁ নির্দোষ রাজকুমারকে নৃশংস-ভাবে হত্যা করিয়া কাবাল খাঁর দুর্স্যবহারের প্রতিশোধ লইলেন ।

ইহার কিয়দ্বিঘ্ন পরেই কাবাল খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র কুবীলা খাঁ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন; এবং ভ্রাতৃহত্যাতে শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্তে খিতা রাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন । কুবীলা খাঁ তুমুল যুদ্ধে শত্রুসৈন্য পরাস্ত করিয়া অপরিমেয় ধনরত্ন লুণ্ঠন পূর্বক স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন ।

কুবীলা খাঁ লোকান্তরিত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরতান বাহাদুর (পূর্বপুরুষগণের উপাধি খাঁ ছিল, ইনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করেন) রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন । বরতান বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করিবার অত্যন্তকাল মধ্যেই কাজুলি বাহাদুর দেহপরিত্যাগ করিলেন, এবং পূর্বনিয়মানুসারে তদীয় পুত্র ইরদম মস্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইলেন । ইরদম মস্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়া বরলাস (বরলাস অর্থ—বীরপুরুষ ও সৎংশজাত) উপাধি গ্রহণ করিয়া একটি অভিনব মোগল শাখার (বরলাস বংশের) প্রতিষ্ঠা করিলেন ।

বরতান বাহাদুর কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় পুত্র এয়াশুক

বাহাদুর পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইলেন । ইহার কিয়দ্বিবস পরেই ইরদম-সি-বরলাস প্রাণপরিত্যাগ করিলেন, এবং তদীয় পুত্র সুগুজিজান তৎস্থলাভিষিক্ত হইলেন । এয়াসুক বাহাদুর স্বীয় মন্ত্রী সুগুজিজানের সাহায্যে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চিরশত্রু তাতারদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিলোনবুল-দাগে (১) ফিরিয়া আসিলেন । এয়াসুক বাহাদুর প্রধানতঃ এই স্থানে অবস্থান করিতেন । তিনি দিলোনবুলদাগে উপনীত হইলে তদীয় প্রধানা মহিষী উলোনআওকা ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একটি পুত্র প্রসব করিলেন । পুত্রের নাম তমুরচি । কিন্তু উত্তরকালে এই পুত্র চেঙ্গিস খাঁ নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন । সুগুজিজান নবজাত শিশুর অঙ্গে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিয়া নির্দেশ করিলেন যে, কাবাল খাঁর বক্ষঃস্থল হইতে সমুজ্জল নক্ষত্র বহির্গত হইয়া ইহারই জন্ম সূচিত করিয়াছিল ।

১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এয়াসুক বাহাদুর দেহত্যাগ করিলে তদীয় ত্রয়োদশ-বর্ষবয়স্ক পুত্র তমুরচি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন ।

তমুরচির পিতৃসিংহাসনে আরোহণসময়েও সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ মোগলিস্থানে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করে নাই । তখনও তাহারা পশুপালক ছিল । প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্ত মোগলিস্থানের এক এক অংশ নির্দিষ্ট ছিল । তাহারা শীত গ্রীষ্ম অথবা পালিত পশুর আহাৰ্য্য ভূণের প্রচুর্য বা অল্পতা অনুসারে স্ব স্ব নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবারবর্গ, পশুপাল ও বাসগৃহ সহ স্থানান্তরিত হইত । এক্ষণে তাহারা পটুবাস বা স্থানান্তরিত পরিবার উপযোগী কুটার নির্মাণ করিয়া বাস করিত । অশ্ব, গো, ও মেঘপালই

(১) রুসিয়ার সীমান্তপ্রদেশে উত্তর মঙ্গোলিয়ার ওনন নদীর তীরে অবস্থিত ।

তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি ছিল । হুঁত ও পালিত পশুর মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল । কিন্তু মোগলগণ পালিত পশু সহসা হনন করিত না । তাহারা কৃষিকার্যের তাদৃশ অনুরাগী ছিল না, বরং যে সকল প্রতিবাসী স্থানিভাবে অবস্থান করিত, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিত । সম্ভানপালন, খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ও অন্যান্য গৃহকার্যের ভার জীলোকের প্রতি গুস্ত ছিল । উন্মুক্ত স্থানে বাস করিয়া, অস্থগৃষ্ঠে অধিকাংশ সময় যাপন করিয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া, এবং শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত সর্বদা সশস্ত্রভাবে অবস্থান করিয়া তাহারা কষ্ট সহিষ্ণু ও বীর্যবান হইয়াছিল । তাহাদের রাজ্যশাসন প্রণালী patriarchal ছিল ; সমগ্র সম্প্রদায় বা জাতি এক মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া তাহারা সানন্দে কোন এক নির্দিষ্ট পরিবারের সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে বংশানুক্রমে অধিনেতা বলিয়া স্বীকার করিত । কিন্তু বিভিন্ন শাখার আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে প্রাচীন স্বতন্ত্র আচারব্যবহার বা অধিনেতৃগণের ব্যক্তিগত চরিত্রের পার্থক্যনিবন্ধন স্বতন্ত্র প্রণালী অনুসৃত হইত । কোন কোন অধিনেতা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন । কিন্তু সাধারণতঃ অধিনেতৃগণ আপন আপন সম্প্রদায়স্থ বিশিষ্ট পরিবারসমূহের প্রধান ব্যক্তিগণের পরামর্শ-অনুসারে শাসনকার্য্য নির্বাহ করিতেন ; কোন গুরুতর বিষয়ের যীমাংসার সময় সমগ্র সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করাই নিয়ম ছিল । আব্রুকলহ উপস্থিত হইলে অক্সক্লাসগণ (১) প্রাচীন প্রথানুসারে তাহার বিচার করিতেন ।

২ ।

এই সময় মোগল ও তাতার জাতি বহুশাখায় বিভক্ত ছিল । তুর্কি-

(১) The Turks and Afghans call the leading men who form a sort of councillors in the tribe Ak saklas white (grey) beards.

জাতি হইতে মোগল ও তাতার ব্যতীত আরও অসংখ্য বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সকল বংশও আবার নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। মোগল, তাতার ও তুর্কিজাতীয় অন্যান্য বংশে একান্তর জন হাকিম অথবা অধিনেতা আধিপত্য করিতেছিলেন। প্রত্যেক অধিনেতা এক বা ততোধিক শাখার শাসন করিতেন। মোগলবংশের অন্ততম শাখার নাম নাসরুন ছিল। একান্তর বাহাদুরের আধিপত্য নাসরুন মোগলগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এ জন্ত তাঁহার মৃত্যুর পর কেবলমাত্র তাহারাই তদীয় পুত্র তমুরচিকে অধিনেত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহা অব্যবহিত পরেই বিজ্ঞ ও বহুদর্শী অমাত্য সুশিক্ষিত লোকাস্তুরিত হইলে তদীয় কিশোরবয়স্ক পুত্র কারসার নোয়ান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। নাসরুন মোগলগণ ছই জন কিশোরবয়স্কের হস্তে তাঁহাদের শাসনভার অর্পিত দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া তানজিউত নামক মোগলগণের সঙ্গে মিলিত হইল। এই সময় নাসরুন মোগলগণ চল্লিশ হাজার পরিবারে বিভক্ত ছিল। ইহাদের অধিকাংশই অপরিণতবয়স্ক তমুরচিকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুদলে মিলিত হইল; কেবলমাত্র কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ সহস্র পরিবার তাঁহার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিল না। চতুর্দিক হইতে বিপদরাশি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। এইভাবে সতের বৎসর অতিবাহিত হইলে ভাগ্যানশী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। যে সকল নাসরুন মোগল-পরিবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুসঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্বার তাঁহার বশতা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল পরিবার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়াতে তাঁহার দল যথেষ্ট পুষ্টলাভ করিল। অতঃপর তিনি আরও কতিপয় মোগল শাখার মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু তমুরচির ভাগ্যলক্ষী দীর্ঘকাল সুপ্রসন্ন রহিলেন না । নায়রুন মোগলগণ পুনর্বার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়াতে তানজিউত মোগলগণের আধিপত্য তুরকুতে তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন । তমুরচি দৈবাৎ শত্রুহস্তে পতিত হইয়া বন্দী হইলেন । তিনি বন্দিভাবে কিছুদধিক তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া সুযোগক্রমে পলায়ন করিলেন, এবং শত্রুগণের আবাসভূমির অনতিদূরবর্তী একটি হুদে সর্বদা নিমজ্জিত করিয়া কেবলমাত্র নাসিকাগ্রভাগ জনোপরি রক্ষাপূর্বক লুক্কায়িত রহিলেন । তাঁহার পলায়নবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে তুরকুতে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । সুরগানসিরাহ নামক জনৈক তানজিউত মোগল তমুরচিকে এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় পতিত দেখিয়া দয়াপরবশ হইল, এবং রাত্রি সমাগত হইবামাত্র তাঁহাকে হুদ হইতে উদ্ধার করিয়া একখানি মেঘলোমপূর্ণ শকটের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল । এদিকে তুরকুতের পোরিত সৈন্যদল সন্ধিহান হইয়া সুরগানসিরাহের গৃহে উপনীত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহারা বহু অনুসন্ধানেও তমুরচিকে প্রাপ্ত না হইয়া ভ্রান্তঃকরণে প্রস্থান করিল । তমুরচি শত্রুদলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া নির্ভয়চিত্তে সুরগানসিরাহ-প্রদত্ত অসিতস্কন্ধ অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন । এই ঘটনা ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল । (১)

তমুরচি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় আধিপত্যবিস্তার করিবার কল্পনার পুনর্বার যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপ্ত হইলেন । ইহার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন শত্রুদল তাঁহাকে সমূলে বিনাশ

(১) এই ঘটনা হইতে মোগলগণ অসিত-স্কন্ধ অশ্বকে পূজার্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকে । তমুরচি উত্তরকালে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইলে স্বীয় প্রাণদাতা সুরগানসিরাহের বংশধরগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।

করিবার জন্য একত্র মিলিত হইল । তমুরচি শত্রুপক্ষকে একান্ত প্রবল ও বহুসংখ্যক দেখিয়া তাহাদের গতিরোধ করা অসাধ্য বিবেচনায় পিতৃবন্ধু আওয়াজ খাঁর শরণাপন্ন হওয়াই কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন । তদীয় অমাত্য কারসার নোয়ান তমুরচির একান্ত অনুরক্ত ছিলেন ; তিনিও তাঁহার সঙ্গে আওয়াজ খাঁর রাজ্যে গমন করিলেন । আওয়াজ খাঁ করাএয়াত মোগল শাখার অধিপতি ছিলেন । করাএয়াত মোগল-গুণ জনসংখ্যায় অধিক ছিল । আওয়াজ খাঁ সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী নর-পতি ছিলেন । তিনি খিতাধিপতির সঙ্গে সৌহৃদ্যমুখে আবদ্ধ ছিলেন । তমুরচি ও কারসার এই রাজ্যে উপনীত হইলে সাদরে গৃহীত হইলেন ।

এখানে তমুরচির অবস্থা ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল । আওয়াজ খাঁ প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন । তমুরচি তাঁহার এতদূর প্রীতিভাজন হইরাছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তমুরচি আট বৎসর কাল আওয়াজ খাঁর অধীনে অবস্থান করিয়াছিলেন ; এই সময়ের মধ্যে তিনি আশ্রয়দাতার অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন ও তাঁহার পক্ষে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন ।

এই ভাবে আট বৎসর অতিবাহিত হইলে, তমুরচির সৌভাগ্য-সন্দর্শন করিয়া আওয়াজ খাঁর অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গের হৃদয়ে ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হইল । তাঁহারা তমুরচির সর্ব্বনাশ করিবার জন্য উপায়-উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হইলেন । তমুরচি তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অত্যন্ত-কালমধ্যেই আওয়াজ খাঁর পুত্র সনগুণের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন । তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আওয়াজ খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । তমুরচি তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন । আওয়াজ খাঁ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তমুরচির শত্রুদলের এতদূর বিরাগভাজন

হইরাছিলেন যে, তাহারা আওরাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল; তথাপি তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই । আওরাজ খাঁ জেদুশ প্রীতিভাজন আশ্রিতকে বিনাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না । কিন্তু গুরু কর্তৃক অনবরত উত্তেজিত হইরা অবশেষে তমুরচিকে বন্দী করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন । তমুরচি আসন্ন বিপদের বিষয় দৈবাৎ অবগত হইরা কারসার নোয়ানের সহিত পরামর্শ করিয়া পলায়ন করাই কর্তব্য মনে করিলেন । তদনুসারে পরিবারবর্গকে বানজোনাহ-বোনাক নামক নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়া রাজিকালে অচুচরগণ সহ পলায়ন করিলেন । ইহার কিয়ৎকাল পরেই আওরাজ খাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার জন্ত উপস্থিত হইরা তাঁহাদের বাসভবন শূন্য দেখিয়া একান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন । আওরাজ খাঁ তাঁহাদের পশ্চাদ্ভ্রমণ করিয়া কিয়দূর অগ্রসর হইরাই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন । উভয় দলে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল; অচুচরগারী দল পরাজিত হইরা পলায়ন করিল ।

অতঃপর তমুরচি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন । এই সময় তমুরচির বয়ঃক্রম উনপঞ্চাশ বৎসর তমুরচি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত আওরাজ খাঁর শরণাপন্ন হইলে নাসরুণ মোগলগণ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইরাছিল । তাহারা অধিপতিকে প্রত্যাগত দেখিয়া পুনর্বার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল । তমুরচি রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে আরও কতিপয় মোগল বংশ তাঁহার বশতা স্বীকার করিল ।

তিনি ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া বিপুল সৈন্য সংগ্রহপূর্বক আওরাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । যুদ্ধের অবসানকালে কারসার নোয়ান আওরাজ খাঁর অশ্বকে শরাঘাতে ভূতল-শায়ী করিলেন । তখন আওরাজ খাঁ ভয়ব্যাকুলচিত্তে রাজমহিষী ও

রাজকন্যাদিগকে শত্রুহস্তে পরিত্যাগ করিয়া পুত্র সহ পলায়ন করিলেন । তমুরচি এই ভাবে আওয়াজ খাঁকে বিধ্বস্ত করিয়া সগৌরবে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

আওয়াজ খাঁর স্ত্রায় পরাক্রমশালী অধিপত্যকে পরাস্ত করাতে তমুরচির যশোরাশি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; একত্ন কতিপয় মোগল শাখা তাঁহার বশতা স্বীকার করিল, এবং তিনি খাঁ উপাধি গ্রহণ করিলেন ।

অতঃপর তমুরচি পার্শ্ববর্তী মোগল, তাতার ও তুর্কিজাতীয় অন্যান্য-বংশীয়দের অধিকৃত স্থানসমূহ হস্তগত করিয়া স্বীয় আধিপত্য বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন । ন্যূনাধিক চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি বহুসংখ্যক অধিপত্যকে পরাস্ত করিয়া প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি বলিয়া সর্বত্র পরিগণিত হইলেন । তাঁহার উচ্চাশা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।

- ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তমুরচি যে সকল বিভিন্নশাখাসম্মত মোগলগণ তাঁহার বশতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিলেন । তাহার পর তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট আপনাকে ভবিষ্যদর্শী বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি কখনও কখনও স্বর্গে নীত হইয়া থাকেন । সরল বিশ্বাসী মোগলগণ এ কথায় প্রত্যয় করিল । তমুরচির বক্তব্য শেষ হইলে কুকজু নামক তাঁহার জনৈক অন্তরঙ্গ (১) গাত্রোথান করিয়া বলিলেন, “আমি গত রাত্রিতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি । একজন রক্তবর্ণ পুরুষ দুসরবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, তুমি এয়ান্নক বাহাদুরের পুত্রকে বলিবে যে,

(১) তমুরচির মাতা এয়ান্নক বাহাদুরের সত্যার পর মিজলিক নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এই বিবাহের ফলস্বরূপ কুকজু জন্মগ্রহণ করেন ।

আর কেহ তাঁহাকে তমুরচি নামে সম্বোধন করিবে না ; অতঃপর সকলেই তাঁহাকে চেঙ্গিস খাঁ নামে অভিহিত করিবে । তুমি চেঙ্গিস খাঁকে আরও বলিও যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে পৃথিবীর অধিকাংশ সমর্পণ করিয়াছেন ।” সমাগত জনমণ্ডলী এই স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া চেঙ্গিস খাঁর (১) নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ।

চেঙ্গিস খাঁ যে গৃহ উদ্দেশ্যে এই দরবার আহ্বান করিয়া কুকজু দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট দৈববাণীর প্রচার করেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল । এই স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজ্যময় প্রচারিত হইয়া পড়িলে সরল বিশ্বাসী মোগলগণ বিশ্বাস করিল যে, সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্যই চেঙ্গিস খাঁ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন । ইহার ফলস্বরূপ চেঙ্গিস খাঁ নানা স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন, কারণ প্রাপ্তকৌশলে তদীয় সৈন্য অমানুষিক সাহসসম্পন্ন হইয়া উঠে । এই সময়ে চেঙ্গিস খাঁ উদীয়মান সূর্য্যের জায় প্রতীক হইতেছিলেন । পশ্চিমে ঘোর খাঁর অধিকৃত রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ হইতে পূর্বদিকে খিতা অথবা উত্তর চীনের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে তাঁহার আধিপত্য অস্বাধিক স্থাপিত হইয়াছিল ।

অধিকাংশ মোগল-বংশ তাঁহার বশুতা স্বীকার করিতে, তিনি পর রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন । সর্বপ্রথমে খিতা রাজ্য তাঁহার সত্বক দৃষ্টিপথে পতিত হইল । চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয়ের বহুপূর্বে তদানীন্তন খিতাধিপতি (২) তাঁহার পিতামহের জ্যেষ্ঠ

(১) চেঙ্গিস খাঁ শব্দের অর্থ, সম্রাট ।

(২) যিনি চেঙ্গিস খাঁর পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভাতাকে বধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আলতান খাঁ । চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয়কালে যিনি খিতারাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহার নামও আলতান খাঁ । খিতাধিপতিগণের উপাধি আলতান খাঁ ছিল বলিয়া অনুমিত হয় ।

ভ্রাতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন । চেঙ্গিস খাঁ খিতাখিপতির পূৰ্বপুরুষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার ব্যপদেশে মোগলগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তিত হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন । তাহার পর তিনি খিতাখিপতি আলতান খাঁর দরবারে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বশ্বতা স্বীকার করিবার জন্য আদেশ করিলেন । খিতাখিপতি চেঙ্গিস খাঁর দূতকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিলেন । রাজদূত প্রত্যাগত হইলে চেঙ্গিস খাঁ খিতারাজ্য মণ্ডিত করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । আলতান খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া শত্রু প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন । মোগলাধিপতি খিতারাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রকাশ্য পথ শত্রু কর্তৃক রুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া গুপ্তপথের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং অচিরাৎ তাদৃশ পথের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া নিকটবর্তী পৰ্ব্বতের পাদদেশে মোগলপরিবারদিগকে সমবেত করিলেন । এই স্থানে তাঁহার আদেশক্রমে মাতা পুত্র ও স্ত্রীপুরুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল । তিন দিন পর্য্যন্ত কেহই অন্ন জল গ্রহণ করিল না, এবং স্ত্রীপুরুষনির্কি-
শেষে সকলেই অনাবৃতমস্তকে অবস্থান করিল । চেঙ্গিস খাঁ স্বয়ং পটগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গলদেশ রজ্জুবদ্ধ করিলেন, তিন দিন পর্য্যন্ত আর বহির্গত হইলেন না । এই তিন দিন সমবেত জনমণ্ডলী ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূৰ্বক জয়ধ্বনি করিতেছিল । চেঙ্গিস খাঁ চতুর্থ দিন প্রত্যুষে পটগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন, “টিঙ্গরি (ঈশ্বর) আমাকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছেন । এখন আমরা আলতান খাঁকে শাস্তি দিবার জন্য অভিযান করিব ।” তাহার পর তিন দিন মোগলগণ তোষাদি উৎসবে মত্ত রহিল ।

এই তিন দিন অতিবাহিত হইলে চেঙ্গিস খাঁ সসৈন্তে গুপ্ত পথে

খিতারাজ্যে প্রবেশ করিয়া তমগজ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন । আলতান খাঁ চেঙ্গিস খাঁর আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িলেন ; কারণ, তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, শত্রুর প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য যে ত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে । এ দিকে আলতানের প্রেরিত সৈন্যদল তমগজ প্রদেশ লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে অবগত হইয়া যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল । যাহারা পলায়ন করিতে পারিল না, তাহারা শত্রুহস্তে বন্দী হইল, অথবা জীবন বিসর্জন করিল ।

চেঙ্গিস খাঁ তমগজ ও তেংকত প্রদেশ অধিকার করিয়া খিতারাজ্যের রাজধানী তমগজ নগরের দারদশে (১) উপনীত হইলেন । তিনি তমগজ নগর অবরোধ করিলে আলতান খাঁ বিপুলবিক্রমে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন । মনুষ্যের যাহা সাধ্য, আলতান খাঁ নগর রক্ষার জন্য সে সমস্তেরই অনুষ্ঠান করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই নগর রক্ষা করিতে পারিলেন না । চারি বৎসর পরে তমগজ নগর শত্রুহস্তে পতিত হইল ।

চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয় ও মোগল সৈন্য কর্তৃক খিতারাজ্য বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে খারিজমাধিপতি (২) সুলতান মোহাম্মদ প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন । রাজদূত আলতান খাঁর রাজধানীর নিকটবর্তী হইলে একটি শুভবর্ণ

(১) He then turned his face towards the Altan Khan's capital and metropolis of Khita which in the Tarikh-i-Jahangir Habib-us-Siyar, &c is named Chingdu or Chinghtu, where the Altan Khan then was. This must be our author's city of Tamghaj, that is to say, the chief city of the country of Tamghaj.—Major H. G. Raverty.

(২) আধুনিক খিতার প্রাচীন নাম খারিজম ।

সমুচ্চ স্তূপ তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইল। রাজদূত উহাকে তুমার মণ্ডিত পক্ষত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার পথপ্রদর্শককে বিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মোগল-সংঘর্ষে যে সকল সৈন্ত কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহাদের কঙ্কালরাশি তাদৃশ সমুচ্চ স্তূপাকার ধারণ করিয়াছে। রাজদূত তথা হইতে কিয়দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে, রাজপথ বহুদূর পর্য্যন্ত মৃত সৈন্তের বসার চর্চিত রহিয়াছে। পূর্বোক্ত সুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্ত জীবন বিসর্জন করিয়াছিল। একজন ইতিহাসবেত্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, মৃতদেহরাশি নিঃশেষ করিতে মাংসাদি পশুপক্ষীর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজদূত রাজধানীর দায়দেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, দুর্গমূলে নবকঙ্কালরাশি স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বৃষ্টিসহস্র বালিকা ও কুমারী মোগলের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহাদের কঙ্কালরাশি তথার সজ্জিত রহিয়াছে।

রাজদূত চেঙ্গিস খাঁর দরবারে উপনীত হইলে তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। চেঙ্গিস খাঁ সুলতানকে উপহার দিবার জন্য নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া বন্ধুতার প্রার্থী হইলেন, এবং উভয় রাজ্যে অবোধ বাণিজ্য চলিতে পারে, এই মর্মে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তারপর খাঁর দূত সহ স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম ও অন্যান্য নানাবিধ বহুমূল্য পদার্থব্যাপ্ত পূর্ণ পঞ্চ শত উষ্ট্র বাণিজ্যার্থ খারিজম রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। খারিজমাধিপতি সুলতান অর্থলোভের বশবর্তী হইয়া এই বণিকদলকে সম্মুখে বিনষ্ট করিলেন। কেবলমাত্র একজন উষ্ট্রচালক দৈবাৎ শত্রু হস্ত হইতে পরিভ্রাণলাভ করিয়া খিতারাজ্যে গমন করিয়া সুলতান কর্তৃক অশুভিত হুকার্যের সংবাদ প্রদান করিল। এই শোচনীয় সংবাদ

অবগত হইয়া চেঙ্গিস খাঁর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং উহাতে সমগ্র খারিজম সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া যায় ।

চেঙ্গিস খাঁ সুলতানকে শান্তি দিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি চীন, তুর্কিস্তান ও তামগজ হইতে অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া খারিজম সাম্রাজ্য ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য মহা-সমারোহে যাত্রা করিলেন । (১)

চেঙ্গিস খাঁ সর্বপ্রথমে সুপ্রসিদ্ধ উত্রার নগরীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন । মোগল সৈন্য বনসঙ্কুল ছরতিক্রম্য সুদীর্ঘ পথ বহু কষ্টে অতিবাহিত করিয়া মোগল সীমান্ত প্রদেশ পরিত্যাগের তিন মাস পরে শত্রুরাজ্যে উপনীত হইল । তাহাদের আগমনে রাজ্যের সমগ্র অধিবাসী সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল, এবং স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিল । ধর্মবিশ্বাসী অধিবাসিবর্গ ঈশ্বরানুগ্রহলাভ জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান করিয়া আত্মবিসর্জন করিতে লাগিল । (২) বীর্য-

(১) Chengiz Khan issued commands so that the forces of Turkistan, Chin and Tamghaz assembled. Six hundred banners were brought out, and under each banner were one thousand horsemen, and six hundred thousand horses were assigned to the Bahadur : they call a warrior, Bahadur. To every ten horsemen three heads of tukli sheep were given with orders to dry them, and they took along with them, an iron cauldron, and a skin of water, and the host proceeded on its way.

(২) খারিজম রাজ্যের অধিবাসিগণ নাশিহের দুর্গ অধিকৃত হইবার সময় যেক্রপ ঈশ্বরবিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি। "Three months prior to the occurrence of the capture of fortress. and their attainment of the glory of martyrdom, the whole of them, by mutual consent donned deep blue (mourning) garments, and used to repair daily to the great masjid of the fortress and would repeat the whole Kuran, and condole and mourn with each other ;

শালী সৈন্যগণ পথশ্রমে কিছুমাত্র ক্লান্ত না হইয়া অমিতপরাক্রমে শত্রু-
হননে প্রবৃত্ত হইল। খারিজম রাজ্যের চতুর্দিকে একবারে বেড়া
আগুন জলিয়া উঠিল ; তাহাতে অসংখ্য নরনারীর সুখ শান্তি চির-
কালের জন্য ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইল। স্বদেশের জন্য মোগল-
সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা, ও শৌর্য্য বীর্য্যের একশেষ প্রদ-
র্শন করিতে লাগিল। (১) কিন্তু এত করিয়াও তাহারা মোগলের গ্রাম
হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না ; তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যা-
চারে ও উৎপীড়নে সোষ্ঠবশালী অমিতধনধান্যপূর্ণ খারিজম সাম্রাজ্য মরু-
ভূমিতে পরিণত হইল। কিরূপে নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ
মোগলের অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণে ছারখার হইয়াছিল, বিস্তৃতভাবে
তাহার বর্ণনা করা নিশ্চয়োজন। সে কাহিনীর আদ্যস্ত একই রূপ
ঘটনার পরিপূর্ণ। মোগল সৈন্য যে প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই
অধিবাসিগণ বালবৃদ্ধবনিতানির্বিশেষে তরবারিযুগ্মে নিক্ষিপ্ত, যোজন-
ব্যাপি শস্যক্ষেত্র শত্রুর তাণ্ডবে তৃণশূন্য, সুদৃশ্য প্রাসাদমালাশোভিত

and, after doing all this, they used to pronounce benediction on
and farewell to each other, and assume their arms, and engage in
holy warfare with the infidels."

(১) মোগলগণ আশহরার দুর্গ অবরোধ করিলে দুর্গবাসিগণ সার্ক এক বংশের
অধিক কাল পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এই সময় খাদ্যাভাবে তাহাদের দুর্দশার
একশেষ হইয়াছিল। তাহারা শত্রুহন্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা তাদৃশ কষ্ট সহ্য
করাও বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করিত। ক্রমশঃ তাহাদের অবস্থা এতদূর শোচনীয়
হইয়াছিল যে, তাহারা মৃত অথবা নিহত ব্যক্তির মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতে বাধ্য
হইত। এই সময় দুর্গ মধ্যে একজন স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার মাতা ও একজন
কীতদাসী বর্ত্তমান ছিল। তাহারা মৃত্যুযুগ্মে পতিত হইলে উক্ত স্ত্রীলোক তাহাদের
মাংস বিক্রয়ার্থ শব্দ করিয়াছিল ; এই শুদ্ধ মাংস বিক্রয় দ্বারা আড়াই শত স্বর্ণমুদ্রা
(Gold dinars) লাভ হইয়াছিল। সার্কবংশেরাধিক কাল গত হইলে কেবল-
মাত্র ত্রিশ জন দুর্গবাসী অবশিষ্ট ছিল ; তখন তাহারা আর গত্যন্তর না দেখিয়া
শত্রুহন্তে আত্মসমর্পণ করে।

সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত ও অসংখ্য নরনারী দাস-
বিপণিতে বিক্রীত হইবার জন্য অবরুদ্ধ হইত । (১) কথিত আছে যে,
মোগলের হস্তে অগণ্য মোসলমান বন্দী হওয়াতে তাহারা চেঙ্গিস খাঁর
জন্যই বিশেষভাবে দাদশ সহস্র কুমারি নির্দিষ্ট করিয়াছিল ; ইহারা
সৈন্যের পশ্চাতে পদব্রজে গমন করিত ।

১২১৮ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ খারিজমাখিপতির দুর্জয়বাহারে বিচলিত
হইয়া তাঁহাকে শান্তি দিবার জন্য মাওরাওন্দার প্রদেশে উপনীত হন ;
তত্রত্য অধিবাসিগণ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তিনি আমু (আমুদ)
নদী উত্তীর্ণ হইয়া বাকের বিরুদ্ধে আপনার ভুবনবিজয়ী তরবারি উদ্বৃত্ত
করেন । তদীয় পুত্র তুলি খাঁ বিপুল বাহিনী সহ খোরাসানে প্রেরিত
হন, এবং ইরাণ ও তুরাণ বিজিত হইবার পর মোগল সৈন্য বাক হইতে
তালিকানে (তালিকান খোরাসানের একটি নগর, বাকের পূর্বাংশে
অবস্থিত) পদার্পণ করে । এ স্থান হইতে চেঙ্গিস খাঁ খারিজমের শাহ-
জাদা জেলাল উদ্দীন মঙ্গবারিকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার

(১) চেঙ্গিস খাঁ কর্তৃক বিশাল সৈন্যও বিজয় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল । আমরা
এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি ; ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ উদ্দীন গল্লি
কাজি ওরাহিদ উদ্দীনের নিকট শুনিয়াছিলেন । এই কাজি চেঙ্গিস খাঁর অনুগ্রহ
ভাজন ছিলেন ; এবং এই গল্পের বিষয় তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই সংঘটিত হইয়াছিল ।
“When he (Chengiz Khau) enquired of me, will not a mighty
name remain behind me (in the world through taking vengeance
upon Sultan Mahamad, Kharwarazm Shah), I bowed my face to
the ground, and said : ‘If the Khan will promise the safety of my
life I will make a remark.’ He replied : ‘I have promised thee its
security.’ I said : A name continues to endure where there are
people, but how will a name endure when the Khan’s servants
martyr all the people and massacre them, for who will remain to
tell the tale ?”

চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ । ২৫

পশ্চাৎাবিত হইয়া পথের উত্তর পার্শ্ব দেশসমূহকে মন্বন করিতে করিতে ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গুনদের তটদেশে উপনীত হন ।

চেঙ্গিস খাঁ খারিজম সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাংশ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার সঙ্কল্প করিলেন । লক্ষণাবতী ও কামরূপের পথে চীন দেশে গমন করিবার কল্পনাতেই তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে রুত-সঙ্কল্প হইলেন । চেঙ্গিস খাঁ কোনও গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষা করিতেন । এবারও তিনি ঈশ্বরের সম্মতিসূচক লক্ষণের সন্ধান প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া যে কয়মালায় সুশোভিত হইতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে কোনও নিদর্শন প্রকটিত না হওয়াতে, তিনি আপনার অতীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিতেছিলেন না । এ ক্ষণে ভারতসীমান্তে চেঙ্গিস খাঁর কালবিলম্ব হইতেছিল ; এমন সময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার দীর্ঘ-কাল অরুপস্থিতিনিবন্ধন সমগ্র তেঙ্গিস ও তমগজ প্রদেশ সহ চীন রাজ্য বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া মোগলের শাসনশৃঙ্খল উন্মোচন করিতে উদ্যত হইয়াছে । চেঙ্গিস খাঁ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চিন্তাকুল-চিত্তে পূর্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতের পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তাঁহার কুসংস্কার হেতু ভারতবর্ষ অব্যাহতি লাভ করিল ।

চেঙ্গিস খাঁ একাদশ বৎসর খারিজম সাম্রাজ্যের বিজয়ে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন । রাজধানী হইতে যাত্রাকালে তাঁহার বয়স পঞ্চষষ্টিতম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল ; তাঁহার সমুদ্রত মেহ, বলিষ্ঠ গঠন ও তেজোবান্ধক যুগ্মত্ব দর্শন করিলে তাঁহাকে যুবাপুরুষ বলিয়াই লব্ধ জন্মিত । কিন্তু বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধে নিরত থাকিয়া অবিরাম পরিশ্রমে তাঁহার লৌহকৌলকসম্পন্ন সুদৃঢ় শরীরও অবশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল । স্বদেশপ্রত্যাবর্তনাভিলাষী যৌবপুরুষ তরবারিহস্তে শটেনঃ শটেনঃ পথ

অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বিধাতৃপুরুষ অন্তরূপ বিধান করিয়াছিলেন ; স্বদেশে উপনীত হইবার পূর্বেই অর্দ্ধপথে তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া শয্যার আশ্রয় লইলেন ।

চেঙ্গিস খাঁ স্বপ্নে আপনার আসন্নমৃত্যু দর্শন করিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পুত্রত্রয়কে (১) নিকটে আহ্বান করিলেন । তাঁহারা পিতার আহ্বানে সমবেত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, “প্রাণাধিক পুত্রগণ, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত ; ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমাদের জন্ত সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠিত করিয়া স্ফূট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছি । আমার সাম্রাজ্য সুবিশাল, ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিতে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে । তোমরা কাহাকে এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচনা কর ?” তাঁহারা নতজানু হইয়া উত্তর করিলেন, “আমাদের পিতা সাম্রাজ্যেশ্বর, আমরা তাঁহার ভৃত্য, তাঁহার আজ্ঞা আমাদের শিরোধার্য্য ।” চেঙ্গিস খাঁ বলিলেন, “মস্তি কারসার বহুদর্শী ও রাজনীতিবিশারদ ; তাঁহার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস, আমি তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহার অভিমতানুসারেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিব ।” তারপর তিনি কারসারের মত গ্রহণ করিয়া কাবাল খাঁ ও কাজুলি বাহাদুরের মধ্যে যে একরারপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন । তদনুসারে একরারপত্র আনীত হইলে তিনি বলিলেন, “আমি ওকতাই খাঁকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলাম । পরস্পর সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবে ; তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে বলিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া একরার-পত্রে স্বাক্ষর কর । আমি

(১) চেঙ্গিস খাঁর চারি পুত্র ছিল ; তন্মধ্যে জুজি খাঁ পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন ।

চাণাটাই, তুলি খাঁ এবং জুজি খাঁর পুত্রের জন্য পৃথক পৃথক রাজ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিলাম ।” তদনন্তর তাঁহার আদেশে কারসার ও চাণাটাই পিতাপুত্ররূপে আর একখানি একরার-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন । উত্তরাধিকারিনিরোগ সমাপ্ত হইলে, চেঙ্গিস খাঁ বলিলেন, “আমার মৃত্যুতে তোমরা কেহ শোকাচ্ছ হইরা বিলাপ করিও না ; পূর্বনির্দেশ মত কাশইনের অধিপতি আমার শিবিরে উপনীত হইলে তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিও ; এই কার্য সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু সংগোপনে রক্ষা করিও ।” [The ruling passion of treachery was strong even in death.—H. G. Raverty.] এই উপদেশবাক্য উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল । পুত্রগণ চেঙ্গিস খাঁর মৃতদেহ বহন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুসংবাদ সংগুপ্ত রাখিবার জন্য পশ্চিমধ্যে বাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । এই ভাবে তাঁহারা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত করিলেন । তারপর বধারীতি অস্তেটিক্রিয়া সম্পাদিত করিয়া তাঁহাকে একটি বৃক্ষমূলে সমাহিত করিলেন । চেঙ্গিস খাঁ একদা মৃগয়া উপলক্ষে এই বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া মৃত্যুর পর তথায় তাঁহার সমাধিনির্মাণের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ কালগ্রাসে পতিত হন ।

চেঙ্গিস খাঁর জীবনের আশ্চর্য পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাদৃশ অসাধারণ মনুষ্য পৃথিবীতে অতি বিরল । চেঙ্গিস খাঁ অধ্যবসায়ের অত্যাশ্চর্য দৃষ্টান্তরূপ । তাঁহার প্রথম জীবন বিপদের ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন ছিল ; কিন্তু তিনি বিপুলবিক্রমে তরবারিহস্তে সমস্ত বিপদের মূলোচ্ছেদ করিয়া উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইরাছিলেন ।

কিশোরবয়স্কে চেঙ্গিস খাঁ এক দুর্ভাগ্য সম্প্রদায়ের অধিনেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই দুর্ভাগ্য সম্প্রদায় কিশোরবয়স্কে অধিনেতাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা সক্ষম মনে করিল না। তাহার অচিরে স্বয়ংপ্রধান হইয়া উঠিল। নবীন অধিপতি বিপদসাগরে পতিত হইলেন। সাধারণ মনুষ্য যে বয়সে ক্রীড়াকন্দুক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তিনি সেই বয়সে মনস্তত্ত্বাবে রক্তভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পর্ত্তপ্রমাণ বাধাবিঘ্নের অতিক্রম করিয়া স্ব-মন্ত্রদায়কে বশীভূত করিয়া তৎকাল বয়সেই আপনার ভাবী অত্যাঙ্কন জীবনের পূর্বাভাস প্রদান করিলেন।

তারপর সুনিপুণ শিল্পীর স্থায় চেঙ্গিস খাঁ আজীবনব্যাপী অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া সুবিশাল সাম্রাজ্য সংগঠিত করিলেন। (১)

যদিও চেঙ্গিস খাঁ শৌর্য্যবীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি তিনি লোকসমাজে একজন নৃশংস অত্যাচারিরূপেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার স্থায় প্রবল মনুষ্যশত্রু আর কখনও পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে কি না, সন্দেহের স্থল। চেঙ্গিস খাঁ প্রত্যেক বৃদ্ধক্ষেত্রেই অত্যন্ত ক্রুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তাঁহার

(১) He acquired sway over all Cathay, Khotan, Northern and Southern China, the desert of Qilecaq, Saqsin (either a place near the Caspian or a country of Turkistan), Bulgaria, As (Crimea or its neighbourhood), Russia, Alan (the country between the Caspian and the Black sea) &c. When he had finished the affairs of Transoxiana he * * turned his world opening reins to-wards Balkh. He despatched * * a large army to Khursan and conquering Iran and Turan he came from Balkh to Taliqan (a towh in Khursan). *Ahbar nama*. This (Bulgaria) is not therefore European Bulgaria to the west of the Black sea but great Bulgaria on the Volga. *H. Beveridge*.

চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ।

প্রত্যেক কার্যেই মানবজীবনের প্রতি কঠোর অবজ্ঞা ও তাহাদের হৃদয়বিদারক যন্ত্রণার অবিচলিত উপেক্ষা জ্ঞানব্যাপ্ত হইত ; তাহাদের কঠোর অবজ্ঞা ও অবিচলিত তাচ্ছীল্যের দ্বিতীয় প্রমাণ সমগ্র ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ । মোগলাধিপতি যে সকল অনুর্বর প্রদেশের দুর্দ্বর্ষ জাতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন তাহাদিগকেই পরদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিবার জন্য সৈন্তশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন । তাঁহার বিজিত রাজ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে তিনি অনুর্বর দেশের পরিবর্তে শস্তরাভিস্থাভিত জনপদ-সমূহের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন । চেঙ্গিস খাঁ এই সকল দেশে উপনীত হইয়া বালবৃদ্ধদ্বীপুরুষনির্কিশেষে অধিবাসাদিগকে নিহত করিয়া রক্তশ্রোত প্রবাহিত করিতেন ; তাঁহার অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণে জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহ বিজন অরণ্যে পরিণত হইত । চেঙ্গিস খাঁ এক দেশ মথিত করিয়া তাহার পরবর্তী দেশে উপনীত হইতেন ; পূর্ববর্তী দেশের একজন অধিবাসীও যেন জীবিত থাকিয়া বিজয়ী সৈন্তের পশ্চাতে উথিত হইয়া তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে না পারে, তজ্জন্ত তিনি নির্ধিকারচিত্তে বিজিত শত্রুমাত্রকেই নিহত করিতেন । এই সকল অমানুষিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে বধ্য ব্যক্তিদিগকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করা হইত, এবং আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই তাঁহার হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত না । চেঙ্গিস খাঁর এইরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণে স্বদেশ বিদেশের সর্বত্র ভয় ও বিবাদের গভীরচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল ।

এই সময় মোগলিস্থান অজ্ঞানাকারে পরিপূর্ণ ছিল, এবং তাহাদের ধর্মজ্ঞান অপরিষ্কৃত ছিল । এ জন্য তাহারা বিজিত দেশে কোন প্রকার অভিনব ধর্মমত বা জ্ঞানালোক আনয়ন করে নাই ;

অবিশ্রান্ত নরশোণিতপাত ও বিনাশকার্য্যেই তাহাদের সমস্ত শক্তি পর্য্যাবসিত হইয়াছিল ; বিজিত দেশ সমূহের একমাত্র শাসনদৃষ্টাই মোগলবিজয়ের পরিচয় প্রদান করিত ।

৩।

চেঙ্গিস খাঁ মৃত্যুর পূর্বে আপনার সুবিশাল সাম্রাজ্য পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন । তদনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র জুজি কিপচাকের সমতল ভূমি প্রাপ্ত হন । কিন্তু পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া তদীয় পুত্র বটু তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন । এই রাজকুমারের রাজ্য জাক্সারটিস্ নদী, আরল পর্বত ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাংশে ডন ও ভলগা নদীর তীরবর্তী স্বর্ণপ্রস্থ প্রদেশে ও কক্সসাগরের পার্শ্ববর্তী কিয়দংশে বিস্তৃত ছিল । দ্বিতীয় পুত্র চাঘাটাই সুবিস্তীর্ণ দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন ; পশ্চিমে দেশ কিপচাক, পূর্বে মোগল জাতির আদিম বাসস্থান, দক্ষিণে মেকরান ও উত্তরে সাইবেরিয়া, এই সীমার অন্তর্কর্ত্তী সমগ্র প্রদেশে তাঁহার আধিপত্য নিদিষ্ট হইয়াছিল ; এতদ্ব্যতীত কাশঘর, খোভেন এবং ওইঘর প্রদেশ, বদকান, বাক, খারিজম, খোরসান, গজনি ও কাবুল প্রভৃতি চেঙ্গিস খাঁর বিজিত প্রদেশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল । তৃতীয় পুত্র ওকতাই আদিম মোগল ভূমি ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন, এবং চতুর্থপুত্র তুলিকে চীনরাজ্য অর্পণ করা হইয়াছিল ।

চেঙ্গিস খাঁ রাজকুমারচতুষ্টয়ের রাজ্যশাসনসংরক্ষণের সাহায্য জন্য এক এক দল সৈন্ত পৃথকভাবে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন । উলু, যাযাবর মোগল অথবা অন্যান্য তুর্কিজাতীয় সৈন্ত এই সব দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

প্রথমতঃ চেঙ্গিস খাঁর বংশধরগণ ওকতাইকে সাম্রাজ্যের অধিনেতা বলিয়া স্বীকার করিতেন । তাঁহার পরলোকগমনের পর তদীয় মহিষী তুরখিনা মোগল সাম্রাজ্যের অধিনেতা পদ অধিকার করিয়াছিলেন ; তাঁহার সময়ে রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে মোগল আর্মীরগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে চাঘাটাইর পুত্র কৈয়ুকাকে নির্বাচিত করিলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের অধিনেতৃনির্বাচন সম্বন্ধে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল, এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যেই মোগল অধিপতিগণ অধিনেতার অধীনতাপাশ ক্রমশঃ শিথিল করিতে লাগিলেন ; অবশেষে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন । চেঙ্গিস-সাম্রাজ্যের ঈদৃশ অবস্থা কোন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে নির্ধারণ করা সহজ নহে । পারস্য রাজ্যের অধিপতি আরঘুন খাঁ ১২৯১ খৃষ্টাব্দে রাজমুদ্রার অধিনেতার পার্শ্বে স্বনাম অঙ্কিত করিয়াছিলেন । এবং কাছান খাঁ ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে অধিনেতার নাম পরিত্যাগ করিয়া স্বনামে রাজমুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ, জুজি এবং চাঘাটাইবংশীয় অধিপতিগণ এই সময়েই স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন । অতঃপর চেঙ্গিসবংশীয় অধিপতিগণ স্ব স্ব রাজ্যে আপনাদিগকে সম্রাট নামে পরিচিত করিতেন ।

এই আত্মবিচ্ছেদের ফল কি হইয়াছিল ? অধিপতিগণ যতদিন সম্মিলিত ছিলেন, তাঁহাদের সুবিশাল সাম্রাজ্য ততদিন ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল । চেঙ্গিস সাম্রাজ্যের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যবর্গ মোগলের কবল হইতে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য সর্বক্ষণ সশঙ্ক থাকিতেন । চেঙ্গিসবংশীয় অধিপতিগণ দক্ষিণ চীনের বিজয় সম্পন্ন করেন এবং খলিফাদের রাজধানী বোগদাদ নগরের ধ্বংস সাধন করিয়া ধরা পৃষ্ঠ হইতে খলিফার আধিপত্য মুছিয়া

কেনেন । অল্পদিকে তাঁহারা ডন নদী উত্তীর্ণ হইয়া বালগেরিয়া ও পোলরাভ্যে মোগল-পতাকা উড্ডীন করেন । তার পর তাঁহারা হাঙ্গেরি, বসনিয়া, ডালমেশিয়া ও সাইনেশিয়া আক্রমণ করিয়া এবং ভারেনা-বিজয়ের উদ্ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত খৃষ্টজগৎকে সম্মানিত করিয়া তুলেন । এই ভাবে কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইলে, তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন । ইহার ফলস্বরূপ তাঁহারা ইউরোপের বিজিত দেশসমূহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন ; একমাত্র রুসিয়া দেশে তাঁহাদের আধিপত্য স্থির ছিল । ইহার পর তাঁহারা অন্তর্বিচ্ছেদে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়েন, এবং কোরিয়া সাগর হইতে আফ্রিকাটিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের চেঙ্গিস খাঁ নির্ধারিত বিভাগচতুষ্টয় শতধা বিভক্ত হইয়া যায় । এই ভাবে কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী গত হইলে তৈমুরলঙ্গ আবির্ভূত হন, এবং তাঁহার প্রদীপ্ত প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ার চেঙ্গিস খাঁর বংশীয় অধিপতিগণ দক্ষীভূত হন । - -

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, চেঙ্গিস খাঁ মৃত্যুকালে আপনার সুবিশাল সাম্রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্রত্রয় ও পৌত্র বটুকে প্রদান করেন, এবং কোলিক প্রধানুসারে কারসার নোয়ান তাঁহার (চেঙ্গিস খাঁর) প্রধান অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চাঘাটাই কারসার নোয়ানকে প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে আদিষ্ট হন, এবং তদনুসারে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বংশানুক্রমে চাঘাটাই-শাখার প্রধান ঋদ্ধগাদাতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন । আমরা চেঙ্গিস খাঁর উত্তরাধিকারিগণের প্রসঙ্গে অপর তিন শাখা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র চাঘাটাই শাখার বিবরণ প্রদান করিব ।

চেঙ্গিস খাঁ কর্তৃক নির্দিষ্ট চাঘাটাই রাজ্য বৃহদারতন এবং তিনটি

বিলিঙ্গ অংশ লইয়া সংগঠিত ছিল। (১) সির ও কাশঘরের উত্তরাংশস্থিত প্রদেশ ;—এই প্রদেশ দিগন্তবিস্তৃত এবং ইহার অধিকাংশ ভূগুণাদিশূন্য বালুকাময়, কদাচিৎ কোথাও লোকাবাস দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু এই মরুভূমিরও কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, প্রশস্ত হ্রদ, বিস্তীর্ণ পর্বতমালা ও শ্রামল সমভূমি দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু শীতাধিক্যবশতঃ যাযাবর অধিবাসিগণ স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকস্থ উষ্ণতর প্রদেশে আশ্রয় লইত। (২) দক্ষিণে জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদসমূহ এবং উত্তরে মরুভূমি ; ইহার মধ্যবর্তী কাশঘর ও ইয়ারখণ্ড প্রদেশ ;—যদিও এই দেশ বনসঙ্কুল ছিল, তথাপি বহুজনপূর্ণ কাশঘর, ইয়ারখণ্ড, খোটেন, আকসু ও তারকণ প্রভৃতি নগর এই দেশের শোভা-বর্ধন করিত। (৩) জাঙ্গারটিস নদীর উত্তর উপকূল হইতে দক্ষিণে হিন্দুকুশ ও হাজরা পর্বতমালা, তাসখণ্ড, সমরখণ্ড, বোখারা ও বাকু পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ ; এই সুসভ্য অমিতধনধাতুপূর্ণ দেশের আশ্চর্য্য যোজনব্যাপী শস্যক্ষেত্র ও সৌষ্ঠবশালী নগরমালায় খচিত ছিল।

সুবিস্তীর্ণ চাঘাটাই রাজ্যের অধিবাসিগণ পরস্পরবিরোধী নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। মরুভূমির যাযাবর জাতিই প্রথম অংশের অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহারা প্রবল স্বদেশানুরাগবশতঃ আপনাদের দেশকে তুলে নন্দনকাননতুল্য জ্ঞান করিত ; পার্শ্ববর্তী নগরসমূহের অধিবাসী ও কৃষকসম্প্রদায় ইহাদের অবজ্ঞাভাজন ছিল। ইহারা আপনাদের উচ্ছৃঙ্খল ও নিরবলম্ব জীবনযাপনপ্রণালীই উন্নত-মনা স্বাধীন জাতির অমুকরণীয় বলিয়া বিবেচনা করিত। দ্বিতীয় অংশের অধিবাসিগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় এক স্থান হইতে অপর স্থানে আপন আপন সুবিধামত স্থানান্তরিত হইত, এবং অপর সম্প্রদায় তথায় চিরস্থায়িভাবে বাস করিত। তৃতীয় অংশের অধিকাংশ অধিবাসীই

স্থায়ী ছিল । যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় দ্বারা চাঘাটাই রাজ্য পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই মোগলবংশসম্ভূত । ইহার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কালীমক নামক এক পরাক্রান্ত সম্প্রদায়ের বসতি ছিল ; ইহাদের আবাসস্থল চীনের প্রাচীরামুখে বিস্তৃত ছিল ।

এইরূপ নানাপ্রকার বিসদৃশ উপকরণে গঠিত রাজ্য প্রতাপশালী প্রতিভাবান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তক পরিচালিত না হইলে দীর্ঘকাল সম্মিলিত থাকিতে পারে না । বিশেষতঃ, অধিপতিগণের একাধিক পুত্র থাকিলে, তাহাদের মধ্যে সমভাবে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেওয়াই মোগলরাজ-বংশের কৌলিক প্রথা ছিল ; তাদৃশ প্রথাও আত্মবিচ্ছেদের অনুকূল । চেঙ্গিস খাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে মোগল-শাসন এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল যে, তাহার মৃত্যুর পরও বহু বংশের পর্য্যন্ত তদংশীয়েদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল ।

চেঙ্গিস খাঁর পুত্র চাঘাটাই প্রধানতঃ মরুভূমির মধ্যস্থিত স্বীয় রাজ-ধানী বিশবালিন নগরে বাস করিতেন ; কখনও কখনও বা কারাকোরাম নগরে ভ্রাতা ওকটাইর সঙ্গে কালযাপন করিতেন । রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বহু কার্যের ভার তদীয় প্রধান অমাত্য কারদার নোয়ানের প্রতি তুল্য ছিল । চাঘাটাইর উত্তরাধিকারিগণও প্রধানতঃ মরুভূমিতেই বাস করিতেন, কিন্তু হুরাকাজ্জা ও আত্মভেদ ক্রমশঃ তাহাদিগকেও আক্রমণ করিয়াছিল । চাঘাটাইর মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর মধ্যে তাহার সির ও আনু নদীর তটবর্ত্তী জনাকীর্ণ জনপদসমূহে বাস করিতে আরম্ভ করেন ; ইহার পর তাহার ক্রমশঃ এত নিস্তেজ ও সামর্থশূন্য হইয়া পড়েন যে, তাহার অবশেষে মঙ্গিগণের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হন ।

যদিও চাঘাটাই রাজ্য বিবাদ বিসম্বাদ ও অন্তর্দ্রোহে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তথাপি প্রথম ইসান বুগা খাঁর রাজত্বের পূর্বে যে উহার

কোনও অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহার সম্ভাষণজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না । ইমান বুগা খাঁর রাজত্বকালেই চাঘাটাই বংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হয় । ইহার এক রাজ্য মোগলভূমি ও কাশঘর প্রদেশ লইয়া গঠিত হইয়াছিল ; অপর রাজ্যের আধিপত্য মাওরাওন্বাহার দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

অতঃপর চেঙ্গিসবংশীয় যে সকল নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাপালনে অক্ষম বিলাসপটু রাজসিংহাসনাধিকারিমাাত্র ছিলেন । তাঁহারা ক্রোড়াকোতুকেই দিনাতিপাত করিতেন ; মন্ত্রিগণ তাঁহাদের নামে রাজ্যশাসন করিতেন । হুরাকাজ্জ মন্ত্রিসমাজের কার্যের অমুমোদন করিয়াই তাঁহারা রাজকীয় কর্তব্য সম্পন্ন করিতেন । মাওরাওন্বাহার প্রদেশে অরাজকতা দৃষ্ট হইতেছিল ; অন্তর্বিবাদেই দেশ মধ্যে হর্দশার একশেষ হইয়াছিল ; তদুপরি উত্তর প্রদেশ হইতে তাতারগণ প্রবল বহ্যার দ্বারা দেশে পতিত হইয়াছিল । এইরূপ সঙ্কটসময়ে অসাধারণ তৈমুরলঙ্গ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাস্ত করিয়া নবোদিত সূর্য্যের দ্বারা এসিয়ার ভাগ্যাকাশে উদিত হন ; তাঁহার সমুজ্জল কিরণে সমস্ত কুজ্জাটিকা তিরোহিত হয়, এবং মোগল জাতি পুনরায় নবতেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ।

চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয়কালে মোগলসমাজ অজ্ঞতা ও ধর্মহীনতার ঘোর ভামসে আচ্ছন্ন ছিল ; ঈশ্বরজ্ঞান একান্ত অপরিষ্কৃত ছিল । এই সময় তিব্বতে ও চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল ; তাহাদের সংস্পর্শে মোগল-জাতি কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছিল । কিন্তু তাহাতে মোগলসমাজের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় নাই, অথবা তাহাদিগকে ধর্মবিধানী করিয়া তুলিতে পারে নাই ।

চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর মোগল জাতির মধ্যে ইসলাম ধর্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। জুজি খাঁর পোত্র (বড়র পুত্র) উজ্জাবল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া নবোৎসাহে আপনার রাজ্যে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। কিপচাক দেশে উজ্জবেক খাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাঁহার অক্রান্ত চেষ্টায় ও যত্নে সমগ্র কিপচাকবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

তৎপরে চাঘাটাই বংশের তোগলক তৈমুর খাঁ অধিনেতৃত্বপদে বৃত্ত হইয়া ইসলাম ধর্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন, এবং তিনি স্বয়ং দীক্ষিত হইয়া আপনার প্রজাবর্গের কিয়দংশকেও কোরাণোক্ত ধর্মে বিধানী করিতে সমর্থ হন। তৎপরে ক্রমশঃ ইসলাম ধর্মের জ্যোতিঃ সমগ্র মোগলজাতির মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তৈমুরলঙ্গের অভ্যুদয়-কালে উহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।



তৈয়ুরলঙ্গ ।

—:o:—

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস খাঁ দ্বিতীয় পুত্র চাঘাটাইকে স্বীয় সুবিশাল সাম্রাজ্যের একাংশ প্রদান করিয়া অমাত্যশ্রেষ্ঠ কারসার মোয়ানের মন্ত্রণাক্রমে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে আদেশ করেন । চাঘাটাই তদনুসারে কারসার নোয়ানকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । তদবধি কারসারের উত্তরাধিকারিগণ বংশানুক্রমে চাঘাটাইবংশীয়গণের প্রধান মন্ত্রণাদাতার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।

চাঘাটাইর মৃত্যুর পর তদীয় বংশধরগণ আত্মকলহে ক্রমশঃ দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের সুবিস্তীর্ণ রাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া যায় । এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে ইমান বুগা খাঁর রাজত্বকালে চাঘাটাই রাজ্য দ্বিভাগে বিভক্ত হয় । মোগলভূমি ও কাশঘর প্রদেশে এক শাখার অধিপতিগণ রাজত্ব করিতে থাকেন, এবং মাওরাওন্যাহার প্রদেশ লইয়া অপর শাখার রাজ্য গঠিত হয় । (১)

এই ভাবে চাঘাটাই রাজ্য দ্বিভাগে বিভক্ত হইলে, কারসার নোয়ানের বংশধরগণ মাওরাওন্যাহার প্রদেশে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন ।

কারসার নোয়ান রাজনীতিবিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন ; চাঘাটাই তাঁহার হস্তে শাসন-সংরক্ষণ-সংক্রান্ত যাবতীয় ভার গ্ৰস্ত করিয়া

(১) চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুকালে তদীয় তৃতীয় পুত্র ওকতাই পিতৃনির্দেশমত মোগল ভূমির অধিকারলাভ করেন । কোন সূত্রে এই দেশ চাঘাটাই-বংশীয়গণের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা নির্দেশ করা সহজ নহে ।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওকতাইর সঙ্গে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন । যদিচ ওকতাই তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি তিনি পিতৃ-নির্দেশমত তাঁহাকে অধিনেতা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না ।

কারসার নোয়ান রাজ্যমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন, এবং চাঘা-টাইর মৃত্যুর পর আপনার ইচ্ছামত তদীয় বংশধরগণকে রাজ্যচ্যুত অথবা সিংহাসনাভিষিক্ত করেন । কারসার উননবতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন ;—এই সময় তিনি পদগোরবে ও ক্ষমতার রাজ্যমধ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার সমুজ্জল যশোরাশি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল ।

কারসার নোয়ানের পুত্রগণের মধ্যে আইজাল নোয়ান জ্ঞান ও ধর্ম্মে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পিতৃপদে অভিষিক্ত হন । তাঁহার বীরত্ব ও শাসননৈপুণ্যে রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । কিন্তু চাঘা-টাইর বংশধরগণের মধ্যে প্রবল আত্মকলহ উপস্থিত হইলে, তিনি বিরক্ত হইয়া স্বীয় পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশ নামক নগরস্থ পৈতৃক বাসভবনে প্রমত্ত হইয়া গমন করেন ।

আইজাল নোয়ানের পর তদীয় পুত্র আমীর আইলনগর মন্ত্রিপদ লাভ করেন । তিনি এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত দক্ষতা ও ভেদাভিমান সহকারে স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হন । আমীর আইলনগরের পরলোকপ্রাপ্তির পর তদীয় পুত্র আমীর বকরল খাঁ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন । কিন্তু তিনি সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মসাধনে নিরত থাকিতেন বলিয়া অন্য কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইতেন না । একান্ত তিনি ভ্রাতৃগণের হস্তে সমস্ত কার্যের ভার হস্ত করিয়া কেশ নগরে স্বাধীনভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন । তিনি আপনার যৎসামান্য

আগের দ্বারা ই জীবনযাত্রা নির্বাহিত করিতেন, এবং তজ্জনিত সমস্ত কষ্ট অমানবদনে সহ্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই । ফতল: তিনি সর্বগুণের আধার ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন ।

আমীর বকরল মানবলীলা সংবরণ করিলে, তদীয় পুত্র আমীর তরা-ঘাই পিতৃপদে নিযুক্ত হন । তিনিও ধর্মপরায়ণ পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন, এবং সর্বদা সাধুসঙ্গে কালাতিপাত করিতেন । তাঁহার গৃহে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ জন্মপরিগ্রহ করেন । তৈমুরলঙ্গের পূর্ববর্তী অষ্টম পুরুষ কাজুলী বাহাছর স্বপ্নবোধে স্বীয় বংশে এক অপূর্বদীপ্তি-সম্পন্ন নক্ষত্ররাজের আবির্ভাব অবলোকন করিয়াছিলেন । মোসলমান ইতিহাসবেত্তাগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, কাজুলী বাহাছরের স্বপ্নদৃষ্ট নক্ষত্ররাজ তৈমুরলঙ্গের আবির্ভাবেরই পূর্বাভাস প্রদান করিয়াছিল ।

তৈমুরলঙ্গের অভ্যুদয়ের প্রাকালে মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল? দিল্লী দরবারের রাজকবি খুসরু ইহার এক শতাব্দী পূর্বে বন্দী হইয়া মোগলভূমিতে নীত হইয়াছিলেন । তৎকালে মোগলগণের আচার-বাবহার পশুচিত ছিল বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন । (১) তাঁহার

(১) "There were more than a thousand Tatar (i. e. Mughals) infidels and warriors of other tribes, riding on camels, great commanders in battle, all with steel like bodies clothed in cotton, with faces like fire, with caps of sheep skin, with their heads shorn. Their eyes were so narrow and piercing that they might have bored a hole in a brazen vessel. Their stink was more horrible than their colour. Their faces were set on their bodies as if they had no neck. Their cheeks resembled soft leathern bottles, full of wrinkles and knots. Their noses extended from cheek to cheek, and their mouths from cheek-bone to cheek-bone. Their nostrils resembled rotten graves, and from them the hair descended as far as the lids. Their moustaches were of extravagant length. They had

বর্ণনা অতিরঞ্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা পাঠে প্রতীত হয় যে, সে সময় মোগল সমাজ সভ্যতার নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল। চেরিস খাঁর মৃত্যুর পর এসলাম ধর্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া পর-বর্তী এক শত বৎসরের মধ্যেই মোগল জাতিকে অনেক পরিমাণে জ্ঞানোজ্জ্বল করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গের সময় সমরথন্দ ও বোখারা প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর বাণিজ্য, শিল্প ও শিকার কেন্দ্রস্থল বলিয়া বিখ্যাত ছিল। চেরিস খাঁর সময় হইতে মোগলগণ বহুদেশ ও রাজ্য বিজয় করিয়াছিল। বিজেতা অধিপতি বিজিত শাসকের বিধবা মহিষী অথবা কন্যাকে পরিণয়মুত্রে আবদ্ধ করিতেন। মোগল অধিপতিগণ অপেক্ষাকৃত সভ্য দেশে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে তাঁহাদের আচার ব্যবহার বহুলপরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে বিলাস-পরায়ণ ও শারীরিক-আরামপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনু-করণে মোগলজনসাধারণের মধ্যেও অল্লাধিক পরিবর্তন ও বিলাসশ্রোত আসিয়াছিল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য বীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিত; কিন্তু উহা সাময়িক উত্তেজনার ফলমাত্র ছিল। তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্য মিথ্যাকথনে ও বড়বাক্সেই পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু তাহারা প্রত্যেক ব্যাপারেই চতুরতা, উৎসাহ ও সাহসের পরিচয় প্রদান করিত। তাহারা স্বভাবতঃ বাহাদুরপ্রিয় ও অমিতব্যয়ী ছিল। রাজকুলবর্গ পশুপালক-জীবনমূলভ চাকল্য পরিত্যাগ করিয়া সভ্যোচিত

but scanty beards about their chins. Their chests, of a colour half black, half white were so covered with lice, that they looked like sesame growing on a bad soil. Their whole body, indeed was covered with these insects, and their skin as rough grained as chagreen leather fit only to be converted into shoes. They devoured dogs and pigs with their nasty teeth.' Kirasm-ssadain of Amir Khusru.

আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শিবিরে শিবিরে জীবনযাপনপ্রণালীর উপর বীতশ্রু হইয়াছিলেন ; কিন্তু নাগরিক জনের প্রয়োজনীয় অধাবসায় ও শৃঙ্খলার তখনও সম্পূর্ণ অভাব হইতে পারেন নাই । তাঁহারা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিবার সমস্ত কৌশলই অবগত ছিলেন ; কিন্তু রাজ্যশাসনসম্পর্কে আভ্যন্তরীণ বিষয় সকল নিরক্ষিত করিবার সম্যক পারদর্শিতা তাঁহাদের ছিল না । যদিচ এসলাম ধর্মের প্রবর্তনে এবং রাজ্যজরোপলক্ষে অপেক্ষাকৃত সত্য জাতির সহিত সংমিশ্রণে মোপলগণ কিয়ৎপরিমাণে বিলাসোন্মুখ ও নৈতিক অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের জীলোকপন পূর্ববৎ পশুপালক জীবনশ্রুত সদগুণরাশিতে শোভিতা ছিলেন । তাঁহারা সাহসিনী, পতির অনুরাগিণী এবং সরলহৃদয়া ছিলেন ।

এই সমাজে তৈমুর (১) ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জামল নগর নামে প্রসিদ্ধ কেলী সহরে (২) জন্মপরিগ্রহ করেন । তৈমুরলঙ্গ যুগয়া, অশ্বারোহণ ও যুদ্ধবিজ্ঞানশিক্ষার বাল্য ও কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়া অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন । এই সময় মাওরাওরাহার রাজ্য আত্মকলহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল ; চাঘাটাই-বংশীয় একজন দুর্বলচিত্ত রাজা (তরমাসি-রিন খাঁ) সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না ; আমীরগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি অবাধে তাহাই করিতেছিলেন । এই সকল কারণপরম্পরায় যখন দেশমধ্যে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, তখন কাশঘরের

(১) লঙ্গ শব্দের অর্থ যুগ ; তৈমুর যুগ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে তৈমুর-লঙ্গ বলিত ।

(২) It was called the Green City on account of the verdure of its gardens. It has been described by Babar. • • • It is generally reckoned a day's journey from Samarcand.—H. Beveridge.

৪। খ্রিষ্টীয় এবং কালমাক্স জাতীয় বহুসংখ্যক সৈন্তসহ মাওরা ওয়াহির রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং পিতৃ-আজ্ঞার একবিংশবর্ষবয়স্ক তৈমুর স্বদেশ-উদ্ধারার্থ বহুপরিকর হইলেন ।

এই দুর্দশার সময়ে দেশবাসীগণ সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া নীরব রহিল ; কেহই তৈমুরলঙ্গের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না । তৈমুরলঙ্গ এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বদেশবাসিগণের প্রতীক্ষার অবস্থান করিয়া কেবল-মাত্র ৬০ জন অস্বারোহী সৈন্তসহ মরুভূমি অভিযুখে পলায়ন করিলেন । এক সহস্র শত্রুসৈন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সন্নিকটস্থ হইলে, তিনি অসাধারণ শোচ্য বীৰ্য্য প্রকাশ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্ত হত্যা করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন । শত্রুসৈন্ত তাঁহার অসম সাহস ও প্রবল পরাক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিল । কিন্তু এই সংঘর্ষে তাঁহার নিজের অনুচরগণ মধ্যেও অধিকাংশ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল ; কেবলমাত্র দশ জন অবশিষ্ট ছিল । ইহাদের মধ্যেও তিনজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল । তৈমুর সাত জন অনুচর, স্ত্রী ও চারিটি অশ্ব সহ বাতাতাড়িত বৃক্ষপত্রের স্তার মরুভূমির নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ।

ইহাতেও তৈমুরলঙ্গের দুর্দশার শেষ হয় নাই বলিয়াই যেন শত্রুগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া অন্ধকূপতুল্য কারাগারে নিষ্শিষ্ট করিল । তৈমুর স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে এই কারাবন্দনকে যক্ষিকামশকসমাকুল গোশালা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । যাহা হউক, তিনি সেই কারার ত্রিপঞ্চাশৎ দিন অতিবাহিত করিয়া অসাধারণ সাহস প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করিলেন । সুপ্রশস্ত বেগবতী অক্সাস নদী সত্তরণপূর্বক উত্তীর্ণ হইয়া পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সমূহের প্রান্তদেশে তিনি ভিক্ষুবেশে কতিপয় মাস অতিবাহিত করিলেন ; এই সময় তিনি রাজদ্রোহিরূপে পরিগণিত

ছিলেন । প্রতিকূলবাহার পতিত হইয়া তাঁহার যশোরাশি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, এবং তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অশিষ্ট হইয়া উঠিলেন ।

তৈমুর নির্কাসন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে দলে দলে স্বদেশবাসিগণ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া সমবেত হইল, এবং তিনি অচিরে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন । এই সময় আমীরগণ তাঁহার একান্ত অমুরক্ত হইলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আপনাদের সুখ দুঃখ এক সূত্রে প্রযুক্ত করিলেন । আমীরগণ তাঁহার সঙ্গে কিরূপ স্নেহভাবের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা এ স্থলে একটি ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি । তৈমুরলঙ্গ লিখিয়াছেন, “যখন তাঁহাদের (তিন জন আমীরের) দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল, তখন তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্বক আমার সম্মুখানে উপনীত হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, এবং আমার জ্বীনের রেকাব চুম্বন করিলেন । আমিও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলাম । প্রথম আমীরের মাথায় আমার পাগড়ী স্থাপন করিলাম, দ্বিতীয় আমীরের কোমরে আমার মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণনির্মিত কোমরবন্ধ বাধিয়া দিলাম, তৃতীয় আমীরকে আমার অঙ্গরক্ষা পরিধান করাইলাম । তাঁহারা অক্রমোচন করিতে লাগিলেন ; আমার চক্ষুও বাম্পাকুল হইয়া উঠিল । নমাজের সময় উপস্থিত হইলে আমরা প্রার্থনা করিলাম, এবং তারপর অনারোহণে আমরা ভবনে উপনীত হইলাম । আমি স্বগৃহে পহুঁছিয়া লোকজন সংগ্রহ করিয়া ভোজ প্রদান করিলাম ।”

তৈমুরের বিশ্বস্ত সৈন্যদল শীঘ্রই রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইল ; তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং যশস্বত্রে

কিছুদিন অরপরাধের পর তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন । তৈমুর পঞ্চবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বদেশের উদ্ধারকর্তা বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত হইলেন, এবং জনসাধারণ তাঁহাকে স্বদেশের হিতার্থ উৎসৃষ্টজীবন বীরপুরুষ বলিয়া হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল ।

যদিও তৈমুর আপনার প্রতিপত্তির জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি তখনও তিনি রাজ্য মধ্যে সর্ব্বসর্ব্ব হইয়া উঠিতে পারেন নাই । বাহা হউক, তিনি অচিরেই বাহুবলে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বশীভূত করিলেন, এবং এমিরার ভাগ্যাকাশে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন । চতুস্ত্রিংশবর্ষবয়ঃক্রমকালে তৈমুর শক্তি ও প্রতিপত্তিতে রাজ্যমধ্যে অধিতীয় হইয়া উঠিলেন, এবং সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা অধিকৃত করিলেন ।

তৈমুরলঙ্গের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে মাওরাওরাহার রাজ্যের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এজন্য মোগলগণ তাঁহাকে প্রভুদ্রোহী বলিয়া মনে করিত । মন্ত্রী কারসার চাঘাটাইর কঙ্কার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তৈমুরের শরীরেও রাজরক্ত প্রবাহিত ছিল । যদিও তিনি সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা গ্রাস করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার নিজের নামে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত না । তৈমুরলঙ্গ রাজবংশীয় সাতেরঘাটমিস খাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার নামেই সমস্ত রাজবিধি প্রচারিত করিতেন । কিন্তু এই খাঁর কোনও ক্ষমতাই ছিল না ; তিনি নামমাত্র রাজা ছিলেন । তৈমুর কখনও রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই ; বংশানুগত উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন । তাঁহার উপাধি আমীর গুরগান ছিল । এই সব কারণে নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, যদিও তৈমুর রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতা নিজে গ্রাস করিয়া-

ছিলেন, তথাপি আপনাকে রাজ্যের সর্বপ্রধান মন্ত্রী বলিয়াই বিবেচনা করিতেন ।

অতঃপর তৈমুরলঙ্গ নিঃশত্রু হইয়া এবং রাজ্যশাসন জন্তু শৃঙ্খলা-স্থাপন করিয়া পররাজ্যহরণ ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন । তিনি প্রথমতঃ কাশঘরের খাঁর আচরণের প্রতিশোধ লইবার জন্তু তদীয় রাজ্য তুর্কিস্তান আক্রমণ করিলেন । জেটিস সৈন্ত তৈমুরের প্রবল পরাক্রম সহ করিতে পারিল না ; তিনি সসৈন্তে সিহন নদী উত্তীর্ণ হইয়া কাশঘর রাজ্য (তুর্কিস্তান) অধিকার করিলেন, এবং ক্রমান্বয়ে সাত বার এই দেশ ঘনন করিলেন । এই যুদ্ধে ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল ।

কাশঘর যুদ্ধ অবসানের পূর্বেই তৈমুরলঙ্গ পারস্ত দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন । এই দেশের অধিপতি আবু সৈয়দের মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্য অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং শান্তি ও শাসন-বিচার চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল ; রাজ্যের সামন্তবর্গ স্ব স্বপ্রধান হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । পারস্ত দেশ আক্রমণ করিবার জন্তু ইহাই সুযোগ মনে করিয়া তৈমুরলঙ্গ সসৈন্তে দারদেশে উপনীত হইলেন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যবর্গ সকলে স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু পরে একে একে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিলেন । প্রথমতঃ আন বেনিয়ার অধিপতি ইব্রাহিম বশুতা-স্বীকার করিয়া নানাবিধ উপহার দ্রব্য সহ তৈমুরের শিবিরে উপনীত হইলেন । প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার আনীত প্রত্যেক দ্রব্য সংখ্যায় নম্রটি ছিল । কিন্তু একজন দর্শক বলিয়া উঠিলেন, “আট জন মাত্র ক্রীতদাস দেখিতেছি ।” ইব্রাহিম এইরূপ মন্তব্যের জন্তু প্রস্তুত ছিলেন ; সুতরাং তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “আমি স্বয়ং নবম সংখ্যার পূরণ করিতেছি ।” তাঁহার তোমামোদবাক্যে তৈমুর ঈষৎ হাস্য করিলেন,

এবং ইহাতেই ইব্রাহিম আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন । তার পর তৈমুর ক্রমশঃ সিরাজ, ওরমাজ, বোগদাদ, এডিসা প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিয়া সমগ্র পারস্ত দেশ বশীভূত করিলেন । সমগ্র দেশে আধিপত্যস্থাপন করিতে তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল ।

পারস্তবিজয় সম্পূর্ণ করিবার তিন বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে, তৈমুরলঙ্গ কিপচাক (পশ্চিম তাতার) রাজ্য আক্রমণ করেন । তক্তামিস নামক জনৈক রাজকুমার স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তৈমুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তৎপরে তাঁহার সৈন্তের সাহায্যে কিপচাকের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন । কিন্তু দশ বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর তক্তামিস পূর্বোপকার বিস্মৃত হইয়া নবতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত সহ সিহুন নদী উত্তীর্ণ হন, এবং তৈমুরের প্রাসাদাবলী ভস্মীভূত করেন । তক্তামিসের প্রবল আক্রমণে বিব্রত হইয়া তৈমুর সমরখন্দ ও নিজের জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধে ব্যাপ্ত হন, এবং সামান্য সংঘর্ষের পর সমর-ক্ষেত্রে জয়লাভ করেন ।

এইবার তৈমুরলঙ্গের প্রতিশোধ লইবার পাল উপস্থিত হইল । তিনি পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক হইতে ক্রমান্বয়ে দুইবার কিপচাক রাজ্য আক্রমণ করিলেন । তাঁহার সৈন্তসংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তাহার সমাবেশ করিবার জন্য এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সার্ব্ব এক যোজনব্যাপী স্থানের আবশ্যক হইত । তৈমুর-সৈন্তের আগমন-সংবাদে অধিবাসিগণ স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল ; তৈমুরের সৈন্তগণ পাঁচ মাসের অভিযানেও শত্রুর সাক্ষাৎ পাইল না, এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী অভিযানকালে তাহাদিগকে কখনও কখনও কেবলমাত্র মৃগদালক মাংস দ্বারাই ক্ষুদ্রিভূতি করিতে হইত । যাহা

হউক, অবশেষে উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শত্রুপক্ষের পতাকাধারীর বিশ্বাসঘাতকতায় তৈমুর সমরক্ষেত্রে জয়লাভ করিলেন, এবং তাঁহার অমানুষিক অত্যাচারে সমগ্র কিপচাক-ভূমি ছারখার হইল। তুর্কামিস বাতাতাড়িত বৃক্ষপত্রের স্থায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং তৈমুর পলায়িত শত্রুর পশ্চাৎকা-বন করিয়া কৃষিয়ার করদ প্রদেশে উপনীত হইলেন। শত্রুর আমগনে মস্কো নগর কম্পিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তৈমুর কৃষিয়ার রাজধানী আক্র-মণ না করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথা হইতে তৈমুর ভলগা নদীর তীরে পহুঁছিলে সমৃদ্ধিশালী আজপ নগরের বণিকগণ সমগ্রমে তাঁহার বশুতা স্বীকার করিল। কিন্তু ধনরত্নপূর্ণ নগর লুণ্ঠন করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি সসৈন্য তথায় উপনীত হইলেন, এবং অগ্নিসংযোগে সূদৃশ অট্টালিকাসমূহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সেরাই ও অষ্ট্রাকান নগরদ্বয় ভস্মীভূত করিয়া সগৌরবে সমরথন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এইবার তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। পৌত্তলিক জাতিকে কোরাণোক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত অথবা বিনাশ করিবার জন্ত যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা এসলাম-ধর্ম্মের অনুশাসনানুসারে মোসল-মানের অবশ্য-অনুষ্ঠেয় কর্তব্য কল্প। যিনি তাদৃশ ধর্ম্মযুদ্ধে পৌত্তলিক-দিগকে বিনাশ করিতে পারেন, তিনি গৌরবজনক গাজি উপাধি লাভ করিয়া মোসলমান সমাজে সম্মানিত হন। তৈমুরের মোসলমান ধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; সুতরাং তিনি পৌত্তলিকদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়া গৌরবজনক গাজি উপাধি লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হই-লেন। এই সময় ভারতবর্ষ ও চীনদেশ পৌত্তলিক জাতির আবাসভূমি ছিল। এ জন্ত এই রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে কোন্টি আক্রমণ করিবেন, তাহার

মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী বলিয়াই
 হৃদাগিনী। ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্ব্যের জনশ্রুতি তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ
 করিল। তিনি হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। (১)
 তৈমুর স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, “প্রভূত
 কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও আমি ছই কারণে ভারতবর্ষে আগমন
 করিয়াছি। প্রথমতঃ, এসলাম ধর্মের শত্রু পৌত্তলিকগণের বিরুদ্ধে
 ধর্মযুদ্ধে ব্যাপ্ত হইলে পরলোকে পুরস্কারলাভ করিতে পারিব। দ্বিতী-
 য়তঃ, এসলাম সৈন্য পৌত্তলিকদিগের ধন রত্ন লুণ্ঠন করিবার অবসর
 প্রাপ্ত হইবে। যে সকল মোসলমান ধর্মার্থ যুদ্ধ করে, তাহাদের পক্ষে
 লুণ্ঠনকার্যে নিরত হওয়া মাতৃদুগ্ধপানের ছায় শাস্তসঙ্গত।” তৈমুর
 ইচ্ছাপূর্বক ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের তদানীন্তন সম্রাট
 এসলামধর্মাবলম্বী ছিলেন, এবং তথাকার মোসলমান অধিবাসীর
 সংখ্যাও নগণ্য ছিল না।

তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বৃক্ষপত্রের ছায় অগণিত সৈন্য
 সমভিব্যাহারে (২) ভারতবিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পশ্চিমঘো

(১) তৈমুরের পৌত্র মীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি
 মুলতান নগর আক্রমণ করিয়া কৃতকাব্য হইতে না পারিয়া পিতামহের নিকট সাহায্য-
 প্রার্থা হন। তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন; এমন
 সময় পৌত্রের আবেদনপত্র তাঁহার হস্তগত হয়। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি
 আপনার সকল কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হন এবং পৌত্র মীর মোহাম্মদকে সাহায্য
 করিবার ক্ষমতা ক্ষিপ্ৰগতিতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি মুলতান
 নগরের দ্বারদেশে উপনীত হইবার পূর্বেই জাহাঙ্গীর অর্ধবৎসরব্যাপী অব্যবহৃত পর
 উহা হস্তগত করেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে দুর্গবাসিগণের দুর্দশার একশেষ হইয়া-
 ছিল, দুর্গমধ্যে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল; এমন কি, একটি বিড়াল অথবা
 মূষিকও জীবিত ছিল না।

(২) With an army as numerous as the leaves of trees.—*Zafarnama*

ইন্দ্রাব নামক স্থানের মোসলমান অধিবাসিগণ কাটোর জাতির বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল ।

কাশ্মীর রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ হইতে কাবুলের গাত্রসংলগ্ন পর্বতমালা পর্যন্ত কাটোর জাতির আধিপত্য বিস্তৃত ছিল । কাটোরভূমিতে এসলাম ধর্মের জ্যোতিঃ প্রবেশ করিয়াছিল না । তৈমুর ইন্দ্রাবের অধিবাসীদিগকে তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তথায় গমন করেন । কাটোর দেশ প্রকৃতির দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত । মোগল সৈন্যকে এই স্থানে উপস্থিত হইতে বরফময় ও তুষারমণ্ডিত সমুচ্চ পর্বত লঙ্ঘন, সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ অতিক্রম ও ছারোহ পর্বতশৃঙ্গ পরিক্রমণ করিতে হইয়াছিল । তাহারা কষ্টসহিষ্ণুতার একশেষ প্রদর্শন করিয়া এই সমস্ত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া তথায় উপনীত হইল ; এবং সমগ্র কাটোরভূমি মছন করিয়া নিহত কাটোর অধিবাসীদিগের কঙ্কালরাশির দ্বারা তথায় স্মৃতিস্তম্ভস্থাপনপূর্বক সগোরকে পুনরায় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল ।

তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আটক নগরের নিকট সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার পদার্পণে ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল । এই সময় দিল্লীর রাজশক্তি গৃহকলহ ও অন্তর্বিপ্লবে সাতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল । তদানীন্তন সম্রাটের এমন শক্তি ছিল না যে, তিনি তাদৃশ বিপুল সৈন্যের প্রতিরোধ করিবার জন্য বীরদর্পে দণ্ডারমান হইতে পারেন । সুতরাং তৈমুরলঙ্গ অবাধে নগরলুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতে করিতে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তখন আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্তগণ একে একে অবনতমস্তকে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং রক্ষকহীন অধিবাসিগণ

প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল । তৈমুরলঙ্গ অগণিত সেনা লইয়া যে যে স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাহা দাবদগ্ধ বনভূমির স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । পঞ্চনদ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ মোগল সেনার পদস্পর্শে বিধ্বস্ত হইয়া গেল ; মোগল সৈন্য সহস্র সহস্র গৃহদগ্ধ, উদরপুষ্টির জন্য শস্যভাণ্ডারলুণ্ঠন, কামানলে অসংখ্য হিন্দু রমণীকে আত্মপ্রদান ও নিরপরাধ ভারত-বাসীর রক্তশ্রোত প্রবাহিত করিল । মোগল সৈন্যের কবল হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইল না ; যাহারা তরবারি-মুখে নিহত হইল না, তাহারা স্ত্রীপুরুষবাণবৃদ্ধনির্বিশেষে শত্রুহস্তে বন্দী হইল । এই ভাবে বিপাশা নদীর তীরস্থ নশবৎখোকরের শাসিত প্রদেশ, ততনির দুর্গ, সরস্তু নগর (১) ও ফতেবাদ প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী স্থান বিনষ্ট করিয়া তৈমুর এক লক্ষ বন্দী লইয়া ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে দিল্লীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন ।

তৈমুরলঙ্গ দিল্লীর অদূরে শিবিরসংস্থাপন করিলে নগরবাসীরা দৈন্ত সংগ্রহ করিয়া তাঁহার আগমনে বাধাপ্রদান করিতে উদ্যত হইল । তৈমুর এক লক্ষ বন্দী সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; উত্তর সৈন্যে সংবর্ধণ উপস্থিত হইলে এই বন্দীর দল মোগল সৈন্যকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, তিনি এক লক্ষ নরনারীকে পশুর স্তায় বধ করিবার আদেশ দিলেন । তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল । যে সকল মোগল এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, তাহারাও কঠোর রাজাজ্ঞায় ভীত হইয়া নররক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিল । মোলানা নাশিরউদ্দীন ওমর নামক একজন সুবিখ্যাত কোমলহৃদয় ধর্মবেত্তা এই সময় মোগল-শিবিরে উপস্থিত ছিলেন । বসিঃ তিনি

জীবনে কখনও একটি মেঘশাবককেও হত্যা করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন নাই, তথাপি এবার স্বহস্তে পঞ্চদশটি বন্দীর প্রাণ বিনষ্ট করিতে বাধ্য হইলেন । ফলতঃ বোধ হয়, জগতের আর কোন রাজাই ঈদৃশ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন নাই । (১)

১৭ই ডিসেম্বর দিল্লীর সম্রাট সুলতান মাহমুদ দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী, চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্ত ও শতাধিক রণনিপুণ হস্তী লইয়া শত্রুসৈন্ত বিধ্বস্ত করিতে সমাগত হইলেন । ইহার পূর্বে মোগল সৈন্ত শত শত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা আর কখনও রণনিপুণ হস্তীর সম্মুখীন হয় নাই । এ জন্ত তাহারা এতদূর ভীত হইয়া পড়িল যে, তৈমুরলঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজপুরুষগণের জন্ত স্থান নির্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বখন সমবেত শাস্ত্রবেত্তা পারিষদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কোথায় অবস্থান করিবেন, তখন তাঁহারা উত্তর করিলেন, “আমরা মহিশাগণের সঙ্গে একত্র অবস্থান করিব ।” তৈমুরলঙ্গ স্বীয় সৈন্তদিগকে ভীতিবিহ্বল দেখিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে সম্মুখ-ভাগে palisades স্থাপন ও পরিধা খনন করিলেন, এবং তার পর বহুসংখ্যক মহিষকে গলদেশে চর্মপটী দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া উহার পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিলেন ।

শত্রুসৈন্ত সম্মুখীন হইলে তৈমুরলঙ্গ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া উর্দ্ধমুখে ঈশ্বরোপাসনার নিরত হইয়া জয়কামনা করিলেন । প্রার্থনা সাঙ্গ হইলে তিনি শত্রুসৈন্ত আক্রমণ করিবার জন্ত আদেশ করিলেন । মোগলসৈন্ত কালান্তক যমের স্তায় শত্রুর উপর পতিত হইল । প্রতিপক্ষ

(১) ইহার সাক্ষি তিন শত বৎসর পরে পারস্তের অধিপতি নাদির শাহ দিল্লীতে এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহার নিকট সে হত্যাকাণ্ডও পৈশাচিক ভায়ে নিম্নস্ত হইয়া পড়ে ।

ভাদ্র প্রবল পরাক্রম সহ করিতে না পারিয়া ঝঞ্ঝাবায়ুতড়িত বৃক্ষপত্রের
 ঞ্চার চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল ; বিজয়লক্ষ্মী তৈমুরের অঙ্কশাধিনী
 হইলেন ।

সুলতান মাহমুদ পরাজিত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।
 তিনি স্বরাজ্যরক্ষার জন্য তৈমুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন
 বলিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন । উপারাস্তর না দেখিয়া গুজরাটে
 পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন ।

তৈমুরলঙ্গ দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট
 বলিয়া ঘোষণা করিলেন । তাঁহার আদেশে দিল্লীর মসজিদে তদৌর
 নামে খোতবা পঠিত হইল । তৈমুর মহাসমারোহে সিংহাসনে আরো-
 হণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । নির্দিষ্ট দিনে
 দিল্লীর প্রধান প্রধান সামন্ত ও রাজপুরুষগণ রাজসভায় সমাগত হইলে
 তৈমুরলঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । সুমধুর তুর্ক ও তাজিক
 সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে তাঁহার গৌরবপূর্ণ নাম চতুর্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল ।
 নমবেত সভাবৃন্দ একে একে তৈমুরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করি-
 লেন । নবাভিষিক্ত সম্রাট তাঁহাদিগকে পরমসমাদরে গ্রহণ করিয়া
 নানাবিধ মহার্ঘ দ্রব্য উপহার দিলেন, এবং অবশেষে সুরা ও সরবত
 বিতরণ পূর্বক সভাভঙ্গ করিলেন ।

ইহার এক সপ্তাহ পরে দিল্লীতে ভয়ঙ্কর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ
 হইল । মোগলসৈন্য দিল্লীর উপকণ্ঠে অবস্থান করিতেছিল ; কেবলমাত্র
 পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য নানাবিধ কার্যোপলক্ষে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া-
 ছিল । এই দুর্দান্ত সৈন্যদল আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া নগরলুণ্ঠনে
 প্রবৃত্ত হইল । তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দলে দলে বিজয়ো-
 মত্ত মোগলসৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা ও লুণ্ঠনকার্যো ব্যাপ্ত

হইল । সহস্র সহস্র হিন্দু মোগল-হস্ত হইতে পরিব্রাণলাভ করিবার জন্য স্বগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া স্ত্রীপুত্র সহ অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করিল । মোগলসৈন্য শোকা ও সন্দেহের আধার দিল্লীনগরী পাঁচ দিন পর্য্যন্ত মহন করিল । উন্নত মোগল সৈন্য সিরি ও জাহান পারার সূদৃশ প্রাসাদাবলী ভূষিমাৎ করিল ; অসংখ্য নরনারী শত্রুহস্তে বন্দী হইল ; প্রত্যেক সেনানী অস্ত্রতঃ বিংশতি জন নগরবাসীকে বন্দী করিল ; কাহারও কাহারও হস্তে ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ বন্দী পতিত হইল ; নৃশূন্যলোলুপ সৈন্যগণ বন্দিনী হিন্দুরমণীর বহুমূল্য গাত্রালঙ্কার অপহরণ করিল । মৃতদেহরাশিতে রাজপথ এমন ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল যে, যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল । পাঁচ দিন পরে এই প্রচণ্ড অনল আর ভোগ্য বস্তু না পাইয়া আপনা-আপনি নির্বাপিত হইল । (১)

(১) আমরা এই বিবরণ তৈমুরের স্বরচিত জীবনবৃত্ত ও তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস জাকরনামা হইতে সংকলিত করিয়াছি । এই অমানুষিক অত্যাচারের মূলে তৈমুরের আদেশ ছিল কি না, তাহা পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কোথাও স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই । বরং কোন কোন সৈন্যদল অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে তিনি তাহার নিবারণ করিয়াছিলেন, স্বরচিত জীবনবৃত্তে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, তৈমুর বিজয়োৎসবে মত্ত ছিলেন, এ দিকে তদীয় সৈন্যবৃন্দ এই অমানুষিক অত্যাচারে লিপ্ত হইয়াছিল । অত্যাচারের পঞ্চম দিনে নগরের ধুমরাশি দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল । এ বিষয়ে ইতিহাসবেত্তা ফেরিস্তা যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ।

“Then followed a scene of horror much easier to be imagined than described. * * * * This massacre is in the history of Nizam, otherwise related. The collectors of the ransom, says he, upon the part of Timur, having used great violence, by torture and other means, to extort money, the citizens fell upon them and killed some of the Moguls. The circumstances being reported to the Mogul king he ordered a general pillage and, upon resistance, a massacre to commence. This account carries greater appearance of truth along it, both from Timur's general character of cruelty,

তৈমুরলঙ্গ আত্মজীবনবৃত্তান্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন, “আমি দিল্লী-বিজয়ের পর আমোদ আহ্লাদে ১৫ দিন অতিবাহিত করিলাম । আমি বিধর্মীদিগকে ধর্মযুদ্ধে দিনাশ করিবার জন্য ভারতবর্ষে উপস্থিত হই-
রাছি । আমি এখানে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়াছি ; লক্ষ লক্ষ বিধর্মী
ও পৌত্তলিককে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছি, এবং আমার অসি ধর্ম-
বিদ্বৈষীদের রক্তে অনুরঞ্জিত করিয়াছি । অতএব এখন আমোদ আহ্লাদে
সময়যাপন না করিয়া বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাই
কর্তব্য ।” তদনুসারে তৈমুরলঙ্গ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মিরাত
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তৈমুরলঙ্গের দিল্লী পরিত্যাগ করিবার পর
ছই মাস পর্য্যন্ত দিল্লী জনশূন্য ছিল ।

তৈমুরলঙ্গ মিরাতে উপস্থিত হইয়া মনুষ্যরক্তে সগস্ত নগর প্রাণিত
করিয়া তথায় বিজয়-নিশান উড্ডীন করিলেন । অতঃপর তৈমুরলঙ্গ
সেনাপতি আমীর জাহান শাহকে যমুনার তীরবর্তী প্রদেশ শাসনভূমিতে
পরিণত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উত্তর মুখে অনুগাঙ্গ ভূমি
বিস্তৃত করিতে অগ্রসর হইলেন । তিনি দেশধ্বংস, নগরলুণ্ঠন ও নর-
হত্যা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; কিন্তু এবার তাঁহার

and the improbability of his being five days close to the city without having intelligence of what passed within the walls. But the imperial race of Timur take, to this day, great pains to invalidate this opinion, nor they want arguments on their side. The principal one is this: that in consequence of a general plunder the king would have been deprived of the ransom, which must have been exceedingly great, and for which he only received elephants and regalia. Neither have we any account of his taking any part of the plunder from his army afterwards though it must have been very immense.” *Dowe's History of India, Vol. II.*

গতি তাদৃশ সহজসাধ্য হইল না । তদেবাসিগণ তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিতেছিল । অবশেষে তৈমুর হরিদ্বারে উপনীত হইলে তত্রত্য হিন্দুগণ তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল । এই স্থান হইতে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন । তথা হইতে তৈমুর শিবালিক নামক পার্শ্বত্যা প্রদেশে উপনীত হইলেন । এইখানে আমীর জাহান শাহ সৈন্যে তাঁহার সহিত পুনর্মিলিত হইলেন ।

অতঃপর তৈমুরলঙ্গ সমগ্র শিবালিক প্রদেশ, নগরকোট, জম্মু নগর ধ্বংস করিয়া কাশ্মীরে গমন করিলেন । তত্রত্য অধিপতি তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন । তৈমুর তাঁহার ব্যবহারে প্রীতলাভ করিয়া রাজদূতকে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও নানাবিধ উপহার দ্রব্য প্রদানপূর্বক সম্মানিত করিলেন । তথা হইতে তৈমুর অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে সিন্ধুনদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তৈমুর কিয়দূর অগ্রসর হইলেই, লাহোর নগর বিপর্যাস্ত করিবার জন্য যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল, স্বকর্য্য উদ্ধার করিয়া তাহারা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল । তার পর তৈমুর চেনাব উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে আপনার বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ এবং দরবার আহ্বান করিয়া বিজয়ী রাজপুরুষগণকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিলেন । এইরূপে তৈমুরের ভারত-বিজয় সম্পন্ন হইল । তিনি তথা হইতে, যে পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন । তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কঙ্কালসার ভারতবর্ষ হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইতে লাগিল । (১)

(১) তৈমুর দেশবিজয়ের উৎকট আনন্দলাভ ও বিধর্ম্মাদিগকে হত্যা করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্যই ভারতবাসীর রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষ পরিত্যাগকালে বিজয়লঙ্ক দেশ রক্ষা করিবার জন্য তিনি সৈন্য নিযুক্ত অধবা

দিশিঙ্গরী বীর ভারতবর্ষ হইতে সগৌরবে প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই সময় তৈমুর ত্রিষষ্টিবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মানসিক ও শারীরিক তেজ কিছুমাত্র ধ্বংস হইরাছিল না ; তিনি ভারত-অভিযানের দারুণ কষ্ট সহ করিয়াও অক্লান্ত ছিলেন, এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কতিপয় মাস সময়খণ্ডের প্রাসাদে শান্তিস্থখে বাস করিয়া এসিয়ার পশ্চিমখণ্ডের দেশসমূহের বিক্রমে যুদ্ধ যোষণা করিলেন । ভারতবিজয়কালে যে সকল সৈন্য গমন করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে স্বচ্ছামত যুদ্ধে গমন অথবা গৃহে অবস্থান করিবার আদেশ করিলেন ।

এই সময় এসিয়ার পশ্চিম অংশে অটম্যান সাম্রাজ্য (১) সংস্থাপিত ছিল । ইউপ্রোটস নদীর তীরে অটম্যান ও তৈমুর সাম্রাজ্য পরস্পর সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল । একত্র সীমানা লইয়া উভয় অধিপতির মধ্যে অচিরে বিবাদ উপস্থিত হইল । এই সময় সুলতান বায়জিদ অটম্যান সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন । এই বিবাদ উপস্থিত হইলে তৈমুরনঙ্গ সুলতান বায়জিদকে একখানি ভেজোব্যঞ্জক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন ।—
“আপনি কি জানেন না যে, পৃথিবীর অধিকাংশ আমাদের অনুগত হই-

হিন্দুস্থানের শাসনকর্তৃপদ কাহাকেও প্রদান করেন নাই । তবে ভারতবর্ষের যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁহার বশতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদে বাহাল রাখিয়াছিলেন ।

(১) আর্ন্তগাল নামক জনৈক মোসলমান সেনাপতি এই অভিনব সাম্রাজ্যের পত্তন করেন । এই সাম্রাজ্য কালক্রমে ইয়োরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । আর্ন্ত-গালের পুত্র ওসমান বা ওসমানের সময় এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । ওসমান বা ওসমানের সেনাগণ ওসমান লী বা ওসমানলী নামে পরিচিত ছিল ; ইয়োরোপীয়গণ ওসমানলী বা ওসমান শব্দ সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগকে অটম্যান বলিত । ইহা হইতেই এই সাম্রাজ্য অটম্যান সাম্রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।

যাচ্ছে ? আমাদের অপরাধের সৈন্তবৃন্দ সমুদ্র সৈকতস্থ বাসুকারাশির
স্তম্ভ অসংখ্য । পৃথিবীর রাজস্ববর্গ আমাদের হারদেশে শ্রেণীবদ্ধ ।
আমরা সোকাগ্যালন্দ্রকে আমাদের সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইতে বাধ্য
করিয়াছি । এ সব কি আপনি জানেন না ? আপনার এরূপ নিরু-
দ্বিতা ও দাস্তিকতার কারণ কি ? আপনি এনাটোলিয়ার জঙ্গলে কয়েকটি
বৃক্ষ করিয়াছেন ; তুচ্ছ বিজয়চিহ্ন ! আপনি ইউরোপের গৃষ্ঠানদিগকে
কয়েকবার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়াছেন ; আপনার অগ্নি পরপক্ষের
আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে । আপনি কোরাণের আদেশমত বিধর্মী-
দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন ; এই একমাত্র কারণেই আমরা মোসল-
মান জগতের দারস্থরূপ আপনার রাজ্য বিনষ্ট করি নাই । সময়
ধাকিতে সুপরামর্শ গ্রহণ করুন, বিবেচনা করুন, অনুশোচনা করুন,
আপনার মস্তোকোপরি পতনোন্মুখ বজ্র নিবারণ করুন । আপনি
গিপীলিকা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী নহেন ; আপনি কেন ইস্তিমুথকে
উত্তেজিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ? আহা ! তাহারা আপনাকে
পদমর্দিত করিবে ।” সুলতান বায়েজিদ এই লিপিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে
উন্মত্ত হইলেন, এবং তৈমুরকে তিরস্কার করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “যদি
আমি আপনার অস্ত্রের সম্মুখ হইতে পলায়ন করি, তাহা হইলে যেন
আমার মহিষীগণ তিনবার পরিত্যক্ত হয় ; আর যদি আপনার আমার
বিরুদ্ধে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সাহস না থাকে, তাহা হইলে
তিনবার পরপুরুষসহবাসের পরও আপনার রমণীদিগকে যেন আপনি
গ্রহণ করেন ।” (১) মোসলমান-সমাজে মহিলা সম্বন্ধে কোনরূপ কটু

(১) According to the Koran a Musalman who had thrice di-
vorced a woman (who had thrice repeated the words of a divorce)
could not take her again till after she had been married to and
repudiated by another husband.

কথা বলা অমার্জনীর অপরাধ । সুলতান বায়েজিদের অবিমুখ্যকারিতার রাজনৈতিক বিবাদ ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হইল । তৈমুর সৈন্যে সুলতানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন ।

তিনি অটম্যান সাম্রাজ্যে উপনীত হইয়া এনাটোলিয়ার প্রান্তবর্তী সুদূর সিবাষ্টি নগর অবরুদ্ধ এবং বিপর্যস্ত করিলেন । চারি সহস্র প্রভু-ভর্তু আর্মেনিয়ান সৈন্য এই অবরোধকালে নগররক্ষা-কল্পে প্রাণপণে কর্তব্যসাধন করিয়াছিল ; তৈমুর তাঁহাদিগকে জীবন্ত ভূপ্রোথিত করিয়া সুলতান বায়েজিদের অবিমুখ্যকারিতার প্রতিফল দিলেন । এই সময় সুলতান বায়েজিদ কনষ্টান্টিনোপলের খৃষ্টান রাজ্য বিলুপ্ত করিয়া তথায় মোসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন । ইয়ুরোপের সমস্ত খৃষ্টান নরপতি তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মোসলমান সৈন্যের প্রতিরোধ জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন । তৈমুরলঙ্গ গোঁড়া মোসলমান ছিলেন, এবং বিশ্বাস করিতেন যে, বিধর্মীদিগকে বিনষ্ট করিলে পারলৌকিক মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে । এ জন্য তিনি মনে করিলেন যে, বায়েজিদ ধর্মকার্যে লিপ্ত আছেন, এবং এক্ষণে সমগ্র অটম্যান সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত করিলে তাদৃশ ধর্মকার্যের অন্তরায় উপস্থিত হইবে । সুতরাং তিনি সিবাষ্টি নগরের ধ্বংস করিরাই এবার নিবৃত্ত হইলেন, এবং সিরিয়া ও মিশরবিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন । ১৪০০ খৃ-ষ্টাব্দে তৈমুর সিরিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং সমস্ত রাজ্য বিপর্যস্ত করিয়া আলিপো নগর অবরুদ্ধ করিলেন । তিনি নগরবিজয় সম্পন্ন করিয়া শোণিতপাতে পৃথিবী অমূলঞ্জিত করিলেন, এবং অসংখ্য নর-নারীকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন ।

তৈমুর এই বন্দিগণের মধ্যে কতিপয় মোসলমান শাস্ত্রবেত্তা দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি মোসলমান

ধর্মের গোড়া ছিলেন ; পারসিকগণের শিকায়ত কেবলমাত্র আলী ও হাসন হোসেনকে তর্ক করিতেন, এবং পরস্পরের কড়া ও মোহনের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া সিরিয়ার অধিবাসীদিগের প্রতি বিরুদ্ধ ছিলেন । (১) তিনি ছল গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে সমবেত শাস্ত্র-বিদগণকে প্রশ্ন করিলেন, “প্রকৃত ধর্মের জন্ত কাহার প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে ? আমাদের পক্ষীয় সৈন্তগণ ? অথবা তোমাদের পক্ষীয়

(১) এসলাম ধর্মের মূল সূচু করিবার জন্ত মহাপুরুষ মোহাম্মদকে বাধা হইয়া এক অভিনব রাজ্যেরও গঠন করিতে হইয়াছিল । তাঁহার তিরোভাবের পর মোসলমানগণ সমবেত হইয়া তদীয় শিষ্য ও প্রচারককে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া নির্দিষ্ট করেন যে, উত্তরাধিকার বংশানুক্রমিক হইবে না । তদনুসারে আবুবেকরের পর পরস্পরসম্পর্কবিহীন ওমর, ওসমান ও আলী ক্রমান্বয়ে উত্তরাধিকারী অর্থাৎ খলিফা পদপ্রাপ্ত হন । আলী মহাপুরুষের জামাতা ছিলেন । তাঁহার রাজত্বকালে মাবিয়া নামক মোহাম্মদ জনৈক শিষ্য বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন । মাবিয়া এসলাম সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রাস করেন । এই অবস্থায় আলী হঠাৎ লোকান্তর প্রাপ্ত হন । আলী কাহাকেও খলিফা নিযুক্ত করিয়া দান নাই । আলীর পর তদীয় ছোট পুত্র হাসন খলিফা হন । মাবিয়ার সঙ্গে হাসনের একমুখু আরম্ভ হয়, হাসন স্বজাতির শোণিতপাতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার(মাবিয়ার) মৃত্যুর পর তিনিই পুনরায় খলিফা নিযুক্ত হইবেন সর্ভ করিয়া তাঁহাকে খলিফা-পদ প্রদান করেন । তদনুসারে মাবিয়া সিরিয়ার অন্তর্গত ভামাক্স নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন । হাসন জীবিত থাকিতে মাবিয়ার ছোট পুত্র এজিদের খলিফা-পদ প্রাপ্ত হইবার কোন আশা নাই দেখিয়া, তিনি (এজিদ) কোশলে বিষপ্রয়োগে হাসনকে নিহত করেন । মাবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদ খলিফা-পদ অধিকার করেন ও হাসনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন ও তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হন । এজিদের চক্রে হোসেন ও তাঁহার পরিজনগণ নৃশংসভাবে নিহত হন । এই ঘটনা হইতে মোসলমান-সমাজে তিনটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে,—শিয়া, সুন্নি ও খারেজী । শিয়াগণের মতে আলীই মোহাম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, এবং তাঁহার পুরুষতর বর্জিত্যের বলপূর্বক খলিফা-পদ অধিকার করিয়াছিলেন । পারস্যের অধিবাসিগণ এই মতাবলম্বী । সুন্নিগণ আবুবেকর, ওমর, ওসমান ও আলী চারি জনকেই প্রকৃত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন । খারেজীগণ আলী ও তাঁহার বংশধরগণের বিরুদ্ধবাদী, এবং মাবিয়া ও তৎপুত্র এজিদের পক্ষপাতী । সিরিয়ার অধিবাসিগণ এই মতাবলম্বী :
সমুদয় শিষ্য-সমাজের ভিতর :

সৈন্তগণ ?” একজন কাজী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “উদ্দেশ্য লইয়াই বিচার। কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক ধ্বংসা দেখিয়াই কে ধর্মার্থ প্রাণবিসর্জন করি যাচ্ছে, তাহার নির্দারণ করা যাইতে পারে না।” কাজির এই উত্তরে তৈমুর সন্তুষ্ট হইরা আর কিছু বলিলেন না। তারপর তিনি আর এক জন কাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বয়স কত ?” কাজী বলিলেন, “পঞ্চাশ বৎসর।” তিনি বলিলেন, “আমার ছোট পুত্রেরও এই বয়স। তোমরা এখানে একজন অক্ষম ও ধর্ম বৃদ্ধকে দেখিতেছ। কিন্তু ইম্বর আমাকে অবলম্বন করিয়াই ইরান, তুরান এবং ভারতবর্ষের রাজ্য সকল অধিকার করিয়াছেন। আমি রক্তপিপাসু নহি। আমি কাহাকেও প্রথমে আক্রমণ করি নাই। আমার শত্রুগণ নিজেরাই আপনাদের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে।” যে সময় এইরূপ শান্তিপূর্ণ আলাপ চলিতেছিল, তখন রাজপথে রক্তস্রোত প্রবাহিত এবং নগরবাসীর কাতরক্রন্দনে চতুর্দিক মুখরিত হইতেছিল। পরবলোদুপ সৈন্তগণ ধনরত্নলোভে লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল; কিন্তু বিজয়োৎসবের ভক্ত উপবৃক্ষসংখ্যক নরমুণ্ড সংগ্রহ করিবার জন্তই তৈমুরের আদেশমত সৈন্তগণ তাদৃশ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

অতঃপর তিনি ডামাঙ্কস নগরের অবরোধ করিলেন। ডামাঙ্কসের পূর্বতম অধিবাসিগণ মোহান্নদের দৌহিত্রের পক্ষাবলম্বী ছিল না। মোহান্নদের বংশের ভক্ত তৈমুরলঙ্গ এই অপরাধের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বংশধরগণকে বাণবৃদ্ধবনিতানির্বিশেষে হত্যা করিবার আদেশ করিলেন। এক ব্যক্তি সসন্মানে মোহান্নদের দৌহিত্র হোসেনের ছিন্ন মস্তক কবর দিয়াছিলেন; তাহার বংশধরগণ নিষ্কৃতিলাভ করিল। তৈমুর একজন শিল্পীকে ডামাঙ্কস হইতে সমরখণ্ডে লইয়া গিয়াছিলেন; তাহার পরিবারবর্গও তাহার কোপানল হইতে বক্ষা পাইল।

তদ্ব্যতীত সমস্ত নগরবাসী নিহত হইল ; এবং সাত শত বৎসরের
যুদ্ধিশালী নগর অশানভূমিতে পরিণত হইল ।

এই যুদ্ধব্যাপারে মোগল সৈন্য পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াতে তৈমুর মিশর
পেলেষ্টাইন বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যা-
গমন করিলেন । পশ্চিমধ্যে তৈমুর আলিপো নগর ভস্মীভূত করিলেন,
এবং নবতি সহস্র নরমুণ্ড দ্বারা বোগদাদ নগরের ভগ্নাবশেষের উপরে
একটী স্তূপ নিশ্চিত করাইলেন । তারপর পুনরায় জর্জিয়াতে উপ-
নীত হইয়া অটম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন । তিনি
সমগ্র অটম্যান সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত করিবার জন্য বিপুল সৈন্য (৮ লক্ষ)
সহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । সুলতান বায়েজিদও বহু সংখ্যক
সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; তিনিও চারি লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে
মোগলের গতিরোধজন্য অবতীর্ণ হইলেন । আঙ্গোরা নামক স্থানে তুমুল
যুদ্ধ আরম্ভ হইল । সুলতান মোগল সেনার প্রচণ্ড আক্রমণ সহ করিতে
না পারিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বন্দী হইলেন ।

সুলতান বায়েজিদ বন্দী হইয়া তৈমুরের শিবিরের নিকটবর্তী হইলে
তৈমুর তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রবর্তী হইলেন, এবং
তাঁহাকে আপন পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট করাইয়া তিরস্কারমিশ্রিত সাঙ্ঘনা-
বাক্য প্রবোধ দিলেন । সুলতান বায়েজিদ শত্রুর সদ্যবহারে মুগ্ধ হইয়া
অনুশোচনার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন । তাহার পর তৈমুর তাঁহাকে
খেলাৎ প্রদান করিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া অবনতমস্তক হই-
লেন । এই সময় তদীয় পুত্র মুসা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহার নিকট
আনীত হইলে, তিনি তাঁহাকে বাস্পাকুললোচনে আলিঙ্গন করিলেন ।
বিজয়োৎসবসম্পর্কিত ভোজসভায় তৈমুর সুলতানকে আমন্ত্রণ করিলেন,
এবং তদীয় মস্তকে রাজমুকুট ও হস্তে রাজদণ্ড প্রদান করিয়া তাঁহাকে

পিতৃরাজ্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু অপহৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই সুলতান বায়েজিদ আট মাস কাল বন্দিভাবে বাপন করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। (১)

এই সময় তৈমুরের বিজয়নিশান ইরটিস ও ভলগা নদী হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত এবং অমুগাক প্রদেশ হইতে ডামাস্কাস পর্য্যন্ত উদ্ভীন হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্য অপরাধেয়। তাঁহার ছুরাকাজ্জার সীমা ছিল না। তিনি এনাটোলিয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন না করিয়া ইয়ুরোপ-বিজয়ের সঙ্কল্প করিলেন। বিপুল সৈন্তের অধিপতি তৈমুরের নৌবল ছিল না। তিনি এশিয়া ও ইয়ুরোপের মধ্যবর্তী অপ্রশস্ত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায়োদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী মোগল বীরের নামে সমগ্র ইয়ুরোপে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার ইয়ুরোপ-বিজয়ের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া রাজকুল-বর্গ কম্পিতকলেবরে বশুতা স্বীকার পূর্বক নানাবিধ মহার্ঘ্য দ্রব্য সহ দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার বিজয়লালসা প্রশমিত করিবার প্রয়াসী হইলেন।

ইয়ুরোপীয় রাজকুলবর্গ সফলকাম হইলেন ; তৈমুর ইয়ুরোপ-বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহাদের শতাকুল মস্তিষ্কে জনরব উদ্ভূত হইল যে, তৈমুরলঙ্গ আফ্রিকার দেশসমূহ জয় করিতে করিতে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী হইয়া জিব্রাল্টার প্রণালী উত্তরণ পূর্বক ইয়ুরোপে প্রবেশ করিতে এবং তারপর খৃষ্টান রাজ্যসমূহ অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া রুশিয়া ও তাতারের মরুভূমির

(১) তৈমুরের স্মরণিত্ত জীবনকৃত্ত অবলম্বন করিয়া সুলতান বায়েজিদের প্রতি তাঁহার সহাবদানের বিবরণ সহজিত হইয়াছে। পারস্যক ইতিহাসবেত্তগণও এই মতাবলম্বী। কিন্তু ফরাসী, ইটালিয়ান, আরব, গ্রীক ও তুর্কি ইতিহাসবেত্তগণ তৈমুরলঙ্গ সুলতান বায়েজিদকে লৌহ-পাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ

পথে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিয়াছেন । মিশরের সুলতান সময় থাকিতেই বশুতাস্বাকার করিয়া সুদূরপর্যন্ত এবং সম্ভবতঃ কালনিক বিপদের কারণ দূরীভূত করিলেন ।

এই সময় চীনরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল । তৈমুর অসংখ্য মোসলমানের রক্তপাত করিয়াছিলেন ; তদনুরূপসংখ্যক বিধর্মী পোন্তলিকের বিনাশেই মোসলমাননিপাতরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে । তৈমুর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া জীবনের সায়াহ্নকালে চীনবিজয়ের সঙ্কল্প করিলেন । স্বীয়সকলসিদ্ধির জন্ত তিনি বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া এনাটোলিয়া হইতে সমরখণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন ।

চীন-বিজয়ের আয়োজনে দুইমাস অতিবাহিত হইয়াছিল । এই দুইমাস তিনি সমরখণ্ডে অবতান করিয়া শান্তিহুখ উপভোগ করিয়া-

করিয়াছেন । মোহাম্মদ ইবন আরব শাহ নামক জনৈক ইতিহাসবেত্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, সুলতান বায়েজিদ তৈমুরলঙ্গের রমনাদিগকে উপলক্ষ করিয়া কটুকথা বলিয়াছিলেন, তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত বিজয়োৎসবসম্পর্কিত ভোজসভায় সুলতানের অন্তঃপুরবাসিনীদিগের দ্বারা অনবগুণ্ঠনাবস্থায় মদ্য পরিবেশন করাইয়া তাঁহাদিগকে সুর্য্যমত্ত অতিথিগণের নিকট 'বে-আবর' করিয়াছিলেন । বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্ মত গ্রহণীয় ? ঐতিহাসিককুলভিলক গিবন সাহেব মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ তৈমুর বিজয়ানন্দে বিস্তার ও উদারচিত্ত হইয়া বিজিত-শত্রুর সম্বন্ধনা করিয়াছিলেন । কিন্তু এনাটোলিয়ার রাজ্যচ্যুত রাজকুমারগণ সুলতানের বিরুদ্ধে তৈমুরের নিকট নানাপ্রকার গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিলে, তিনি তাঁহার প্রতি কিয়ৎপরিমাণে বিরূপ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে সগৌরবে সমরখণ্ডে লইয়া বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । এই সময় সুলতান বায়েজিদ স্বীয় পট্টবাসের নাচে গুড়গুড়ন করিয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করেন । ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তৈমুর তাঁহাকে লৌহ-খাঁচার আবদ্ধ করেন । এই অবস্থায় সুলতান বায়েজিদ মুহূর্ত্তমধ্যে পতিত হইলে, তৈমুর সুলতানের পুত্র মুসাকে এনাটোলিয়ার কিয়ৎ-প্রাচীন করিয়া অবশিষ্টাংশে তুর্কী প্রাচীন অধিপতির বংশধরগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ।

ছিলেন, এবং এই অল্পকালমধ্যেই স্বায় অসাধারণ শক্তি ও ঐশ্বর্য্য পরিচয় প্রদান করেন। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন ; অপরাধীকে শাস্তি দিতেন, এবং গুণীকে পুরস্কৃত করিতেন ; আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্য সুদৃশ্য প্রাসাদ ও মসজিদনির্মাণে ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হন ; (১) এবং মিশর, আরব, ভারতবর্ষ, তাতার, রুশিয়া ও স্পেনের রাজদূতগণকে দর্শন দেন।

এই সময় তৈমুরলঙ্গ মেহবশে ও ধর্ম্মানুরোধে আপনার ছয় জন পৌত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে প্রাচীন খলিফাদের অনুষ্ঠিত জাঁক জমকের পুনরভিনয় হইয়াছিল। অসংখ্যপট্টাবাস-শোভিত কালিঘোনার উজ্জানে বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। পট্টাবাসসমূহে বৃহৎ নগরের বিলাস সামগ্রী এবং বিজয়ী শিবিরের লুণ্ঠিত দ্রব্য একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছিল। রন্ধনশালার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য একটি বনের সমগ্র বৃক্ষ কর্তন করা হইয়াছিল। মিষ্টা-নের মঠ ও সুরার ভাণ্ড সংস্থাপিত করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ভোজন জন্য দাদরে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ভোজসভায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর সামন্তবর্গ এবং পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন ; এমন কি, ইউরোপের রাজদূতগণও বর্জিত হইয়েন নাই। প্রকৃতিপুঞ্জ আলোকমালায় নগর সুসজ্জিত করিয়া আপনাদের আনন্দের পরিচয় প্রদান করে। কাবিন নামা কাজি কর্তৃক অনু-

(১) Timur had enriched Samarkand with the spoils of his universal conquests ; he had brought skilled craftsmen and artists from the utmost parts of Asia to build him 'Stately pleasure domes' and splendid mosques, and his capital became one of the most beautiful as it had been one of the most cultivated cities of the East. — *Stanley Lane-Poole.*

মোদিও হইলে, বরকন্ডাগণ বাসরগৃহে গমন করেন, এবং প্রচলিত প্রথামত তাঁহাদিগকে নয় বার পরিচ্ছদ পরিধান ও পরিত্যাগ করান হয় । প্রত্যেকবার বস্ত্রপরিবর্তনের সময় তাঁহাদের মস্তকোপরি মণিমুক্তা বসিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারা সেই মণিমুক্তারূপি অবজ্ঞাভরে পার্শ্ব-বর্তী অশুচিবর্গকে প্রদান করিয়াছিলেন । প্রকৃতিপুঞ্জকে সর্ববিধে প্রদত্ত প্রদান করা হইয়াছিল ; প্রত্যেক প্রকার অনুশাসন নিখিলিত হইয়াছিল ; সর্বপ্রকার আমোদে লিপ্ত হইবার জন্য অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল ; জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল ; তৈমুর নিজে নিষ্কর্মা ছিলেন । ইতিহাসবেত্তাগণ নির্দেশ করিতে পারেন যে, তৈমুর যুদ্ধকার্যে জীবনের অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত করিয়া যে দুই মাস আপনার ক্রমতা পরিচালিত করেন নাই, তাহাই তাঁহার সমগ্র জীবনের মধ্যে একমাত্র সুখের কাল ।

কিন্তু তৈমুর দীর্ঘকাল এই শান্তিসুখ ভোগ করিলেন না ; দুই লক্ষ সৈন্য একত্রিত করিয়া চীন রাজ্য জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন । এই সময় তিনি সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং শীত ঋতু সমাগত হইয়াছিল । বার্কক্য অথবা দারুণ শীত, কিছুতেই তিনি দমিত হইলেন না ; পররাষ্ট্রাহরণলালসায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন । কিন্তু সমরথও হইতে তিন শত মাইল অগ্রসর হইয়াই সমগ্র পৃথিবীর ভীতিস্থল বীরপুরুষ জরুরোগে আক্রান্ত হইয়া ভবলীলা সংবরণ করিলেন ।

তৈমুর এসিয়ার সুবিশাল অংশে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন । তিনি এক দেশ বিজয় করিতে না করিতেই অন্ত্যদেশ আক্রমণ করিতেন ; এ জন্য তাঁহার দেশবিজয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত, এবং বিজিত দেশের শাসনশৃঙ্খলা বিধান করিবার অবসর ঘটিত না ;—

তৈমুরলঙ্গের বিজয়লব্ধ দেশসমূহে এই কারণে স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠিত হয় নাই । তৈমুর দেশবিজয় করিয়া এক প্রকার উৎকট আনন্দ অনুভব করিতেন । এই উৎকট আনন্দের জন্যই তিনি অনেক সময়ে দেশবিজয়ে প্ররুত হইতেন ; দেশবিজয় করিয়া স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার অনেক স্থলেই আদৌ ছিল না । ফলতঃ, তাঁহার দেশ-আক্রমণ দাবান্নির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে । বিজয়লোলুপ যোদ্ধাপুরুষ যে দেশে উপনীত হইতেন, সে দেশের ভূগণ শস্য পর্য্যন্ত দখলীভূত হইয়া যাইত ; কিন্তু তাঁহার দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে দেশ শস্যশীমল হইয়া উঠিত । তৈমুরলঙ্গের অভিযানরূপ প্রবল বাতায় যে সকল নরপতি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহার অন্য দেশে গমনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্বরাজ্য পুনর্বার অধিকার করেন । কেবলমাত্র পারস্যের কিয়দংশে ও মাওরাওন্যাহার দেশে তাঁহার আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল ।

তৈমুরলঙ্গ বিকলাঙ্গ ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার শারীরিক গঠন বলদৃপ্ত ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল । তাঁহার সুবিশাল বপু, তাঁহার সমগ্রপৃথিবী-ব্যাপিনী প্রতিষ্ঠার সমতুল ছিল । তাঁহার স্বাস্থ্য অনবদ্য ছিল বলিয়াই তিনি আজীবন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও অক্লান্ত ছিলেন । পরিমিতাচার ও ব্যায়ামচর্চার জন্যই আজীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট ছিল । তিনি সভাশূলে একাধারে বাস্তব, গভীর ও বিনীত ছিলেন । তিনি বিজ্ঞানবিৎ ও ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ করিয়া অপরিমিত আনন্দ অনুভব করিতেন । তাঁহাতে সামাজিক গুণেরও অভাব ছিল না ; তিনি বন্ধুদিগকে ভালবাসিতেন, এবং কখনও বা শত্রুদিগকেও ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারিতেন ।

তৈমুর আপনার রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন ;

যাহা কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করিতেন, কাহারও মন্তব্য তাহা হইতে এক তিলও বিচলিত হইতেন না। এসলাম ধর্মের তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল ; ধর্মের নামেই তাঁহার কৃত অধিকাংশ অত্যাচারস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। তৈমুরের জীবনের আরম্ভকালে এসিয়ার অধিকাংশ রাজ্যে অরাজকতা রাজত্ব করিতেছিল ; কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে সমগ্র দেশ শান্তিপূর্ণ হইয়াছিল, এক জন বালকও স্বর্ণ-খনি লইয়া উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারিত। এইরূপ কালনিক বা যথার্থ কারণ প্রদর্শন পূর্বক তিনি আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া আপনার দেশবিজয়, নরহত্যা ও পরস্ব-লুণ্ঠনের সমর্থন করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যবর্গের অত্যাচার ও লুণ্ঠনে প্রকৃতিপুঞ্জ যন্ত্রণা পাইতে ছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু শান্তিসংস্থাপকের পদতলে সমগ্র জাতি মর্দিত হইয়াছিল ; সম্পদ ও শোভার আধার নগরসমূহ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে সৈন্তগণ অষ্ট্রাকান, খারিজম, দিল্লী, ইম্পাহান, বোগদাদ, আলিপো ও ডামাস্কাস প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থান বিপর্যস্ত ও ভস্মীভূত করিয়াছিল। পারস্যের কিয়দংশে ও মাওরাওনহার দেশে তৈমুর আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া শাসনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তত্তির দূরবর্তী বিজিত দেশসমূহে শাসনশৃঙ্খলাস্থাপনে অবহিত হন নাই ; একমাত্র দেশবিজয়ের উৎকট আনন্দ লাভ করিবার জন্যই সেই সকল দেশের প্রচলিত শাসনপ্রণালী ভগ্ন করিয়াছিলেন। বিজিত দেশসমূহের বিকলাঙ্গ শাসনবহু ও সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং তৎপরিবর্তে অভিনব শাসনবহু নির্মিত না হওয়াতে অত্যাচারস্রোত পূর্বাশ্রয় অধিকতর প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার পর তিনি যে দেশের শাসনকার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য মনোযোগী

ছিলেন, তাহাতেও দেশবিজয়ের অধুরোধে তাঁহার সুদীর্ঘ অল্পপস্থিতি-নিবন্ধন নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। তৈমুরলঙ্গের শাসনপ্রণালী প্রজাসাধারণের হৃদয়গত প্রীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না; এ জন্য তাঁহার রাজত্বের সুফল যাহাই কেন হউক না, তাহা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৈমুরের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বার অরাজকতা বিরাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কলতঃ, "the two great Scourages of Asia Chingiz and Timur."

তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুর পর তদীয় সুবৃহৎ সাম্রাজ্য বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াস উদ্দীন জাহাঙ্গীর মিরজা পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদীয় পুত্র পীর মোহাম্মদ গজনীর শাসনকর্তা ছিলেন। তৈমুরলঙ্গ পীর মোহাম্মদকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। দ্বিতীয় পুত্র মিরজা ওমরশাহ পারস্ত দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ইনিও পিতার জীবদ্দশাতেই লোকান্তর প্রাপ্ত হন। তৃতীয় পুত্রের নাম মিরজা শাহ মিরজা; আজর বিজান, সিরিয়া ও ইরাকের শাসনভার ইহার হস্তে অর্পিত ছিল। চতুর্থ পুত্র মিরজা শাহ রুক খোরসানের শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার জীবিত পুত্রদ্বয় ও মৃত পুত্রদ্বয়ের বংশধরগণ তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুর পর তদীয় তৃতীয় পুত্র মিরজা শাহ মিরজা নিজের শাসিত প্রদেশসমূহে স্বনামে খোতবা ও শিলা প্রচলিত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রধানতঃ ভারবিজ নগরে অবস্থান করিতেন। স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে

আরম্ভ করিবার অল্প পরেই ইনি ইউরুফ নামক জনৈক তুর্কি সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ।

মিরান শাহ মিরজার পরলোকপ্রাপ্তির পর তদীয় পুত্র সুলতান মোহাম্মদ মিরজা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন । (১) সুলতান মোহাম্মদ মিরজার পর তদীয় পুত্র মিরজা আবুসৈয়দ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তিনি প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন আরম্ভ করিয়া মাওরা-ওলাহার অধিকার করিলেন । ইহাতেই তাঁহার উচ্চাশার পরিভূষিত হইল না ; তিনি থোরাসান ও ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিলেন । এই সময় মিরজা জাহান শাহ আজর বিজ্ঞানের অধিপতি ছিলেন । উজান হোসেন নামক জনৈক সামন্ত আজর বিজ্ঞানের প্রতি লোভনূপ দৃষ্টিপাত করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন । আবু সৈয়দ মিরজা জাহান শাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া সৈন্তে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিলেন ; কিন্তু আরদি বনের নিকট সঙ্কীর্ণ পার্বত্য-পথে শত্রুসৈন্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া অধিকাংশ সৈন্ত সহ নিহত হইলেন । আবুল ফজল আবুকে ধর্মপরাঙ্গন নরপতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন ।

কমতাশালী অধিপতির মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য বহুধা

(১) ইতিহাসবেত্তা এক্সাইন সাহেব মিরান শাহ মিরজার পরই আবু সৈয়দের নামনির্দেশ করিয়াছেন । খ্রীষ্ট বিভারিক সাহেবও এই মতাবলম্বী । মোহাম্মদ মিরজা পিতামহ তৈমুরের জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন । তৈমুরের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ মিরজার পিতা মিরান শাহের মৃত্যু ঘটয়াছিল ; সুতরাং তিনি কখনও পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব করিতে পারেন না । তৈমুরলঙ্গের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র ও পৌত্র ছত্রিশ জন বর্তমান ছিলেন বলিয়া সমসাময়িক ইতিহাসলেখক জাকরনামার প্রকারে সরকউদীন উল্লেখ করিয়াছেন । জাকরনামার প্রকারে তাঁহাদের নামের এক তালিকাও প্রদান করিয়াছেন । এই তালিকার মোহাম্মদ মিরজার নাম নাই । একমাত্র আবুল ফজল মোহাম্মদ মিরজার রাজত্বের উল্লেখ করিয়াছেন ।

বিভক্ত হইয়া পড়িল । কতক অংশ বা তাঁহার পুত্রগণ রাজত্ব করিতে লাগিলেন ; কতক অংশ বা বিদেশীয়ের হস্তে পতিত হইল । আবুসৈয়দদের পুত্রগণের মধ্যে চারি জন স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন । জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান আহম্মদ মিরজা সমরখণ্ড ও বোখারা অধিকার করিলেন । তৃতীয় পুত্র সুলতান মোহাম্মদ মিরজা বদক্সা ও খুতাম প্রভৃতি প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিলেন । চতুর্থ পুত্র ওমর শেখ মিরজা পিতার জীবদশায় জাক্কারটিস্ নদীর উভয়কূলবর্তী ক্ষুদ্র ফারগনার শাসনকর্তা ছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজের শাসিত প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন । ওমর শেখ বিজয়লিপ্সু কস্মিঠ নরপতি ছিলেন । তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমরখণ্ড রাজ্য করতলগত করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বারংবার তদীয় রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । উভয়েই মোগলিস্থানের অধিপতি চাঘাটাইবংশজাত জুনিস খাঁর (১) কন্টার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু ওমর শেখ জুনিসের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার (ওমরের) সাহায্যার্থ অনেকবার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । যাহা

(১) জুনিস খাঁ স্বরূপ, অমায়িকবস্ত্রাব ও মধুর ব্যবহারে মোগল সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন । তাঁহাতে তৎকালের মোগল সমাজের রূঢ়তা কিছুমাত্র ছিল না । জনৈক সাধুপুরুষ তাঁহার যে জীবন্ত চিত্র প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“I had heard,” said a holy man sent to Yunis Khan, when he ruled in Mughalistan, “I had heard that Yunis Khan was a Mughal, and I concluded that he was beardless, with the rude ways of an inhabitant of the desert. But I found a handsome man, with a fine bushy beard, of elegant address, most agreeable and refined manners and conversation, such as are seldom to be met with even in the most polished society.”

হউক, অবশেষে জুনিস খাঁর যত্নে উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। কিন্তু “খলের পীরিতি জলের বাঁধ”; ভ্রাতৃত্বমধ্যে পুনরায় মনোবাদ উপস্থিত হইল। এই সময় জুনিস খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, এবং তদীয় পুত্র মোহাম্মদ খাঁ তৎপরে অভিষিক্ত ছিলেন; তিনি সুলতান আহম্মদ মিরজার সঙ্গে মিলিত হইয়া ওমরকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য বন্ধপরিষদ হইলেন, এবং এই সম্মিলন সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিবার মানসে মিরজার কন্যাকে বিবাহনৃত্রে আবদ্ধ করিলেন। ফারগনা রাজ্য দুই পার্শ্ব হইতে এককালে আক্রমণ করিলে আপনাদের অভীষ্ট সহজে সিদ্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া মিরজা নদীর বামকূলবর্তী প্রদেশ ও খাঁ উত্তরকূলবর্তী প্রদেশ যুগপৎ আক্রমণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে সসৈন্তে বহির্গত হইলেন। এই দুঃসময়ে মিরজা ওমর শেখের অপঘাত সংঘটিত হইল। (১)

১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু হইয়াছিল; ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসরের পরে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ওমর সেখ মিরজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে তৈমুরলঙ্গের দ্বিগন্তপ্রসারিত সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? এই সময় উহা

(১) আবুল ফজল ওমর সেখকে একজন স্থায়পরায়ণ বিচক্ষণ শাসনকর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবুল ফজল উহার স্থায়পরায়ণতা প্রদর্শন করিবার জন্য যে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহা বর্ণনা করিতেছি। একবার চীনের একখানি বাণিজ্য-শকট ফারগনাতে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ভূবারপাতে সঙ্গীয় লোকগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কেবলমাত্র দুইজন অবশিষ্ট থাকে। এই সময় ওমরের অত্যন্ত অর্থের অনটন ছিল। তিনি এই ঘটনা অবগত হইয়া অর্থের অনটন সত্ত্বেও বাণিজ্য-শকটে হস্তক্ষেপ না করিয়া চীন দেশ হইতে প্রকৃত মালিকদিগকে আনাইয়া উহা প্রদান করেন। ওমর পুত্র বাবরও স্বরচিত জীবনযুদ্ধে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সাধুতামূলক এই সামান্য ঘটনাকে উচ্চমান প্রদান করাতে মনে হয় যে, তৎকালে মোগল সমাজে নীতিজ্ঞান বড় প্রবল ছিল না।

শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজস্ববর্গের পারস্পরিক সংগ্রামে দেশব্যাপী অরাজকতা উপস্থিত হয় । উজ্জবেগপণ উত্তর প্রদেশ হইতে মাওরাওরাহার ও পারস্য দেশে বস্তার জলের ন্যায় পতিত হইয়া তৈমুরলঙ্গের বংশধরগণকে নিমজ্জিত করিয়াছিল । যদি ওমরের পুত্র বাবর এক অভিনব সাম্রাজ্যের সূত্রপাত না করিতেন, তাহা হইলে, এই সময়েই তৈমুরের বংশধরগণের রাজ্যনাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত ।



বাবর ।

তৈমুরলঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ওমর শেখ মিরজা ক্ষুদ্র কারগনা (বর্তমান কোকন) রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কারগনা প্রকৃতির হর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত এবং অমিত ফলশস্ত্রে পূর্ণ। ইহার চতুর্পাশ্ব শৈলমালায় পরিবেষ্টিত। এই পর্বতাবলীর অধিকাংশ কি নীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই তুষারমণ্ডিত থাকে।

ওমরের রাজত্বকালে মোগলসমাজে জ্ঞানশ্রোত প্রবাহিত ছিল। এই সময়ের শিক্ষা দীক্ষা কুসংস্কারভূষ্ট থাকিলেও তাহা বুদ্ধি মার্জিত ও চরিত্র উন্নত করিবার পক্ষে অন্তরাবস্বরূপ ছিল না। বিবৎসমাজে কোরাণ, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, ন্যায়দর্শন ও কাব্যশাস্ত্রের চর্চা ছিল। মুশিক্ষিতগণ জ্যোতিষ, ইতিহাস ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুশীলনে অপরি-সীম আনন্দ অমুভব করিতেন। যদিও মোগলসমাজে সর্বপ্রকার বিদ্যাই আলোচিত হইত, তথাপি কাব্যালোচনা জনসাধারণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সাদির কাবারাজি তাহাদের একান্ত প্রিয় পদার্থ ছিল। তাহারা কথায় কথায় উহার শ্লোক আবৃত্তি করিত; এমন কি, রাজকীয় কাগজপত্রেও সাদির কাব্যের প্রভাব দৃষ্ট হইত।

নানা শ্রেণীর সাধুগণ দেশের সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরভক্ত ও অলৌকিককর্মতাসম্পন্ন ছিলেন, এই বিশ্বাসে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ভয় ও ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিত। এই সাধুর দল সমাজের যথেষ্ট হিতসাধনও করিতেন। সমগ্র দেশ তাঁহাদের অমুরক্ত শিষ্য সেবকে পরিপূর্ণ ছিল। এজন্য দেশমধ্যে তাঁহাদের অর্থও প্রতাপ

ও প্রতিপত্তি ছিল । এবং তাহারা অনায়াসেই দুর্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন । লোকে এই সাধুসম্প্রদায়কে অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিত ; ইহার ফলে কোন অত্যাচারী রাজা বা সেনাপতি অশান্তির শ্রোত প্রবাহিত করিলে তাহারা সহজেই উৎপাতকারীকে সম্বাসিত করিতে পারিতেন । এবং অনেক সময়ে তাহাদের অঙ্গুলিসঙ্কেতে সমস্ত অত্যাচারশ্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইত । কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীরই বিদ্বাত্যাসের সুবিধা ছিল । অবিরত রাজ-বিপ্লবের নিমিত্ত জনসাধারণের শিক্ষালাভের কোন বন্দোবস্ত হইতে পারিয়াছিল না ; এজন্য তাহারা অজ্ঞানাকারে আচ্ছন্ন ছিল । এই সময়ের শাসনপ্রণালী যথেষ্টাচারমূলক ছিল, এবং রাজদরবার দুৰাকাজ্ঞ রাজপুরুষগণে পূর্ণ থাকিত । অবিশ্রান্ত যুদ্ধ বিগ্রহ নিবন্ধন বাণিজ্য ও শিল্পও যথোচিত ক্ষুণ্ণিলাভ করিতে পারিয়াছিল না ।

ফারগনা রাজ্যের চতুর্পার্শ্বে বহুসংখ্যক তৈমুর-বংশধর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । তাহাদের পরস্পরের বিবাদে দেশ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল । ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ওমর শেখের ছোট ভ্রাতা সুলতান আহম্মদ মিরজা ও শালক মোহাম্মদ খাঁ একতান্বয়ে আবদ্ধ হইয়া সমরানলে ফারগনা রাজ্য ভস্মীভূত করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইলেন, এবং বিপুল বাহিনী সহ বিভিন্ন পথে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

এই দুঃসময়ে হঠাৎ ওমর শেখ মিরজার অপঘাত সংঘটিত হইল, এবং তদীয় একাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র বাবর বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ! এই বালক শৈশবেই সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তিনি সিংহাসনারোহণের পর হইতে আমরণ অসিহস্তে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছেন, বিদ্যালোচনার অবসর তাহার ছিল না । তিনি উত্তরকালে তুর্কি ও পারস্যে

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । শৈশবকালে সুশিক্ষা না পাইলে তিনি কখনও তাদৃশ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন না । কিন্তু তাঁহার শৈশবশিক্ষার বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি । তবে রাজমহিলাগণ যে তাঁহার সুশিক্ষার সহায়-স্বরূপা ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । মোগল-মহিলাগণ বিলাসিতার সংস্পর্শে আসিয়াও আপনাদের কৌলিক সদ্ভঙ্গে বঞ্চিত হইয়াছিলেন না । তাঁহারা সরলহৃদয়া বীররমণী ছিলেন ।

বাবরের সহায়স্বরূপা রাজমহিলাগণের মধ্যে তদীয় মাতামহী ইসান-দৌলত বেগম সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন । বাবর স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, এই রমণীর বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত ; তাঁহার প্রস্তাবমতেই অনেক কার্যের সূত্রপাত হইয়া-ছিল । তিনি একবার স্বামী সঙ্গে বিজয়ী শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া-ছিলেন । তৎকালে তিনি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তেজস্বিনী বীররমণীরই খোঁগ্য । যদিও তাঁহার স্বামী জীবিত ছিলেন, তথাপি বিজয়ী অধিপতি তাঁহাকে জনৈক অমাত্যের হস্তে অর্পণ করেন । তিনি নীরবে এই অবমাননা সহ করিয়া নূতন স্বামীকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হন । কিন্তু অমাত্যপ্রবর তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন, এবং তাহার পর পরি-চারিকাগণের সাহায্যে তাঁহাকে নিহত করিয়া মৃতদেহ পাজপথে নিক্ষেপ করেন । রাজদূত এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে বীররমণী সগর্বে উত্তর করেন, “আমি জুনিস খাঁর মহিষী, শেখ জামাল শাস্ত্র-বিক্রদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া আমাকে অল্প ব্যক্তির হস্তে প্রদান করিয়া-ছিলেন, এজন্য আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি ; শেখ ইচ্ছা করিলে আমাকেও মারিয়া ফেলিতে পারেন ।” জামাল তাঁহার সতীত্বে মুগ্ধ

হইয়া তাঁহাকে সম্মানে জ্বলিত খাঁর নিকট প্রেরণ করেন, এবং তিনি শানকে পতি সহ এক বৎসর কাল কারাকষ্টে ভোগ করেন । এই মহী-
রসী মহিলা বাল্যকালে বাবরের প্রধান অবলম্বন ছিলেন ।

বাবর সিংহাসনে আরোহণ করিতে না করিতেই দুই পার্শ্ব হইতে রাজ্যের দ্বারদেশে প্রবল শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল । সুলতান আহ-
মদ মিরজা ও মোহাম্মদ খাঁ উভয়েরই সঙ্গেই তাঁহার শোণিতসম্বন্ধ ছিল ।
তিনি শত্রুর গতি প্রতিরোধ অসম্ভব দেখিয়া পিতৃরাজ্যেও তাঁহাদের
প্রতিনিধিত্বাধীনে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে সম্মত হইয়া কৃপাভিকা-
খাঁর স্ত্রায় সন্ধিসংস্থাপন জন্য দূত প্রেরণ করিলেন । কিন্তু তাঁহারা
অবজ্ঞাতরে সন্ধিসংস্থাপনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ফারগনা অভিযুগে
শতৈঃ শতৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । বাবরের সৌভাগ্যবশতঃ আহ-
মদ মিরজার পশ্চিমধ্যে বেগবতী নদী পতিত হইল । নদীর উপর
একটি সঙ্কীর্ণ সেতু বিদ্যমান ছিল । সেতু উত্তীর্ণ হইবার সময় জনতা-
নিবন্ধন অনেকে নদীগর্ভে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল । ইহার
পূর্বেও একবার এক দল সৈন্য এই সেতুর উপর এই ভাবে মৃত্যুমুখে
পতিত হইয়াছিল ; এই ভূত ঘটনা কুসংস্কারাপন্ন সৈনিকগণের স্মৃতিপথে
উদ্ভূত হইবামাত্র তাহারা ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল, এবং কোন প্রলো-
ভনেই আর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না । ইহার পর শিবিরমধ্যে
অচিরে মড়ক উপস্থিত হইল । আরামপ্রিয় আহমদ মিরজার আক-
স্মিক বিপদের সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা ছিল না । তিনি অধীরচিত্তে,
যে সকল নগর অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাই নিজের অধীনে রাখিয়া,
বাবরের সঙ্গে সন্ধিসংস্থাপন করিয়া, কলঙ্কের ভার মস্তকে লইয়া,
স্বরাজ্যাভিযুগে ধাবিত হইলেন । এই ভাবে এক পার্শ্বের শত্রুর বিষয়
ভগ্ন হইল ।

অপর দিকের শত্রু মোহাম্মদ খাঁ কাসান নগর স্বাধিকারে আনয়ন করিয়া আখসি (ফারগনার রাজধানী) নগর অবরোধ করিলেন । নগরভাঙারের সৈন্তগণ বিপুল বিক্রমে নগররক্ষা করিতে লাগিল ; দীর্ঘকাল অবরোধের পরও মোহাম্মদ খাঁ কৃতকার্য হইতে না পারিয়া পরিশ্রান্তচিত্তে স্বদেশাতিমুখে প্রস্থান করিলেন ।

এই ভাবে বাবরের বিপদরাশি কাটিয়া গেল । তাঁহার আধিপত্য আন্ধিজান ও আখসির মধ্যবর্তী ৪০ ক্রোশ ব্যাপী স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল ; রাজ্যের অবশিষ্টাংশ শক্তিশালী প্রতিবাসী রাজ্যবর্গের হস্তগত হইয়াছিল ; বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও পুনর্বার স্বাধিকারভুক্ত করিবার উপায় ছিল না । বাবর অপহৃত রাজ্য পুনর্বার অধিকার করিবার জন্য কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন । পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধারসাধনই তাঁহার জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল না । তৈমুরের রাজধানী সমরখণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিবার আকাঙ্ক্ষাও তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন । এই উদ্দেশ্যেই তিনি কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন ।

বাবর পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সমরখণ্ড করতলগত করিয়া জীবনের সর্বোচ্চ কামনা সিদ্ধ করিলেন । বাবরের অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব ছিল, কিন্তু তদনুরূপ সৈন্তবল ও যুদ্ধোপকরণ ছিল না । সুতরাং তিনি এক সময়ে ফারগনা ও সমরখণ্ড উভয় রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না । সমরখণ্ডজয়ের পর অবিলম্বে তখল নামক তাঁহার একজন সেনাপতি ফারগনা অধিকার করিয়া বসিলেন । এই সংবাদ অবগত হইয়া বাবর অবিলম্বে তথায় যাত্রা করিলেন । ফারগনার উদ্ধার হইল না, কিন্তু তাঁহার সমরখণ্ড-পরিত্যাগের পর সমরখণ্ডবাসী শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল । এই ভাবে বাবর উভয় রাজ্য হারাইলেন ।

এই সময়ে তাঁহার দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল । তিনি স্বরচিত জীবন-বৃত্তে লিখিয়াছেন, “আমি বড় দুর্বল্যায় পতিত হইয়াছিলাম, এবং অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়াছিলাম ।” কিন্তু ইহাতেও তাঁহার স্বৈরাধীনী প্রকৃতি দমিত হয় নাই । তিনি অগোণে ফারগনা রাজ্যে আধিপত্যসংস্থাপন করিয়া সমরখণ্ডের দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন ।

এই সময় সমরখণ্ড উজবেগ জাতির করতলগত ছিল । তাহারা প্রজাপ্রিয় ছিল না । একজন্ত বাবর বিবেচনা করিলেন যে, একবার কোশলে নগরাত্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই সমরখণ্ডবাসীরা দলে দলে তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইবে । এই বিশ্বাসে তিনি একদা রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে অশীতিসংখ্যক পরাক্রান্ত সৈন্য সহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । সমস্ত নগর তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল । কেবলমাত্র কতিপয় দোকানদার গব্যাক্রপণে এই ঘটনা দেখিতে পাইয়া দৈবরূপে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল । বাবরের কোশলে সার্ব্বিক ছই শত সৈন্যের সাহায্যে সমরখণ্ডবিজয় সম্পন্ন হইল । কিন্তু ইহার পরে তাঁহার অদৃষ্টচক্র পুনর্বার নিম্নগামী হইল । উজবেগ-অধিপতি সইবানি সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বাবরকে সমরখণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন । এবং ইহার সমসময়েই পৈতৃক রাজ্য ফারগনা শত্রুহস্তে পতিত হইল ।

অতঃপর বাবর অবলম্বনশূন্য ভূখণ্ডের ছায় ভাসমান হইয়া উরাট-পিয়াব মিকটবর্তী পার্শ্বত্যা মেঘপালকগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এখানে তিনি নগ্নপদে পশুচারণের মাঠে ভ্রমণ করিয়া গ্রামবাসীর মেঘপাল ও অশ্বিনীসমূহের তত্ত্বাবধানে কুষ্ঠিত হইতেন না । এই সময় একজন বৃদ্ধা মেঘপালিকা গল্প করিয়া তাঁহাকে আমোদিত করিত । বৃদ্ধা তৈমুরলঙ্গের ভারতবিজয়ের অনেক কাহিনী অবগত ছিল, এবং বাবরের

চিত্রবিনোদনের জন্য তাহার বর্ণনা করিত । সম্ভবতঃ এই সকল কাহিনী উত্তরকালে বাবরের বীররূপে ভারতবিজয়ের লাভসা উদ্দীপিত করিয়া তাহার মানসনয়নে ভারত সাম্রাজ্যের সৌষ্ঠব ও ঐশ্বর্যের চিত্র প্রস্তুতি করিয়া তুলিয়াছিল ।

যাহা হউক, এত কষ্টেও তাহার উৎসাহ উত্তম ভঙ্গ হয় নাই । তিনি মাতুলগণের সাহায্যে বহু কষ্টে পুনর্বার ফারগনা রাজ্যে অধিকার-সংস্থাপন করিয়া মেঘনির্মুক্ত স্বর্গের ভাষ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন । কিন্তু উজবেগ অধিপতি সইয়ানি তাহার উন্নতি দর্শনে শঙ্কিত হইয়া বহু রক্তপাতের পর ফারগনা রাজ্য তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন । বাবর নিরুপায় হইয়া মোগলিস্থানে পলায়ন করিলেন ।

বাবর বৎসরাধিক পরে মোগলিস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুদমাতে আগমন করিলেন, এবং তারপর তথা হইতে বাকের নিকটবর্তী তরমুজে উপনীত হইলেন । তত্রত্য অধিপতি বাখর উজবেগের পরাক্রম ও উন্নতি দর্শনে শঙ্কাকুল হইয়াছিলেন বলিয়া বীরশ্রেষ্ঠ বাবরকে মানন্দে গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিলেন । এই সময় বাবর ঠাহাকে বলিলেন, “আমি ক্রীড়াকন্দুকের ভাষ একবার সৌভাগ্যলক্ষীর ক্রোড়ে গৃহীত হইতেছি, এবং তাহার পরফণেই দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি । আমি এত দিন নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়াছি, কিন্তু একবারও স্থায়িতাবে কৃতকার্য হইতে পারি নাই । অতএব ভবাদৃশ আশ্রয়ের পরামর্শলাভ করিতে পারিলে আনন্দিত হইব ।” বাখর প্রতুষ্টরে বলিলেন, “সইয়ানি এক্ষণে আপনার সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যেও প্রভু সংস্থাপন করিয়া প্রভুত্বমতশালী হইয়া উঠিয়াছেন । অতএব অন্য স্থানে ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অধিকতর কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা । এক্ষণে কাবুলে

অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে ; কাবুল আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তির উপযুক্ত ক্ষেত্র।” এই সময় উজবেগগণই দেশমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল ; তৈমুরবংশীয় অধিপতিগণ নিশ্চিন্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া ছিলেন। মাওরাওরাহার তৈমুরবংশীয়গণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। সেখানে আর তাহাদের স্থান ছিল না। উজবেগগণ হিসার ও কুন্দের অধিকারের আয়োজন করিতেছিল। কেবলমাত্র উত্তর পারস্তে অর্থাৎ খোরসানে তৈমুরবংশীয়গণের আধিপত্য বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তদ্রূপ অতিপতি সুলতান হোসেন কখনও বাবরের সাহায্যপ্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে কাবুলের অধিপতি বাবরের পিতৃব্য উলুগবেগ কালগ্রাসে পতিত হন, এবং তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আবদুর রজক পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। একজন বালককে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া কাবুলীরা বিদ্রোহী হন, এবং মুকিমবেগ নামক একজন হুরাকাজ্জ আরগুন মোগল বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া বাবর বাখরের পরামর্শই গ্রহণ করিলেন।

তদনুসারে বাবর ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কাবুল অভিযুগ্মে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল। আমরা সে বিবরণ তাঁহার নিজের ভাষায় বিবৃত করিতেছি। “এই সময় আমি একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলাম। এখনও যে সকল অশুচর আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের সংখ্যা দুই শতের অধিক ও তিন শতের নূন ছিল। ইহাদের অধিকাংশই পদাটিক সৈন্য; ইহাদের পদে নিকট চন্দ্রপাছুকা, হস্তে বংশদণ্ড এবং স্বরূপে শততালিবিধিষ্ট অস্ত্রাধা। আমরা এমন নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমাদের সঙ্গে দুইটীমাত্র তাম্বু ছিল। আমারটি মাতাকে দিয়াছিলাম।” বাবর পশ্চিমধ্যে কুন্দের অধিপতি খসরু খাঁর রাজ্যে উপনীত হইলে তিনি

তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বাবর তাদৃশ অভ্যর্থনার প্রতিদানস্বরূপ খুসরুর দরবারে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া নিজের জন্ত সাত সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করেন ।

যাহা হউক, বাবর এই সৈন্যদল সহ কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তিনি কাবুল রাজ্যের প্রান্তবর্তী হইলে মুকিমবেগ তাঁহার প্রতিরোধ জন্ত সৈন্যে আগমন করিলেন । কিন্তু কতিপয় দিন পরেই তিনি সন্ধিসংস্থাপন করিয়া বাবরের অকুমতি অনুসারে নিজের ধনরত্ন সমভিব্যাহারে কান্দাহারে স্বীয় ভ্রাতা শাহবেগের নিকট গমন করিলেন । অনায়াসে কাবুল রাজ্য বাবরের হস্তগত হইল ।

১৫০৬ খৃষ্টাব্দে উজবেগ অধিপতি সইবানি বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া খোরসান আক্রমণ করিতে উদ্ভোগ করেন । খোরসানের তৈমুরবংশীয় বৃদ্ধ নরপতি সুলতান হোসেন মিরজা যৌবনোচিত উৎসাহসহকারে তাঁহার প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, এবং তৈমুরবংশের শত্রুর বিষদস্ত ভয় করিবার জন্ত তৎক্ষণীয়মাত্রকেই আহ্বান করেন ।

তদনুসারে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বাবর খোরসান অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তিনি খোরসানে পঁছছিবার পূর্বেই সুলতান হোসেন মিরজা কালগ্রাসে পতিত হইলেন ; এবং তদীয় পুত্রদ্বয় সম্মিলিত হইয়া মুরঘাব নদীর তীরস্থ নগরে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন । (১) বাবর

(১) সুলতান হোসেন মিরজার পুত্রদ্বয় সম্মিলিতভাবে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিতে আবুল ফজল তাঁহাদিগকে অজানী বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন । "The folly consisted in the dual appointment for Abul Fazl and his school held that kingship, being the shadow of God head must be single. Babar referring to the joint appointment says. "This is a strange arrangement. A joint kingship was never before heard of. Sheik Sadi Khan in the Gulistan are very applicable to it. Ten

মুরঘাব নদীর তীরস্থ নগরে উপনীত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে হিরাটে গমন করিতে অনুরোধ করেন। এই সময় হিরাট নগর সমস্ত প্রাচ্য দেশের শিক্ষা ও বিলাসের কেন্দ্রস্থল ছিল। ইহার বিচিত্র হর্ম্যরাজি ও কারুকার্যধচিত ধর্মমন্দিরসমূহ মোসলমান জগতের সর্বত্র প্রশংসানীত করিত। তত্রত্য অসংখ্য বিদ্যালয়ে অগাধধৌসম্পন্ন পণ্ডিতগণ শিক্ষাকার্যে ব্রতী ছিলেন। খান্দমীর লিখিয়াছেন, “হিরাট নগর প্রদীপস্বরূপ,— ইহা অন্যান্য নগরকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছে। হিরাট পৃথিবীর আত্মা। লোকে খোরসানকে পৃথিবীর বক্ষঃস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে, তাহা

বাবর অতিরিক্ত সুরাপান নিবন্ধনই অকালে কালপ্রাপ্তে পতিত হন। কিন্তু হিরাটে আগমন করিবার পূর্বে তিনি কখনও মত্তস্পর্শ করেন নাই। এই স্থানেই তিনি সর্বপ্রথমে সুরাপান করিতে শিক্ষা করেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনবৃত্তপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি সুরাপানে লিপ্ত হইবার পূর্বে চিত্তজয় জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন; কিন্তু চতুর্দিকেই প্রলোভনে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবৃত্তিদমন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাবর স্বহস্তে যে বিষবৃক্ষের রোপণ করেন, শেষ কালে তাহাই তাঁহার জীবনের সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে অকালে শুষ্ক করিয়াছিল।

বাবর হিরাটে গমন করিয়া স্বহস্তে আপনার মৃত্যুর বীজ বপন করিলেন; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না। তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিখিয়া-

Dervishes sleep in one covelet (galin) but two kings have not room in one clime (iqlim).” *H. Beveridge.*

ছেন, "তাহাদের (সুলতান হোসেন মিরজার পুত্রবরের) রাজকীয় পট-
বাস, মূল্যবান গালিচা, পরিপাটী পরিচ্ছদ এবং স্বর্ণরৌপ্যানিষ্মিত
পানপাত্র দেশরক্ষার হেতুস্বরূপ ছিল না, বরং শত্রুর লালসায়িতে ইক্কন
নিষ্ক্ষেপ করিত । মিরজাগণ প্রমোদক্ষেত্রে অত্যন্ত সমজদার ছিলেন,
এবং সামাজিক ব্যবহারে ও কথাবার্তার অতিশয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয়
দিতেন । কিন্তু যুদ্ধপরিচালন সম্বন্ধে তাহারা একান্ত অজ্ঞ ছিলেন ;
কি ভাবে যুদ্ধায়োজন করিতে হয়, তাহার কিছুই জানিতেন না, এবং
সামরিক জীবনের বিপদ ও বৌর্য্য সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিলেন ।" উজবেগ-
দিগকে দমন করিবার জন্য একরূপ বিলাসপটু যুগল নরপতির নিকট
হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির কোন আশা নাই দেখিয়া বাবর হিরাট পরিত্যাগ
করিয়া কাবুল অভিযুগে যাত্রা করিলেন ।

এই সময় শীতকাল সমাগত হইয়াছিল, অনবরত তুষারপাত হইতে-
ছিল ; কোন কোন স্থানে তুষাররাশি দুই হাত পর্য্যন্ত পুরু হইয়া
জমাট বাধিয়াছিল । বাবরের পথভ্রম হইল ; পথপ্রদর্শক বহু অনু-
সন্ধানেও প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারিল না । চতুর্পার্শ্ব জনশূন্য ছিল ;
কোন স্থানে আশ্রয় পাইবার উপায় ছিল না । বাবর ও তাহার অনুচর-
গণের দুর্দশার একশেষ ছিল । আমরা এখানে এক রাত্রির বিবরণ-
প্রদান করিতেছি । তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে বাবর খাওয়ানকুঠি নামক
গুহার পার্শ্বে উপনীত হইলেন । তখন প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল ।
তাহারা গুহার নিকট উপস্থিত হইলে রাত্রি সমাগত হইল । এ স্থানের
পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ; সঙ্কীর্ণ তুষারাবৃত পথে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব
বলিয়া বাবরের অনুচরগণ অশ্বপৃষ্ঠে রাত্রিযাপন করিবে বলিয়া অবধারণ
করিল । গুহাটি একরূপ শ্মশানতন বলিয়া বোধ হইতেছিল যে, উহার
অভ্যন্তরে সকলের স্থান সঙ্কুলন হইবে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না ।

অনুচরগণ বাবরকে গুহার অভ্যন্তরে গমন করিয়া রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করিল । কিন্তু তিনি অনুচরবর্গকে বাহিরে ফেলিয়া নিজে আরামে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন না । তিনি বলিলেন, “তোমরা কষ্টভোগ করিবে, আর আমি আরামে থাকিব, তাহা হইতে পারে না । তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কষ্টের ভাগ গ্রহণ করা আমার অবশ্যকর্তব্য । পারস্ত ভাষার প্রবচন প্রচলিত আছে যে, বন্ধুর সংসর্গে মৃত্যু ভোজের তুল্য ।” বাবর অনাবৃত স্থানে বসিয়া রহিলেন, তাহাব মন্তকে, কর্ণে ও ওষ্ঠে চারি ইঞ্চি পুরু হইয়া তুষার পতিত হইল । এমন সময় তাহার অনুচরবর্গ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিল যে, গুহাটি প্রকাণ্ড ও উহার ভিতরে সকলেরই স্থান হইতে পারে । তখন বাবর দৃষ্টান্তে অনুচরগণ সহ গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদে রাত্রিযাপন করিলেন । বাবর সৈনিকগণের সুখ দুঃখের সঙ্গে আপনার সুখ দুঃখ এইরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা তাদৃশ প্রভুভক্ত ছিল, এবং প্রভুর কার্য্যে জীবন তুচ্ছ বোধ করিত ।

বাবর বহুকষ্টে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন যে, তদীয় পিতৃব্যপুত্র খান মিরজা (১) কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, এবং বহুসংখ্যক মোগলকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া প্রতাপাব্বিত হইয়া উঠিয়াছেন । কিন্তু বাবরের আগমনসংবাদ শ্রুত হইয়া তাহার বিপক্ষগণ ভয়ব্যাকুলচিত্তে লুকায়িত হইল । বাবর কাবুলে পহুঁছিয়া সর্বপ্রথমে তদীয় মাতামহী শাহবেগমের (২) নিকট গমন করিয়া নতজানু হইয়া কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন, “যদি মাতা এক সন্তানকে বিশেষরূপে ভালবাসেন,

(১) ইহার মাতা সুলতানা নিগার বেগম বাবরের মাতার বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিলেন ।

(২) বাবরের মাতার বিমাতা ; খান মিরজার মাতার মাতা ।

ভাবে অপর সন্তান কেন ব্যথিত হইবে ? যাতার স্নেহের সীমা নাই । আমি অনেককণ হইল শয্যা হইতে গাত্রোখান করিয়াছি, এবং অনেক পথ পর্যটন করিয়া আসিয়াছি ।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার কোলে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন । বাবরের আগমনসংবাদে শাহবেগম উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন ; এ জন্য তিনি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সঙ্গে তাদৃশ সন্ধ্যাবহার করিলেন । তিনি সম্পূর্ণরূপে নিদ্রাভিভূত হইবার পূর্বেই মিহির নিগার খানম (৩) সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন । বাবর তাড়াতাড়ি গাত্রোখান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন । অতঃপর মিহির নিগার খান মিরজাকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন, “হে মাতৃপ্রাণ বাবর, আমি তোমার অপরাধী ভ্রাতাকে আনয়ন করিয়াছি । তোমার কি ইচ্ছা ?” বাবর তাঁহাকে দৃঢ় আনিষ্টনে আবদ্ধ করিয়া স্নেহে কথাবার্তা কহিলেন । তাঁহার স্নেহময় ব্যবহারে খান মিরজা লজ্জিত হইয়া কাবুল পরিত্যাগ পূর্বক কান্দাহারে গমন করিলেন ।

বাবর এই ভাবে অতি সহজে শত্রুকে বশীভূত করিয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন । এবং পাদশাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাকে চক্রবর্তী রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন । কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও শাস্তি ভোগ করিতে পারিলেন না ;—সর্বদা নানা স্থানে ঋণযুক্ত ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন ।

ইহার চারি বৎসর পরে বাবর পুনরায় সমরখণ্ডের রাজসিংহাসন উজবেগগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন । তাঁহাদের অত্যাচারে

(৩) মিহির নিগার বাবরের যাতার সহোদরা ভগিনী । ইনি বিমাতা শাহবেগমের অনুরাগিনী ছিলেন, এবং তাঁহার (শাহবেগমের) কন্যা মুলতানা নিগার বেগমের গর্ভজাত পান মিরজাকে অপত্নস্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন । কিন্তু বাবরের সঙ্গে কোন কারণে তাঁহার তাদৃশ সন্ধ্যা ছিল না ।

দেশ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল । একত্র সমগ্র দেশ একবাক্যে নব বিজ্ঞে-
তাকে সাদরে গ্রহণ করিল । এই সময়ে বাবরের আধিপত্য বিশাল
ভূখণ্ডে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে । তাতার দেশের সীমান্তবর্তী তাসখণ্ড ও
সৈরাম হইতে কাবুল ও গজনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূখণ্ড ও সমরখণ্ড,
হিসার, কুন্দের ও ফারগনা তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল ।

কিন্তু সোভাগ্যলক্ষী দীর্ঘকাল বাবরের অঙ্কশায়িনী রহিলেন না ।
তারিখ-ই-রসিদি গ্রন্থ ও বাবরের শিক্কা দেখিয়া অল্পমিত হইয়া যে, তিনি
পারস্তুর শাহের করদ-রাজ-রূপে সমরখণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ
করেন । পারস্তুর শাহ শিরা-মতাবলম্বী ছিলেন । বাবরও বাধ্য হইয়া
শিরা ধর্ম ও রীতি নীতির পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন । কিন্তু ইহা তাঁহার
সুন্নিমতাবলম্বী প্রকৃতিপুঞ্জের প্রাণে সহে নাই । তাহার আর বাবরের
পক্ষপাতী রহিল না ; সেইবানির ভ্রায় সুন্নিধর্ম্মাশ্রিত দুরন্ত শাসনকর্ত্তাও
তাহাদিগের নিকট স্পৃহনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল । সমরখণ্ডের
প্রকৃতিপুঞ্জের তাদৃশ মানসিক অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া এক জন
উজবেগ সেনাপতি পুনরায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । বাবর সম্মুখ-
বুদ্ধে বারংবার পরাভূত হইয়া সঠেসে পলায়ন করিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে
ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ;
বাবর আর কোন স্থানে মাথা রাখিবার স্থানপ্রাপ্ত না হইয়া অল্পসংখ্যক
সৈন্ত সহ কাবুলে পুনরাগমন করিয়া শাসনভার গ্রহণ করিলেন ।

সমরখণ্ডে তৈমুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্রবর্ত্তিত্ব করাই
বাবরের জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল । তদীয় পিতার অপমৃত্যুকালে
ফারগনার রাজসিংহাসন একান্ত বিঘ্নসঙ্কুল ছিল । বাবর পিতৃসিংহাসনে
আরোহণ করিয়াই প্রবল বিঘ্নরাশি হইতে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করি-
বার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । সে বিঘ্নরাশি দূরীভূত হইতে না

হইতেই তিনি সমরখণ্ডে তৈমুরের পরিত্যক্ত সিংহাসনের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন । এবং তাঁহার মহিমাচ্ছায়ার অভিনব সাম্রাজ্যের সংগঠন করাই আপনার জীবনের এক লক্ষ্য বলিয়া স্থির করেন । এ লক্ষ্য বাবর ক্রমাগত হুইবার সমরখণ্ড বিজয় করেন ; কিন্তু বিধিচক্রে একবারও তথায় স্থায়িতাবে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই । তাহার পর বাতাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় নানা স্থানে সঞ্চালিত হইয়া কোথাও দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া অবশেষে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে বাবর কাবুলে আধিপত্য সংস্থাপন করেন । এই সময় তিনি বুঝিতে পারেন যে, তৈমুরের সিংহাসনের চতুর্পার্শ্বে তাঁহার মহিমাচ্ছায়ার অভিনব সাম্রাজ্যের সংগঠন করিবার আশা সুদূরপরাহত । বাবরের প্রকৃতি কখনও অল্পে সন্তুষ্ট থাকিত না । কাবুলের ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া তাঁহার প্রকৃতি নিরস্ত হইতে পারে নাই । বাবর ভারতবিজয় করিয়া স্বীয় হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম করেন । কিন্তু নানা কারণে তাঁহার ভারতবিজয়ে প্রবৃত্ত হইতে বিলম্ব হইতেছিল ; এ দিকে পুনরায় অনুকূল বাতাস বহিতে আরম্ভ করে, এবং বাবর ভারতবর্ষের ধনৈর্ঘ্য করতলগত করিবার কল্পনা পরিত্যাগ পূর্বক সেই বাতাসে ভর করিয়া আপনার লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইয়া সমরখণ্ডের চতুর্পার্শ্বে বিস্তীর্ণ রাজ্যের পত্তন করেন । কিন্তু কিঞ্চিদধিক সार्দ্ধ বৎসর গত হইতে না হইতেই তাঁহার ক্ষমতা পুনর্বার ক্ষুদ্র কাবুল রাজ্যে সীমাবদ্ধ হয় । তৃতীয় বার অকৃতকার্য হইবার পর সমরখণ্ডে চক্রবর্ত্তি করিবার শেষ আশা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিল ।

বাবর স্বরচিত জীবনযন্ত্রে লিখিয়াছেন, “২১০ হিজিরী অব্দে

(১৫০৪—৫ খৃঃ) কাবুলবিজয়ের সময় হইতে আমি সর্বদাই হিন্দুস্থান বন্ধু-
 ভূত করিবার জন্য অভিলাষী ছিলাম । কিন্তু কোনও সময়ে বা আমার
 আর্মীরবর্গের দুর্ব্যবহার এবং আমার নির্দিষ্ট প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের
 অনভিপ্রায়বশতঃ, কোনও সময়ে বা আমার ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধাচরণ ও
 ষড়যন্ত্র নিবন্ধন আমি সে দেশে সৈন্ত সমতিব্যাহারে গমন করিতে পারি
 নাই ; তাই তত্রত্য রাজ্যসমূহ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল ।
 অবশেষে এই সমুদয় বাধা বিপত্তির অবসান হইয়াছিল । কি ছোট,
 কি বড়, কি সামন্ত, কি সাধারণ ব্যক্তি, কেহই এই দুক্লহ কার্যের
 বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে সাহস করেন নাই । ৯২৫ হিজিরী অব্দে আমি
 সৈন্তসংগ্রহ করিয়াছিলাম, এবং দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে দুর্গ অধিকার
 করিয়া তত্রত্য নিযুক্ত সৈন্তদিগকে তরবারিমুখে সমর্পণ করিয়াছিলাম ।
 তদনন্তর আমি অগ্রসর হইয়া বাহবাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম ; এখানে
 লুণ্ঠন ও লুণ্ঠন জন্য পরিভ্রমণ নিবারণ করিয়া অধিবাসীদিগকে নির্দিষ্ট
 হারে অর্থপ্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম, এবং নগদ অর্থে এবং
 নানাবিধ দ্রব্যে চারি লক্ষ শাহরুখি আদায় করিয়া আমার কর্ম্মাধীন
 সৈন্তবৃন্দের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তার পর কাবুলে
 প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলাম । এই সময় (৯২৫) হইতে ৯৩২ হিজিরী (১৫২৬
 খৃঃ) পর্য্যন্ত আমি হিন্দুস্থানের কার্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে নিরত ছিলাম,
 এবং সাত আট বৎসরে সর্বসৈন্তে পাঁচ বার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া-
 ছিলাম । পঞ্চমবার মহান্ পরমেশ্বর করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া
 সুলতান এব্রাহিমের শত্রু প্রবল শত্রুকে পরাভূত করিয়া আমাকে
 গৌরবপূর্ণ হিন্দু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছেন ।”

বাবরের চতুর্থবার ভারত অভিযানকালে সুলতান এব্রাহিম হিন্দু-
 স্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এব্রাহিম দুর্বলচিত্ত শাসনকর্তা

ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজত্বকালে রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন ও নিস্তেজ হইতেছিল । তদীয় ভ্রাতা বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলে কতিপয় আমীর ওমরাহ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন । এব্রাহিম অবাধ্য ভ্রাতাকে দমন করিবার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । এব্রাহিম রণক্ষেত্রে বিজয়শ্রী ঘরণ করিয়া আমীরবর্গের সঙ্গে নৃশংস ব্যবহার করাতে সমগ্র দেশে বিদ্রোহানল জলিয়া উঠে, এবং সেই সুযোগে পঞ্চনদ প্রদেশের ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা দৌলত খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করেন ।

হিন্দুস্থানের এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সময় দিল্লীর রাজবংশসম্বৃত্ত আলাউদ্দীন ওরফে আলম খাঁ (সম্পর্কে এব্রাহিমের পিতৃব্য) পলায়ন করিয়া কাবুলে বাবরের নিকট উপনীত হন, এবং দিল্লীর সিংহাসন অধিকারকল্পে নির্বাকসহকারে সাহায্য প্রার্থনা করেন । আলম খাঁর কাবুল দরবারে উপনীত হইবার অব্যবহিত পরেই পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলতখাঁ বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষে আহ্বান করিলেন । দিল্লীর রাজসিংহাসন অধিকার করিবার সর্বোত্তম অবসর উপস্থিত দেখিয়া বাবর রণসাজে সজ্জিত হইলেন । এব্রাহিমের কঠোর ব্যবহারে প্রকৃতিপুঞ্জ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিল, এবং অন্তর্দ্রোহে রাজশক্তি ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল । প্রকৃতিপুঞ্জের ঈদৃশ মানসিক গতির সময় হিন্দুস্থানের একজন রাজকুমার সহযোগী থাকিলে অতি সহজে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া, বাবর আলম খাঁকে সাহায্য প্রদান করিবার ব্যপদেশে বিপুল সৈন্য সহ অচিরে পঞ্জাবে উপনীত হইলেন । বাবর তথায় উপনীত হইয়া সমগ্র প্রদেশ অধিকার পূর্বক আলম খাঁকে দিল্লীপুরের শাসনকর্তৃপদে বরণ করিলেন ; কিন্তু দৌলত খাঁর বিশ্বস্ততা সন্দেহে সন্নিহান হইয়া তাঁহার সঙ্গে তাদৃশ সন্ধ্যাবহার করিলেন না ।

দৌলত খাঁ বাবরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তোষিত হইলেন ।

বাবর কতিপয় বিশ্বস্ত সৈনিক পুরুষকে পঞ্জাব রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং কোন গুরুতর কারণবশতঃ কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তাঁহার পঞ্জাব পরিত্যাগের পর দৌলতখাঁ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আলম খাঁকে দিবলপুর হইতে তাড়াইয়া দিলেন, এবং মোগল রাজ-পুরুষদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন । আলম খাঁ দিবলপুর হইতে তাড়িত হইয়া কাবুলে গমন করিলেন । ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বাবর পাদশাহ আলম খাঁকে সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে পঞ্জাবে উপনীত হইলেন । দৌলত খাঁ চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু মোগলের আক্রমণে তাঁহার বিপুল সৈন্য বায়ুমুখে কার্পাসতুলার ছায় উড়িয়া গেল । অতঃপর বাবর শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে সসৈন্তে শিরিরসংস্থাপন করিলেন ।

বাবর পাণিপথে শিরিরসংস্থাপন করিলে এব্রাহিম তথায় সসৈন্তে উপনীত হইলেন । আমরা বাবরের স্বরচিত জীবনবৃত্ত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—“আমাদের বিরুদ্ধে সমবেত শত্রুসৈন্তের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল, এইরূপ অনুমিত হইয়াছিল । সম্রাটের সেনানায়ক ও হস্তীসংখ্যা এক সহস্র ছিল । তিনি পিতা ও পিতামহের সঞ্চিত ধনরাশির অধিকারী ছিলেন । এই ধনরাশি প্রচলিত মুদ্রায় আবদ্ধ ছিল, এজন্য উহা অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারিত । শত্রুগণ যে অবস্থার পতিত হইয়াছিল, তদনুরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে যে সকল মুদ্রাব্যবসায়ী বেতন গ্রহণ করিয়া কাজ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিবার রীতি ভারতবর্ষে প্রচলিত

আছে । এই সৈন্যদিগকে 'বধিন দি' (Badhin di) বলে । যদি এতাহিম এই রীতির অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আরও এক লক্ষ কি দেড় লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারিত । কিন্তু সর্বশক্তিমান দৈবর প্রত্যেক বিষয় মঙ্গলের জন্তই পরিচালিত করিয়াছিলেন । এমন কি, নিজের সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না ; তিনি আপনার ধনরাশি ব্যয় করিতেন না । তিনি যতদূর সম্ভব কৃপণ ও ধনসঞ্চয়ে অপরিমিত প্রয়াসী ছিলেন ; একরূপ অবস্থায় সৈন্যদিগকে কিরূপে সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর ? তিনি অপরিণতবয়স্ক, অনভিজ্ঞ এবং সৈন্যপরিচালনা সহজে অনন্যযোগী ছিলেন ; তিনি বিশৃঙ্খলভাবে অভিযান অথবা প্রস্থান করিতেন, এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি না করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন । যে সময়ে সৈন্যগণ পানিপথ ও পার্শ্ববর্তী স্থানে আপনাদের অবস্থানভূমি কামান, বৃক্ষশাখা ও পরিখা দ্বারা সুদৃঢ় করিতেছিল, তখন দরবেশ মোহাম্মদ স্মরবান আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাদের অবস্থানভূমি একরূপ সুদৃঢ় করিয়াছেন যে, ইহা সম্ভবপর নহে যে, তিনি কখনও এখানে আসিতে উদ্বৃত্ত হইবেন' ।"

উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত নীরব রহিল ; কেহই অগ্রসর হইয়া প্রথমে আক্রমণ করিল না । নূনাধিক এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে ২০শে এপ্রিল তারিখে রাত্রিযোগে বাবর আকস্মিক আক্রমণে শত্রুশিবির আধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু অন্ধকারবশতঃ সৈন্যশ্রেণী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়াতে তিনি সফলকাম হইতে পারিলেন না । যোগল সৈন্য অতি সহজে পরাস্ত হওয়াতে এতাহিম তাহাদের সামরিক বল নগণ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এবং তজ্জন্ত আশ্চর্যচিত্তে পর দিবস প্রাতে সসৈন্তে গড়বন্দী পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন । সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ

হইল ; দিবা দিপ্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল । অবশেষে বিজয়শ্রী বাবরের গলদেশে জয়মালা অর্পণ করিলেন । আফগান সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । প্রায় পঞ্চদশ সহস্র আফগান সৈন্য স্বীয় প্রভুর কার্যো জীবন বিসর্জন করিয়া রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল । এবং স্বয়ং এব্রাহিম শত্রু-হস্তে কালগ্রাসে পতিত হইলেন । (১) মোগল সৈন্য মগোরবে তাঁহার ছিন্ন শির বাবরের নিকট আনয়ন করিল । বাবর লিখিয়াছেন, “সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের অমূল্য ও কৃপায় এই দুর্লভ কার্য আমার নিকট সহজসাধ্য হইয়াছিল, এবং সেই বিপুল বাহিনী অর্দ্ধদিবামধ্যেই ধূলবিং উড়িয়া গিয়াছিল ।” সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার জন্য বাবর দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, এবং পর দিবস প্রাতে স্বয়ং আগ্রার অভিমুখে যাত্রা করিলেন । ২৭শে প্রাণিল শুক্রবার রাজধানীর মসজিদে মসজিদে নূতন সম্রাটের নামে খোতবা পাঠিত হইল ।

বাবর দিল্লী ও আগ্রার রাজকোষ করতলগত করিয়া স্বপ্রাতিত ধনরাশি লাভ করিলেন, এবং সর্বপ্রথমেই এই বিপুল ধনরাশি অর্ধ-

(১) পাণিপথের সমরক্ষেত্রে আফগান গৌরবের সমাধি হইয়াছিল । তাহার শোকাবেগে অকম্পিত এব্রাহিমকে ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তির উচ্চাসন প্রদান করে । পাণিপথের যুদ্ধের বহু পরেও আফগানগণ এব্রাহিমের সমাধিস্থলের নিকট উপনীত হইয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত । পাণিপথ লোকের ভীতিভর ছিল, রাত্রিতে কেহই সে স্থান দিয়া গমনাগমন করিতে সাহসী হইত না । লোকের বিশ্বাস ছিল,—তথায় রাত্রিকালে ক্রন্দনধ্বনি, আর্তনাদ ও নানাপ্রকার অশ্বাত্তাবিক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । ইতিহাসবেত্তা বদায়ুন সত্যপ্রিয় বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি একদিন রাত্রিযোগে কতিপয় বন্ধু সমভি-বাহারে সে স্থান দিয়া গমনকালে অশ্বাত্তাবিক শব্দ শুনিয়া ভীতিবিহীন হন, এবং বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের নাম জপ করেন ।

লোলুপ সৈন্তগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন । এই ব্যাপারে তিনি অসামান্য দানশীলতা প্রদর্শন করেন । রাজকুমার হুমায়ুন রণক্ষেত্রে অসাধারণ শৌর্য বীৰ্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বাদশাহ তাঁহাকে সত্তর লক্ষ দাম (বর্তমান সময়ের প্রায় তিন লক্ষ টাকা) প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করেন । তাঁহার প্রধান প্রধান বেগ-গণের প্রত্যেকে স্ব স্ব পারদর্শিতানুসারে ছয় লক্ষ হইতে দশ লক্ষ দাম (বর্তমান সময়ের প্রায় ২৫ হাজার হইতে ৪২ হাজার টাকা) প্রাপ্ত হন । সৈনিক পুরুষমাঝেই গুণানুসারে অল্পাধিক অর্থলাভ করেন ; এমন কি, শিবিরসঙ্গী ও দোকানদারগণও এই অদৃষ্টপূর্ব্ব “খরবাতের” সময় বঞ্চিত হইয়াছিলেন না । এতদ্ব্যতীত অনুপস্থিত রাজকুমার ও আত্মীয় স্বজনকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও ক্রীতদাস দাসী, ফারগনা, খোরসান, কাশঘর ও পারস্যের বহুগণকে আণ্যায়িত করিবার জন্য নানাবিধ উপঢৌকন এবং হিরাট, সমরখণ্ড, মক্কা ও মদিনার সাধুপুরুষগণকে সম্মানিত করিবার জন্য মহাৰ্ষ দ্রব্য প্রেরিত হয় । অবশেষে বিজয়োৎসব উপলক্ষে বাবর স্ত্রী পুরুষ, বাল বৃদ্ধ, স্বাধীন পরাধীন নির্ভিংশেষে কাবুলিদিগকে এক একটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করেন । এইরূপে মুক্তহস্তে দান করিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা রাজ্যাশাসনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ রাজকোষে সঞ্চিত হয় । বাবর নিজে এক কপর্দকও গ্রহণ করিয়াছিলেন না । তিনি কখনও অর্থলোভী ছিলেন না ; তাঁহার সংস্কার ছিল, বিতরণেই অর্থের সার্থকতা ; তাহাতেই তিনি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন । (১)

(১) বিজয়ী মোগল সৈন্ত আগ্রাতে প্রবেশ করিলে জনৈক হিন্দু রাজার অকল্পিত বিধবা মহিষী রাজকুমার হুমায়ুনকে এক খণ্ড বহুমূল্য হীরক উপহার প্রদান করেন । বাবর লিখিয়াছেন, ইহার মূল্য সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধ দিবার ব্যয় । রাজকুমার বাবরকে এই হীরকখণ্ড প্রদান করিলে তিনি উহা নিজে না রাখিয়া তাঁহাকেই

বাবর বিশ্ববিশ্রুত দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ; কিন্তু ভারতের স্ব স্ব প্রধান স্বাধীন অধিপতিগণ (বাবরের ভারতবিজয়কালে বহুসংখ্যক স্বপ্রধান স্বাধীন রাজ্য ছিল) তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার জন্য বন্ধপরিকর হইলেন ; দিল্লীর শাসনাধীন প্রদেশসমূহ সহজে তাঁহার বশতা স্বীকার করিল না । এই সময়ে দিল্লীর আধিপত্য পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশ হইতে অনুগঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত ও হিমালয়ের পাদদেশ হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । আগ্রার চতুর্পার্শ্বে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত ছিল । অন্যান্য প্রদেশের প্রজাবর্গ ও নবগত মোসলমান সৈন্তের গতিরোধ করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল । বাবর স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন,—“আমার আগ্রার আগমনকালে গ্রীষ্মঋতু সমাগত হইয়াছিল । ভীতিবিহ্বল হইয়া সমগ্র অধিবাসী পলায়ন করাতে আমাদের আহাৰ্য্য শস্য ও অশ্বের জন্য ঘাসের অভাব হয় । পল্লীবাসীরা আমাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতাবশতঃ বিদ্রোহী হইয়া চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তিতে নিরত হইয়াছিল । রাজকোষের ধনরাশি বণ্টন করিয়া দিবার পর বিভিন্ন পরগণা ও মহকুমা অধিকার ও রক্ষা

পুনর্বার অর্পণ করেন । সুবিখ্যাত বেতারিজ সাহেব ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত এক খানি হস্তলিখিত গ্রন্থে দেখিয়াছেন যে, হুমায়ুন এই অভূতাবল হীরকখণ্ড পারস্তের শাহকে অর্পণ করেন, এবং পারস্তের শাহ তাহা তত দূর যূলাবান মনে না করিয়া দক্ষিণাপথের নিজাম শাহকে দান করেন । বেতারিজ সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে, মীরজুমা মোগল সাম্রাজ্যের সেনাপতি-পদে বৃত্ত হইয়া শাহজাহানকে যে মহামূল্য হীরকখণ্ড উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন, তাহা এই হীরক । মীরজুমা মোগল সাম্রাজ্যের সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে দক্ষিণাপথে গোলকুণ্ডার সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন । বাবর হুমায়ুনের প্রাপ্ত হীরকের ওজন আট মিস্কাল অর্থাৎ ৩২০ রতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । মোগল দরবারের বিশেষজ্ঞ টাভারনিয়ারও মীর জুম-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কোহিনুরের ওজন ৩১৯।০ রতি । অতএব উভয় হীরক এক হওয়া অসম্ভব নহে ।

করিবার জন্য উপযুক্ত লোক পাঠাইবারও অবসর পাই নাই । ঘটনাক্রমে এই বৎসরই অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল ; এই সময় অনেক লোক সাইমনবাগুগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা পঞ্চত লাভ করে ।

“এই সব কারণে আমার অনেক বেগ ও উৎকণ্ঠ যোদ্ধা উৎসাহহীন হইয়া হিন্দুস্থানে অবস্থান করিতে আপত্তি প্রদর্শন করেন, এবং প্রত্যাবর্তনের জন্য আয়োজনেও প্রবৃত্ত হন । (১) সৈন্যগণের এইরূপ অসন্তোষের বিষয় শুনিবামাত্র আমি সমস্ত বেগকে দরবারে আহ্বান করি । * * * আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, ‘ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি আমার প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিয়াছি, এবং বহুসংখ্যক দেশ ও রাজ্য বিজয় করিয়াছি ; এই সব দেশ এক্ষণে আমাদের অধীনে রহিয়াছে । বাহিত-কললাভের জন্য সমস্ত জীবন ক্ষয় করিয়া প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত কোন হুঃখে আমরা বিজিত দেশসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিরাশা ও পরাজয়ের পরিচয় প্রদানপূর্বক কাবুলে পলায়ন করিতে বাধ্য হইব ? যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা যেন অন্তঃপর আর কখনও এমন প্রস্তাব না করে । কিন্তু তোমাদের

(১) বেগ-গণ ভারতবর্ষের প্রতি কিরূপ বিরূপ হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা এ স্থানে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি । বাবর হিন্দুস্থান বিজয়ের পর খাজে কনান নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বেগকে গজনির শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করেন । ভারতবর্ষ-পরিত্যাগের প্রাকালে খাজে দিল্লীর প্রাচীরগাত্রে নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখিয়া যান ।

If safe and sound I pass the Sind,
Damned if I ever wish for Hind.

বাবর ইহার উত্তরে লিখেন,

Babar ! Give all thanks that the favour of God Most High
Hath given the Sind and High and wide spread royalty.

If the heat of India make thee long for the mountain cold,
Remember the frost and ice that numbed thee in Ghazni of old.

বাধ্য যদি এমন কেহ থাকে যে, এখানে অবস্থান করিতে অনিচ্ছুক হয়, অথবা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তবে তাহাকে বাইতে দাও ।’ তাহাদের নিকট এইরূপ সম্মত প্রস্তাব করিবার পর, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ যতই অনিচ্ছায় হউক না কেন, বাধ্য হইয়া স্ব স্ব অশান্তিজনক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে।”

হিন্দুস্থানের সিংহাসনাধিকারের পর বাবর চতুর্দিকে বিপদাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁহাকে বিপন্ন অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হয় নাই । বালসূর্য্যের কিরণের স্ত্রাম বাবরের গুণাবলী দেশের সর্বত্র অচিরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, এবং বহু কালের অত্যাচারদগ্ধ প্রকৃতিগুহ্ম তাঁহাকে দয়া দাক্ষিণ্যে অলঙ্কৃত দেখিয়া মোগলের সিংহাসনতলে শান্তিচ্ছায়া লাভ করিবার আশায় এতদে একে বশুতা স্বীকার করিল । সুবিখ্যাত ম্যালিসন লিখিয়াছেন, “The difficulty of Babar in conquering India arose from independent Musalman Kings and Hindus who considered Babar as an intruder and oppressor of their rights and an discontented army.” বাবর হিন্দুদিগকে সহ্যবহারে প্রীত করিয়া, স্বাধীন অধিপতিদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া, এবং সৈন্তবৃন্দকে কোশলে বশীভূত করিয়া, পর্তুপ্রমাণ বিশ্ব বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন । এই মুকুলসদৃশ সাম্রাজ্য উত্তরকালে পূর্ণ বিকশিত হইলে উহার সৌরভ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার শোভায় মুগ্ধ হইয়া বৈদেশিক বণিকগণ দলে দলে মধুলোভে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন । বাবর এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । বাবরের সমসাময়িক রাজন্তবর্গ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জন্য বহুপরিকল্প

হইরাছিলেন। তাঁহারা জলবুদুদের দ্বারা বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কোন চিহ্নই ধরনীপৃষ্ঠে অঙ্কিত নাই। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমায় বাবর অমরত্ব লাভ করিয়া আজও শ্রদ্ধা এবং স্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন। ফলতঃ, বাবর দ্ব্যর্থই নির্দেশ করিয়াছেন, “যদি আমাকে বিনাশ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় না থাকে, তবে সমগ্র পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও আমার একটি শিরাও কৰ্ত্তন করিতে পারিবে না। (১)

বাবর নিকটক হইয়া হিন্দুস্থানের শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। (২) বহুগ্রন্থ হিন্দুস্থানের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াও তাঁহার হৃদয় হইতে সমরধ্বজের আশা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। একদা দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি শাহজাদা হুমায়ুনকে সমরধ্বজ বিজয়ার্থ প্রেরণ করেন।

বাবরের ভারতবর্ষে আগমনের পর ন্যূনাধিক পঞ্চবর্ষ অতিবাহিত

(১) একজন ইংরেজ কবি বাবরের এই মহাকাব্য নিম্নলিখিত ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন,—

Brandish the sword of the world as you may,
It can cut no vein if God says, ‘nay’

(২) বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তারপর তিনি ভারতবর্ষে যে সকল যুদ্ধে লিপ্ত হন, আমরা এখানে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(ক) চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহ অতিশয় পরাক্রান্ত অধিপতি ছিলেন। বাবর তাঁহাকে সিক্রির যুদ্ধে পরাভূত করেন। সংগ্রাম সিংহ এত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি বাবরের হস্তে পরাজিত না হইলে সম্ভবতঃ দিল্লীর অধীশ্বর হইতে পারিতেন।

(খ) বাবর চান্দেরী দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। দুর্গের অবরোধকালে দুর্গবাসীরা অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া প্রাণ-বিসর্জন করেন। রমণিগণ স্বধর্ম্মরক্ষার্থ চিঠানলে জীবনহতি প্রদান করেন। এই সময় রাজপুতকুলোদ্ভব মেদিনী রাজ দুর্গাধিপতি ছিলেন।

(গ) বাবরের রাজত্বের প্রারম্ভে বিহারে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। বাবর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিহারে শান্তিসংস্থাপন করেন।

হইলে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ সমাগত হইল, এবং হুমায়ূন অভীষ্ট বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া জনকজননীকে দেখিবার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পূর্বে কোন সংবাদ প্রেরণ না করিয়াই হঠাৎ আগ্রাতে উপনীত হইলেন। বাবর স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, “আমি হুমায়ূনের মাতার সঙ্গে তাঁহার বিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম, এমন সময় হুমায়ূন আসিয়া পহুছিলেন। তাঁহার আগমনে আমাদের হৃদয় গোলাপ মুকুলের স্থায় প্রস্তুত ও আমাদের নয়ন বর্তিকার স্থায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ভোজনের সময় আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা আমার নিয়ম ; কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ ভোজের আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে মর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলাম ; আমরা পরম ঘনিষ্ঠতার কিয়দিবস একত্র বাস করিয়াছিলাম।”

বাবর তাঁহার পুত্রকে কিরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা ইহার কতিপয় মাস পরে প্রকাশিত হয়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হুমায়ূন প্রবল জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে নিরাময় করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন যে, ঈশ্বরের নিকট কোন মহান উৎসর্গ ব্যতীত হুমায়ূন এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। এ কথা বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি পুত্রের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। মৌলবীগণ তাঁহাকে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে রাজকোষের সঞ্চিত ধনরাশি, এমন কি, তাঁহার নিজের জীবন ব্যতীত আর বাহ্য কিছু আছে, সে সমস্তই উৎসর্গ করিবার জন্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন। বাবর কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না ; তিনি বলিলেন, “আমার পুত্রের সঙ্গে কোন্ রত্নের তুলনা হইতে পারে ?” তিনি পুত্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকের সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং তাহার পর রুম-পুত্রের চতুর্দিকে বারতরু পরিক্রমণ করিতে করিতে

বলিতে লাগিলেন, 'ইহার সমস্ত ব্যাধি আমাতে লুপ্ত হউক।' ইহার পর হুমাযুন সুস্থ হইলেন। কিন্তু বাবর ক্রমশঃ অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। (১) তিনি মৃত্যুর পূর্বে সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া হুমাযুনকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন। ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। তাঁহার মৃতদেহ কাবুলের শৈলমালার গাত্রদেশে অবস্থিত একটি রমণীয় উগ্ধানবাটিকার মধ্যস্থলে মহাসমারোহে সমাহিত হয়। বাবর এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তথায় মৃত্যুর পর সমাহিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিমন্দির প্রকৃতির রম্য স্থানে অবস্থিত; উহার চারিদিকে সুরভি কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত ও সমুখভাগে নিম্নল-সলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। বাবর কত দিন এই নিৰ্ঝরিণীর তটে উপবেশন করিয়া রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইতেন। এখনও যাত্রিগণ দলে দলে এই স্থানে আগমন করিয়া মর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত সমাধিমন্দিরে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়া থাকে। বাবর ইহলোক হইতে অপমৃত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কীর্তিগাথা এখনও গীত হইতেছে।

"Death makes no conquest of this Conqueror.

For now he lives in Fame."

বাবর দুই কারণে মানবজাতির মনোমন্দিরে স্থানলাভ করিয়াছেন। প্রথম, ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়, আত্মজীবনবৃত্ত

(১) "The frequent illness from which he had suffered in India, culminating in the nervous prostration that succeeded his anxiety for his son had undermined his great strength."—Stanley Lane Poole

রচনা (১) এই গ্রন্থে “একটি অকৃত্রিম আদর্শ চিত্রজীবন লাভ করিয়া বিরাজ” করিতেছে। এই জীবনবৃত্ত অবলম্বনে লিখিত জুইনের গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া আমরা তাঁহার অনন্তসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাবর সাহসী, তেজস্বী ও প্রতিভাশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা “মানব সাধারণের মনের উপর বিশাল শক্তি সহকারে কার্য করিয়াছে।” এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই সাধারণ মানবগণ মত্তমুগ্ধবৎ তাহার অনুসরণ করিয়াছে। বাবর সরলহৃদয়, সদাপ্রফুল্ল ও আত্মীয় স্বভাবে বিশ্বাসবান ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় দুঃসহ কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতা এক দিনের ক্ষণও বিনষ্ট হয় নাই। কি দুঃসহ ক্লেশভোগের সময়, কি প্রৌঢ়াবস্থায়, তিনি আজীবন যুবকের ত্যায় প্রফুল্লচিত্ত ও উদ্যমশীল ছিলেন। বাবর পারিবারিক জ্ঞানের আধারস্বরূপ ছিলেন;—তিনি আত্মীয় স্বভাবে একান্ত প্রীতিবান ও ধনী নিধন বালবৃদ্ধদ্বীপুরুষনির্কি-শেষে মনুষ্যমাত্রের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী ছিলেন। অধিকাংশ মোসলমান নরপতি বাহ্যভঙ্গুরপ্রিয় ও আত্মপরায়ণ; বাবর সরলহৃদয় বন্ধুবৎসল। প্রোড় বাবর বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে বালকের ত্যায় রোদন করিয়াছেন, এবং তাহা অকপটচিত্তে আত্মজীবনবৃত্তে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুস্তকের নানাস্থানে মাতা ও অন্যান্য পুরমহিলার সহকে এরূপ গভীর অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে

(১) “His permanent place in History rests upon his conquests which opened the way for an imperial line.”—*Stanley Lane Poole*.

“His autobiography is one of those treasures which are for all time and is fit to rank with the confessions of St. Augustine and Rousseau and the memoirs of Gibbon and Newton—in Asia it stands almost alone.”—*H. Beveridge*.

মনে হয়, যেন তিনি তাঁহাদের অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া কখনও বহির্ভাগে গমন করেন নাই। বন্ধুবর্গের প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার সংশ্রব ছিল বলিয়া আত্মজীবনবৃত্তে তাঁহার নিজের চিত্রের ন্যায় তদীয় বন্ধুবর্গের চিত্রও পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। বাবরের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা হাইদার আলি লিখিয়াছেন, “তিনি (বাবর) নানা গুণে অলঙ্কৃত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে সদাশয়তা ও দানশীলতাই সর্বাঙ্গগণ্য ছিল।” তাঁহার আদেশে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নিহত হইয়াছে। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক প্রাণদণ্ডেও তিনি আপনার প্রভুত্ববশে কোন কার্য্য করেন নাই; সে সময়ের রীতি নীতির অনুগত হইয়াই তাদৃশ কঠোর আদেশ প্রদান করিতেন। বাবরের কোন ভ্রাতাই হউন, কিম্বা তাঁহার কোন সামন্তই হউন, যিনিই বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া অথবা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পরিশেষে আত্মাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হইয়া বশত স্বীকার করিতেন, তাঁহাকেই তিনি আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আরব্য, পারস্য ও ভারতবর্ষের রাজনীতি উপেক্ষা করিয়া অকপটচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসপূর্ণ হইয়াছেন। বাবর কেবলমাত্র পুরুষোচিত গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন না, নানাবিধ স্নেহময় বিদ্বান্বেষণেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি পারসী ও তুর্কি ভাষায় বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কবিতা ভাষার মাধুর্য্য ও ভাবের প্রাচুর্য্যে অতি প্রসিদ্ধ। এমারত ও কৃষিকার্য্যেও তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরাঙ্গুখ ছিল না। তিনি উদ্যানবাটিকা ও প্রাসাদ-নির্মাণকালে সমস্ত কার্য্য স্বয়ং পধ্যবেক্ষণ করিতে ভালবাসিতেন। বাবর কৈশোর হইতে আমরণ অসিহস্তে যাপন করিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রামস্থল অল্পই ঘটিয়াছে। রণকোলাহল হইতে অতি অল্প সময়ের

জন্মই দূরে থাকিতে পারিয়াছেন । একপ অবস্থাতেও তিনি যে নানা বিজ্ঞান পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ মেধা ও প্রবল জ্ঞানলিপ্সার পরিচায়ক । বাবরের অসাধারণ শারীরিক বল ছিল । তিনি লিখিয়াছেন, “আমি আমোদের জন্ত গঙ্গানদী সস্তরণ পূর্বক উত্তীর্ণ হইয়াছি । অভিযানকালে যে সকল নদী আমার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক গঙ্গা ব্যতীত আর সকল নদীই সস্তরণপূর্বক উত্তীর্ণ হইয়াছি ।” তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ ক্রোশ অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারিতেন ! তাঁহার দ্রুতগতি বিস্ময়কর ছিল ।

বাবর ঈদুশ নানা গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার সমসাময়িক তৈমুরবংশীয় রাজ্যন্তবর্গ জলবুদ্বুদের জ্ঞান মিশিয়া গেলেও তিনি ধরনীপৃষ্ঠে পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া ইহজীবন শেষ করিতে পারিয়াছিলেন । যে সময় কিশোরবয়স্ক (একাদশ বৎসর) বাবর ক্ষুদ্র ফারগনার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎকালে ফারগনার চতুর্দশবর্ষী রাজ্যসমূহে তৈমুরবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেছিলেন । কিন্তু তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবার পূর্বেই তাঁহারা বিলুপ্ত হইয়াছিলেন । বৈদেশিক আক্রমণে অথবা রাজপুরুষগণের বিশ্বাসঘাতকতায় এই রাজ্যন্তবর্গ স্রোতোমুখে তৃণখণ্ডের জ্ঞান ভাসিয়া গিয়াছিলেন । বাবরও এই প্রবল বস্তায় ভাসমান হইয়াছিলেন, এবং উহা তাঁহাকে দূরদেশে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল ; কিন্তু সস্তরণপটু বাবর আপনারি উদ্যমে কূলপ্রাবী তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া তটদেশ প্রাপ্ত হন । যদি তিনিও তৈমুরবংশীয় অন্যান্য রাজগণের জ্ঞান এই বস্তায় নিমগ্ন হইতেন, তাহা হইলে সেই বিপুল বংশের রাজ্যনাম চিরকালের জন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইত । কিন্তু বাবর আত্মরক্ষা করিয়া মৃত্যুর পূর্বে আমু হইতে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ।

বাবর জীবনের অধিকাংশই সমরকোলাহলের মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে কোন কার্য করিতে পারেন নাই । কিন্তু তিনি রণক্ষেত্র হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেই যে বিশ্রামকালে স্বভাবস্বলভ উদ্যম ও উৎসাহসহকারে রাজ্যশাসনের শৃঙ্খলা ও প্রকৃতিপুঞ্জের উন্নতিবিধান করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । বাবর জীবনের সাম্রাজ্যকালে হিন্দুগণের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া নানাধিক পঞ্চবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও তাঁহাকে অনবরত সন্ধিবিগ্রহে ব্যাপ্ত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই ।

বাবর সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন । এই সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের কোন সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল না । নরপতির অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল । প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক প্রদেশ, প্রত্যেক বিভাগ, এমন কি পল্লী পর্য্যন্তের শাসনকার্য সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে স্থানীয় আচার ব্যবহারের মর্যাদা রক্ষিত হইত । বিচারকার্য নির্বাহ করিবার জন্য দেশে নিয়মবদ্ধ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল না । হিন্দুদের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে গ্রাম্য অথবা বিভাগীয় কর্মচারিগণ তাহার বিচার করিতেন ; কোন কোন স্থলে পঞ্চায়েত প্রথামতেও বিবাদের মীমাংসা হইত । এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার নিকট অভিযোগ করা চলিত ; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন নিয়মবদ্ধ প্রণালী ছিল না । কাজিগণ মোসলমান প্রজাপুঞ্জের বিচার করিতেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না । তাঁহারা কেবলমাত্র বিবাহ অথবা ধর্ম বিষয়ে কোনরূপ মত-দ্বৈধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিতেন । ভূমি সঙ্গর্ভীয় বিবাদ গ্রাম্য কর্মচারিগণ কর্ত্তক মীমাংসিত না হইলে বিভাগীয় কর্মচারী,

জমীদার অথবা জায়গীরদার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন। প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমায় (যত দূর সম্ভব) ব্যাপারই হউক না কেন) অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচালন করিতেন।

বাবর অষ্টচত্বারিংশতম বর্ষে ইহলোক হইতে অপমৃত হন। অপরিমিত সুরাপানই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ। যদি তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইতেন, তাহা হইলে এই অসাধারণ যোদ্ধা হুয়াজ্জের শাসন সংরক্ষণের অভিনব সুপ্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া জন-সমাজে একজন রাজনীতিচূড়ামণি বলিয়াও প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। বাবর দ্বাবিংশ বৎসরের পূর্বে কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু এই সময় হইতে সুরাপানে আসক্ত হন। তিনি বহুগণ সহ সুরাপানে কিরূপ প্রমত্ত হইতেন, তাহার অনেক বর্ণনা তদীয় স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াও যেরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, সুরাপানসভার বর্ণনাতেও তাঁহার তদনুরূপ আনন্দ ছিল। কিন্তু কার্যকাল সমাগত হইলে তিনি সর্বদাই আত্মসংযমে সমর্থ হইতেন। তিনি সুরামত্ত হইয়া কখনও কোন কার্য পণ্ড করেন নাই। তিনি যে ভাবে এই বহুমূল অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মানসিক বলের পরিচায়ক। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাবর রাণসুয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার শত্রু প্রবল শত্রুর সহিত তিনি আর কখনও আপন শক্তির পরীক্ষা করেন নাই। সুরাপান এসলামশাস্ত্রবিরুদ্ধ, এই যুদ্ধের প্রাকালে তাঁহার মনে সহসা উদ্ভিত হয় যে, এসলাম শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারী মোসলমানের প্রতি কখনও রণদেবতা প্রসন্ন হইতে পারেন না। রণদেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ মদ্যপান

পরিভ্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পান-পাত্রসমূহ ধও ধও করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন ; তাহার পর সুরাভাণ্ডসমূহ যুদ্ধিকায় নিক্ষেপ করিয়া কথায় দাতব্যগৃহ নির্মাণ করেন। বাবর এই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য সমস্ত মোসলমান প্রজাকে তম্বা (Stamp tax) হইতে মুক্তি প্রদান করেন। বাবর লিখিয়াছেন, তিনি মন পবিত্র করিবার জন্য সুরাপান পরিভ্যাগ করিয়াছিলেন।



হুমায়ূন ও শের শাহ ।



১

মোগলকুলতিলক বাবর পরলোকগমন করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নাশের উদ্দীন মোহাম্মদ হুমায়ূন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে হুমায়ূনের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল ; তিনি ফলিত জ্যোতিষের আলোচনার অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি রাজদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার জন্য সাতটি কক্ষ সুসজ্জিত করিয়া সপ্ত গ্রহের নামানুসারে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই সকল কক্ষের গৃহসজ্জা, চিত্রাবলী ও ভূত্যাগণের পরিচ্ছদ অধিষ্ঠাতা গ্রহগণের চিহ্ন (emblem) দ্বারা বিশেষিত ছিল। যে দিন যে গ্রহের প্রভাব বিद्यমান থাকিত, সেদিন সেই গ্রহের নামানুসারে কল্পিত কক্ষে হুমায়ূন দরবার করিতেন। রাজদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহার বে শুণের প্রাধান্য থাকিত, তাঁহাকে তদ্রূপগুণবিশিষ্ট গ্রহের নামে কথিত কক্ষে উপস্থিত হইতে হইত। কবি, পরিব্রাজক ও বিদেশীয় রাজদূত সোম-কক্ষে, বিচারক, শাস্ত্রবেত্তা ও কার্য্যাধ্যক্ষ বৃদ্ধকক্ষে, এবং সৈনিক পুরুষ বৃহস্পতিকক্ষে রাজদর্শন লাভ করিতেন। (১)

হুমায়ূন রাজকার্য্যনির্বাহের জন্য চতুর্ভূতের নামানুসারে চারিটি বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—আতসী, হাওয়াই, আবি ও থাকি। এই বিভাগ চতুষ্টয়ের কার্য্যসম্পাদনের জন্য চারি জন মন্ত্রী নিযুক্ত

(১) বৃহস্পতি নামক গ্রহের পাশ্চাত্য নাম Mars. পাশ্চাত্য পুরাণশাস্ত্রে (mythology) mars রণ-দেবতা বলিয়া বর্ণিত।

ছিলেন । যে সকল দ্রব্য (যথা, নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র ও যন্ত্র প্রভৃতি) প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্নির আবশ্যক হইত, তাহার নির্মাণকার্য আতঙ্গী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল । পরিচ্ছদগৃহ, পাকশালা ও আন্তাবল প্রভৃতি হাওরাই বিভাগের অধীন ছিল । সরবতখানা, সূজিখানা ও খাল (canal) প্রভৃতির কার্য আবি বিভাগের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইত । কৃষি, পুষ্ঠ, খালসা ভূমি ও কোন কোন গৃহকার্যের জন্য থাকি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল ।

অথও শান্তির সময়েই এইরূপ নির্দোষ আমোদের উপভোগ সম্ভবপর । হুমায়ুন দীর্ঘকাল এইরূপ নির্দোষ খেয়াল লইয়া অতিবাহিত করিতে পারেন নাই । নানাবিধ গুরুতর রাজকার্যে বিভ্রত হইয়া তাঁহাকে এ সব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল ।

বাবরের আর তিন পুত্র ছিল ; কামরান, হিন্দাল ও মিরজা আকরী । তিনি যত্নাকালে একমাত্র হুমায়ুনকেই দিল্লীর সাম্রাজ্যভার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন । সুতরাং অপর রাজকুমারগণের রাজসিংহাসনে কোনও দাবী ছিল না । কিন্তু কামরান রাজ্যলালসা দমন করিতে না পারিয়া পঞ্জাবের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন । তিনি বীরপ্রসূ সুদৃঢ় আফগানভূমির শাসনকর্তা ছিলেন । তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে তথায় কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন । পক্ষান্তরে, হুমায়ুন নব-বিজিত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন । সুতরাং সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা কামরানের অধিক সুবিধা ছিল । হুমায়ুন এই সকল বিবেচনা করিয়া কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশ কামরানকে প্রদানপূর্বক তাঁহার উচ্চাশা চরিতার্থ করিলেন । কাবুল রাজ্যকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা সমীচীন হইয়াছিল না । অনুরক্ত কাবুলী সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত নববিজিত দেশরক্ষা হুঃসাধ্য ছিল । হুমায়ুনের রাজত্বের প্রারম্ভ-

কালে হিন্দুস্থানের মোগল সৈন্য অমরকু কাবুলী যোদ্ধাদের দ্বারাই গঠিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সকল যোদ্ধার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করার কুফল দেখা যায়, এবং বাদশাহ অমরকু সৈন্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হন। কামরানকে পরিতৃপ্ত করিয়া বাদশাহ অস্ত্রবিদ্রোহের আশঙ্কায় হিন্দালকে সম্বলের ও মিরজা আকবরীকে মেওয়াতের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

কিন্তু হুমায়ুন অস্ত্রবিপ্লবনিবারণের জন্য এত করিয়াও নিরাপদ হইতে পারিলেন না। সিংহাসনারোহণের অল্প দিন পরেই বাদশাহের জনৈক অস্ত্ররক্ষা তাঁহার প্রাণবিনাশ ও সাম্রাজ্য অপহরণ করিবার কল্পনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই ছুরাকাঙ্ক্ষের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া গুজরাটের স্বাধীন মোসলমান অধিপতি বাহাদুর শাহের শরণাপন্ন হইলেন। হুমায়ুন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বাহাদুর শাহকে অনুরোধ করিলেন। বাহাদুর শাহ আশ্রিত ব্যক্তিকে শত্রুহন্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে উভয়ের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল।

ইহার পর দিল্লীর আফগানবংশীয় শেব নরপতি এব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলাউদ্দীন বাহাদুর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাহাদুর শাহের পূর্বপুরুষগণ লোদীবংশের রাজত্বকালেই উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি আলাউদ্দীনের উত্তেজনায় হুমায়ুনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। আলাউদ্দীন তাঁহার অর্থসাহায্যে বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পুত্র তাতার খাঁকে সৈন্যপত্যে বরণ পূর্বক হুমায়ুনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ শত্রুসৈন্য অনায়াসে পরাজিত করিলেন ; সেনাপতি তাতার খাঁ শত্রুহন্তে নিহত হইলেন।

অতঃপর হুমায়ূন বাদশাহ এই শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্তে যাত্রা করিলেন । (১) বাহাদুর শাহ মন্দির নামক স্থানে গড়বন্দী শিবির সংস্থাপন করিয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বাদশাহ অর্ধ বৎসর কাল তাঁহার শিবির অবরোধ করিয়া রহিলেন । অবশেষে তিনি শত্রুশিবিরে রসদপ্রেরণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন । এই উপায় অবলম্বনের পর অচিরে বাহাদুর শাহের সৈন্যমধ্যে খাদ্যভাব উপস্থিত হইল । বাহাদুর শাহ বীরপুরুষের স্ত্রী আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া ভয়বাকুল ও নিরাশ হইয়া পড়িলেন । তাঁহার অবস্থা ক্রমে এতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িল যে, তিনি একদা রাত্রিযোগে পাঁচ জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন । বাহাদুর শাহের পলায়নবার্তা প্রচারিত হইবামাত্র আপামর সাধারণ সকলেই প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ।

হুমায়ূন বাদশাহ প্রাতঃকালে এই সংবাদ অবগত হইয়া বাহাদুর শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না । তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া গুজরাট রাজ্য অধিকার করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন । হুমায়ূন অচিরে সমতলভূমি অধিকার করিয়া পার্শ্বভূমি প্রদেশ হস্তগত করিবার কল্পনায় চাম্পানার দুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তিনি একদা রাত্রিকালে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিবার জন্য অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন । এই সৈন্যদল দুর্গদ্বার আক্রমণ করিলে দুর্গরক্ষক সসৈন্তে তথায় উপনীত হইলেন । অন্য দিকে বাদশাহ কেবলমাত্র তিন শত সৈন্য লইয়া লৌহকীলকের সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন

(১) গুজরাটযাত্রার পূর্বে তিনি জৌনপুরাধিপতি শুলতান মাহমুদকে সমুদ্রে ভিক্ষা এবং চুগার দুর্গাধিপতি শেরকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করেন ; তদ্বিবরণ পরে বিবৃত হইবে ।

করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াও সহজে দুর্গজয় করিতে পারিলেন না। দুর্গরক্ষক শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং বীরত্বের পদাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আত্মসমর্পণকালেও শত্রুকে সুবিধাজনক সঙ্কে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। ফলতঃ, হুমায়ুন তুমুল যুদ্ধের পর বহুকষ্টে দুর্গজয় করিতে সমর্থ হইলেন। চাম্পানের দুর্গের দুর্ভেদ্য অবস্থান, শত্রু-সৈন্যের সংখ্যাধিক্য ও বাদশাহের অসমসাহসিকতার বিষয় চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, তিনি এই দুর্গবিজয় সম্পন্ন করিয়া তদানীন্তন বীরেন্দ্র-সমাজে অতি শ্রেষ্ঠদান অধিকার করিয়াছিলেন।

দুর্গাভ্যন্তরে প্রচুর ধনরত্ন প্রোথিত ছিল। কোন্ স্থানে এই প্রচুর ধনরাশি নিহিত ছিল, তাহা কেবল বাহাদুর শাহের একজন কর্মচারী অবগত ছিলেন। মোগল রাজপুরুষগণ ধনরাশি কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে যজ্ঞা দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বাদশাহ তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে সদ্যবহারে বশীভূত করিবার আদেশ দিলেন। তিনি মোগলের সদ্যবহারে একান্ত প্রীত হইলেন, এবং রাত্রিকালে তাঁহাদের কোশলে সুরাপানে উদ্ভাস্ত হইয়া গুপ্ত ধনের তথ্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। হুমায়ুন নির্দিষ্ট স্থানে অসংখ্য ধন রত্ন প্রাপ্ত হইলেন, এবং প্রত্যেক সৈনিকপুরুষকে এক এক টাল পরিমিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন।

হুমায়ুন গুজরাট-বিজয় সম্পন্ন করিয়া তথায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারিলেন না। রাজধানীতে শাসনযন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়াতে তিনি ভাতা মিরজা আকরীর হস্তে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গুজরাট পরিত্যাগ করিলে

মোগল রাজপুরুষগণ আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন । ইহাতে তাঁহারা ক্রমশঃ এতদূর হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন যে, বাহাদুর শাহ অচিরে বিনা যুদ্ধে পুনর্বার গুজরাট রাজ্য অধিকার করিলেন ।

হুমায়ুন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন,—বিহারের শাসনকর্তা আফগানবংশোদ্ভব শের খাঁ নবোদিত সূর্যের ত্রাদ্র ক্রমশঃ সমুজ্জ্বল হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ।

২

শের অধ্যবসায়ের অবতারণা । তাঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ । তিনি একটি ব্যাঘ্র স্বহস্তে বধ করিয়া শের উপাধি প্রাপ্ত হন । শেরের পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস আফগানভূমির অন্তর্গত রো নামক পার্শ্বত্যা প্রদেশে ছিল । তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ শূরবংশোদ্ভব বলিয়া সর্বসাধারণের নিকট একান্ত গৌরবভাজন ছিলেন । শেরের পিতামহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যপরীক্ষার জন্তু দিল্লীতে আগমন করেন । শের খাঁর পিতা হোসেন স্বীয় ক্ষমতাবলে সাসেরাম ও তাণ্ডার জায়গীর প্রাপ্ত হন ।

বীর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই সিংহশাবকের সহিত বল পরীক্ষা করিয়া থাকে । কখনো শেরও শৈশবকালেই আপনার কন্মোজ্জ্বল জীবনের পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছিলেন । শিশু শের একদা পিতার প্রভুর অধীনে কর্মপ্রার্থী হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন । তাদৃশ অল্পবয়স্ক বালক কখনও রাজকার্য্যের উপযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া হোসেন তাঁহাকে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্বক কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিতে বলেন । শের খাঁ পিতার নিষেধবাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া মাতার নিকট মনো-ভিলাষ প্রকাশ করেন । এবং তাঁহার নির্বন্ধাতিশয্যে হোসেন পুত্রকে কর্মে নিয়োজিত করিবার জন্তু স্বীয় প্রভুর নিকট লইয়া যান । তদৌন !

প্রভু শিশুর এই ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে একখানি গ্রাম পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হন । ইহাতে শিশু শেরের আনন্দের পরিসীমা ছিল না ।

হোসেন একাধিক রমণীতে অধুরক্ত ছিলেন ; সুতরাং একমাত্র বিবাহিতা পত্নী শেরের মাতার সঙ্গে তাঁহার তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না । এ ছদ্ম তিনি তাঁহার গর্ভজ সন্তানদিগকে সম্বন্ধে লালনপালন করিতেন না । শের পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া অভিমানভরে মাসেরাম পরিত্যাগ করিয়া জোনপুরে গমন করেন । পিতা পুত্রকে পুনর্ব্বার গৃহে আনয়ন করিবার জন্য জোনপুরের শাসনকর্তার নিকট পত্র প্রেরণ করেন । তদনুসারে শাসনকর্তা তাঁহাকে গৃহে প্রতিগমন করিতে অধুরোধ করিলে তিনি বলেন, “যদি আমার জ্ঞানভূকানিবারণের জন্যই পিতা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি এখানেই বিদ্যাশিক্ষা করিব । জোনপুর বিদ্যাজনপূর্ণ ।” এই সময় জোনপুরে জামাল খাঁ শাসনকর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি এক জন উদারহৃদয় বিদ্যোৎসাহী শাসনকর্তা বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন । শের খাঁ অচিরে তাঁহার প্রসাদ-ভাজন লইয়া সৈন্তশ্রেণীতে প্রবেশলাভ করেন । এই স্থানে তিনি প্রবল উৎসাহে জ্ঞানোপার্জনে নিরত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণ ও কাব্য প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন । (১) দানশীল জামালের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া তিনি অধিকাংশ সময়ই কাব্য,

(১) “He also studied thoroughly the *Kafia* (a work on grammar) * * *. He had got by heart the *Sikandarnama*, the *Gulistan*, and *Bostan*, &c. and was also reading the works of Philosophers.” *Tarikh-i SherShahi*.

ইতিহাস ও মহৎ জীবনের আখ্যায়িকার আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন । (১)

এই ভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে শেরের বশঃপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া পড়ে । জোনপুর হইতে প্রত্যাগত আত্মীয় স্বজনের মুখে পুত্রের অনন্য সাধারণ গুণরাশির বিষয় অবগত হইয়া হোসেন তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিবার জন্ত লালায়িত হইয়া উঠেন । তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পর পিতা পুত্রে পুনর্মিলন হইয়াছিল ।

শের খাঁ গৃহে প্রত্যাগত হইলে হোসেন তাঁহার হস্তে জায়গীরের শাসনভার অর্পণ করেন । তিনি শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া বলেন, “ভ্রাতৃ-বিচারই রাজ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় ; নির্দোষ দুর্বলের পীড়ন ও অত্যাচারী সবলের সমর্থন করিয়া আমি কখনও ভ্রাতৃপথভ্রষ্ট হইব না ।” এখানেই তাঁহার অসাধারণ শাসনশক্তি ও কার্যতৎপরতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে । তিনি পৈতৃক জায়গীরের অভিনব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ; তাঁহার এই কঙ্কালসদৃশ বন্দোবস্তের আদর্শেই আকবরের তাদৃশ সফলপ্রদ রাজস্বনীতি গঠিত হইয়াছিল । শেরখাঁ তহশীলদার, পাটওয়ারী (accountant) ও সৌকদারবর্গকে আহ্বান করিয়া

(১) উত্তরকালে শের খাঁ একদা বাল্যকাহিনী বর্ণনা করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভে আকস্মিকতার জন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতেন ; শিকার উপলক্ষে প্রত্যহ পনর ফোশ পদব্রজে ভ্রমণ তাঁহার অভ্যাস ছিল । একদা এইরূপ ভ্রমণকালে তিনি দগ্ধহস্তে পতিত হইয়া সংসর্গদোষে লুণ্ঠন-ব্যবসারে লিপ্ত হন । তিনি এক দিন সদলে নৌকায় উপবিষ্ট ছিলেন ; এমন সময় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জনপথে পতিত হন, এবং তিন ফোশ সম্ভরণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন । ইহার পর তিনি দৃষ্টান্ত পরিচয় করেন । তারিখ-ই-নাউদী নামক গ্রন্থে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । শ্রীযুক্ত ডোমন এই বর্ণনায় আত্মস্থাপন করিতে পারেন নাই । তিনি বলেন যে, যোগনের আশ্রিত প্রত্যেক ইতিহাসবেত্তাই শেরের নান্যজীবন লুণ্ঠনানুরক্ত ছিল বলিয়া বর্ণনা করিতে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন ।

ভূমির ষপার্থ পরিমাপ দ্বারা রাজস্বনির্ধারণ পূর্বক প্রজার অভিপ্রায়মত নগদ অর্থ অথবা শস্য গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “আমি রাজস্ব নির্ধারণ করিবার সময় প্রজার হিতপক্ষে যত্নশীল হইব, কিন্তু তাহার পর কঠোর হস্তে রাজস্ব সংগ্রহ করিব। তোমরা রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিলে আমি তোমাদের নালিশ গ্রহণ করিব। কেহ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। কৃষককুলের সম্ভ্রাববিধান করিতে পারিলেই কৃষিকার্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া দেশ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া থাকে।” বস্তুতঃ শের কার্যভার গ্রহণ পূর্বক তাম্রানুগত হইয়াই শাসনসংরক্ষণ কার্যে নিরত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে অত্যাচারী জমিদারবর্গের বিদগ্ধ ভগ্ন হইয়াছিল; দুর্বল কৃষকশ্রেণী নিরুপদ্রবে বাস করিত। তরুণবয়স্ক শের অসাধারণ কষ্ট ও পরিশ্রমে কৃষিকার্যের উৎকর্ষসাধন এবং নিয়মিতরূপে রাজস্বসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রত্যেক বিষয়েই কার্যপটুতা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন; তাঁহার যশঃপ্রভা অচিরে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু শেরের সৌভাগ্যোদয়ে হোসেনের প্রিয়তমা উপ-পত্নীর হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হয়। তদীয় গর্ভজাত পুত্রগণের হস্তে শাসনভার প্রদান করিবার জন্ত হোসেন খাঁ নানাভাবে পুনঃ পুনঃ উদ্ভেদিত হন। অবশেষে তিনি তাহার বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া শেরখাঁকে শাসনকার্য্য হইতে অপমৃত করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি পিতৃসঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া বিনা আপত্তিতে শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া আগ্রাতে গমন করেন।

শের খাঁ আগ্রাতে গমন করিবার কিয়দ্বিঘ্ন পরেই পিতার মৃত্যু-সংবাদ বিদিত হন, এবং তদানীন্তন সম্রাটের নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তির ফারমাণ গ্রহণ করিয়া শেরারামে প্রতিগমন করেন। এখানে

উপনীত হইলে হোসেনের প্রিয়তমা উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয় ।

ভাত্‌বিরোধ মীমাংসিত হইবার পূর্বেই সমগ্র হিন্দুস্থান রাজবিপ্লবে আলোড়িত হইয়াছিল । মোগলকুলতিলক বাবর সসৈন্তে ভারতবর্ষে উপনীত হন । পাণিপথের বিশাল ক্ষেত্রে মোগল আফগানের তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয় । সুলতান এব্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপরি-ভাগ করেন, এবং দিল্লীর হুর্গে মোগলের রাজপতাকা উড্ডীন হয় । এই রাজবিপ্লবের সুযোগে শের একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন । তিনি আপন ভাগ্যপরীক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত ক্ষেত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া বিহারাধিপতির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন । এই সময় সুলতান মাহমুদ স্বাধীনভাবে বিহারের শাসন-কার্যে নিরত ছিলেন । শের অসাধারণ কার্যপটুতা ও প্রতিভা বলে ক্রমশঃ তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন ; এমন কি, তিনি রাজ-কুমার জালালের শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত হন । কিন্তু সুল-তানের শুভদৃষ্টি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই । তিনি কোন কারণে শেরের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন ।

বিপদ কখনও একাকী আইসে না । এই সময় শেরের গৃহকলহও প্রবলাকার ধারণ করে । তাঁহার জ্ঞাতিশত্রু মোহাম্মদ বৈমাত্রেয় ভাত্‌-বর্গের সঙ্গে ষোগ দিয়া তাঁহাকে পৈতৃক জায়গীর হইতে দূরীভূত করি-বার জন্য যত্নবীল হন । কিন্তু শের বাহুবলে গৃহকলহ প্রশমিত করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন । গৃহকলহ প্রশমিত হইলে তিনি আত্মোন্নতিসাধনের জন্য আগ্রায় গমন করেন, এবং অচিরে পাদ-শাহ বাবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন ।

ইহার কিয়দ্বিবস পরে পাদশাহ চিন্দির বিরুদ্ধে অভিযান করিলে

শেরও তাঁহার সম্ভিবিাহারে গমন করেন । এই সুযোগে তিনি সাম্রাজ্যের শাসনসংরক্ষণ সম্বন্ধীয় বাবতীর রহস্য অবগত হন, এবং রাজ্যলালসা তাঁহার হৃদয় অধিকার করে । একদিন তিনি তদীয় জনৈক অস্তুরঙ্গ বন্ধুর নিকট মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলেন, “মোগলদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সহজ-সাধ্য । পাদশাহ নিজে একজন রাজনীতিবিদ্যার বিচক্ষণ শাসনকর্তা ; কিন্তু তিনি নবাগত বলিয়া ভারতবর্ষের শাসননীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ । প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন ; তিনি নিজের স্বার্থসংসাধনার্থ রাজ্যের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না । অতএব আমরা গৃহকলহ বিমুক্ত হইয়া ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিলেই রাজলক্ষ্মী মোগলকে পরিত্যাগ করিয়া আফগানের অঙ্কশায়িনী হইবেন । এ কার্য এক্ষণে যতই স্বপ্নবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলে আমি সফলকাম হইতে পারিব ।” কোন ঘটনাসূত্রে বাবর তাঁহার মনোভিলাষ অবগত হওয়াতে তিনি পলায়ন করিয়া পৈতৃক জায়গীরে উপনীত হন । (১)

শের খাঁ মোগল-শিবির পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার বিহারে উপনীত হইলে সুলতান মাহমুদ তাঁহাকে আবার সাদরে গ্রহণ করেন । ইহার

(১) যে সূত্রে শের খাঁ জানিতে পারেন যে, বাবর তাঁহার মনোভিলাষ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা কোতূকাবহ । একদা পাদশাহের সঙ্গে একত্র আহারকালে শেরখাঁকে মাংস প্রভৃতি কঠিন ভোজ্য দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু তাঁহার নিকট কেবল চামচ ছিল । এক্ষণে তিনি ভৃত্যদিগকে ছুরি দিতে আদেশ করিলে তাহার বাবরের ইঙ্গিতে ছুরি দিল না । শেরখাঁ ইহাতে অপ্রতিভ না হইয়া নিজের ছোরা কোবোগুরু করিয়া মাংস কর্তন করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ তাঁহার এই বিসদৃশ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছিলেন । কিন্তু তিনি সেদিকে ক্রক্ষেপও করিলেন না । তাঁহার আহার শেষ হইলে বাবর বলিয়াছিলেন,—“এই যুবক কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না, এবং কালে এক জন বড় লোক হইবে ।”

অব্যবহিত পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন, এবং তদীয় অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র জালাল খাঁ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । রাজমাতা সুলতানা দাছ প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শেরকে অধিকাংশ কার্যভার সমর্পণ করেন । সুলতানা দাছ ইহার অত্যন্ত কাল পরেই প্রাণপরি-ত্যাগ করেন, এবং শের খাঁ বিহার রাজ্যের সর্ব্বেসর্বা হইয়া উঠেন ।

এই সময় সুলতান মোহাম্মদ বঙ্গ সিংহানের অধিপতি ছিলেন । বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হাঙ্গিপুরের শাসনকর্ত্তা মকছুম আলম বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়া শের খাঁর সঙ্গে সৌহৃদ্যস্থত্রে আবদ্ধ হন । এজন্য সুলতান মোহাম্মদ বিহার জয় ও মকছুম আলমকে বিনাশ করিতে সেনাপতি কুতুবকে নিযুক্ত করেন । বঙ্গসৈন্তের সঙ্গে তুলনার শের খাঁর সৈন্ত-সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল বলিয়া তিনি সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্য বদ্ধ-শীল হন ; কিন্তু তাহাতে সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন না । শের সন্ধিসংস্থাপন করিতে অকৃতকার্য হইয়া আপন নগণ্য সৈন্তের সাহায্যেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে মনন করেন । সমরক্ষেত্রে তাঁহার অপূর্ব রণ-কৌশল ও বীরত্ব পুরস্কৃত হয় ; তিনি জয়মালা বিভূষিত হন ; এবং সেনাপতি কুতুব শত্রুহস্তে প্রাণপরিত্যাগ করেন । লোহানী-বংশজাত কতিপয় সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে শেরের সহকারী ছিলেন । কিন্তু তিনি লুণ্ঠিত ধনরাশির অংশ তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া নিজেই সমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক ধনশালী হইয়া উঠেন ।

বিহারাধিপতি জালাল খাঁর লোহানী আত্মীয়স্বজনগণ শের খাঁর সৌভাগ্যসন্দর্শনে পূর্ব্ব হইতেই ঈর্ষান্বিত ছিলেন ; এজন্য লুণ্ঠিত ধন-রাশির অংশলাভ করিতে না পারিয়া ঈর্ষ্যাবিষে আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠেন, এবং তাঁহার অনিষ্টসাধনের জন্য যত্নশীল হন । প্রথমতঃ তাঁহারা শের খাঁর প্রাণসংহার করিবার অভিপ্রায়ে যড়যন্ত্রে লিপ্ত হন । ঘটনাক্রমে

তাহাদের বড়মন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে । ইহাতে শের খাঁ বুঝিতে পারেন যে, আপন ক্ষমতা অপ্রতিহত না রাখিলে অন্য কোন উপায়ে নিরাপদ হইতে পারিবেন না । একজন্ত তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপন ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া বিপক্ষকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলেন । জালাল খাঁ পূর্ব হইতেই গোপনে শের খাঁর বিপক্ষ দলের সঙ্গে সম্মিলিত ছিলেন । সুতরাং তিনি শেরের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে বঙ্গ দেশের সুলতান মোহাম্মদের শরণাপন্ন হন । শের অনায়াসে বিহার রাজ্য গ্রাস করেন ।

জালাল খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুলতান মোহাম্মদ শেরকে বিনাশ করিবার জন্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন । শের খাঁ দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হন । শত্রুসৈন্য দুর্গাবরোধ করিলে শের খাঁ সাহস ও কৌশলের একশেষ প্রদর্শন করেন । তাহার কৌশলে ও বীরত্বে বঙ্গসৈন্য পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে । ইহার পর তিনি চূণার দুর্গ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন, এবং সমগ্র বিহারে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য সংস্থাপিত হয় ।

এই সময় জৌনপুরাধিপতি সুলতান মাহমুদ বাবরের পুত্র হুমায়ুন পাদশাহের হস্তে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয় নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্বক বিপুল সৈন্য সহ বিহারে উপনীত হন । শের খাঁর জৌনপুরী সৈন্যপ্রবাহের গতি রুদ্ধ করিবার সামর্থ্য ছিল না । সুতরাং তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহার সঙ্গে সসৈন্যে মিলিত হন । সুলতান মাহমুদ শের খাঁর ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিয়া জৌনপুর পুনর্ব্বার অধিকৃত হইবার পর বিহার প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাকে ফারমান প্রদান করেন । সুলতান সসৈন্যে জৌনপুরে উপ-

নীত হইলে মোগল সৈন্য তথা হইতে পলায়ন করে । তিনি জৌনপুরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মোগলাধিকৃত লক্ষ্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশ বিধ্বস্ত ও স্বাধিকারভুক্ত করেন । হুমায়ূন এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন । শের খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় মাহমুদ পরাজিত হন ; তাঁহার সমস্ত শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়, পুনরুত্থানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে ।

অতঃপর শের শাহ পুনর্বার বিহারে আধিপত্যসংস্থাপন করেন । হুমায়ূন চূণার দুর্গের অধিকার করিবার কল্পনায় বিহার প্রদেশে উপনীত হন । শের খাঁ তাঁহার অধীনে দুর্গশাসন করিতে স্বীকৃত হওয়াতে এবং গুজরাট যুদ্ধের জন্তই সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করা আবশ্যক হইয়া পড়াতে, পাদশাহ চূণার পরিত্যাগ করেন । (১)

এই অবসরে শের খাঁ শক্তিসঞ্চয়ে নিবিষ্টচিত্ত হন । মোগলের শাসনে যে সকল আফগান বোকা ফকিরী গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা শেরের আহ্বানে নবোৎসাহে পুনর্বার অসি-ধারণ করে । কোন আফগান সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইতে অস্বীকৃত হইলে তিনি তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবেন বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন । আফগান বোকা যাহাতে অনর্থক নিহত না হয়, তৎপক্ষে তাঁহার প্রথম দৃষ্টি ছিল । এইরূপ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি সম্মিলিত আফগান শক্তি সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হন । তিনি আফগান সেনার সাহায্যার্থ যুক্তহস্ত ছিলেন । এই সংবাদ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে দলে দলে আফগান সৈন্ত চতুর্দিক হইতে তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হয় । সম্মিলিত আফগান শক্তির গঠন করিয়া তিনি বঙ্গদেশ স্বাধিকার-ভুক্ত করিবার মনন করেন ।

এদিকে হুমায়ুন পাদশাহ গুজরাট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শেরকে প্রতাপশালী ও সাম্রাজ্যলোলুপ দেখিয়া তাঁহাকে অকুরেই বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । তিনি বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে শেরখাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । শেরখাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া সাতিশয় বিজ্ঞতা-সহকারে হুমায়ুনকে পরাস্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন । শেরখাঁ দেখিলেন যে, বঙ্গবিজয় সম্পন্ন করিতে পারিলে তাঁহার সামরিক বল শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তখন সহজেই তিনি মোগলকে বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন । এজন্য তিনি প্রথমতঃ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া শক্তিসঞ্চয় করাই কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন । বঙ্গবিজয়ে ব্যাপৃত থাকি কালে মোগল সৈন্যকে বিহারের প্রান্তভাগে আটক রাখিবার জন্য শেরখাঁ চুণার দুর্গে পরাক্রমশালী সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিলেন ।

অতঃপর শেরশাহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন । আফগান সৈন্য বঙ্গদেশে উপনীত হইলে মোহাম্মদ শাহ রাজারক্ষার জন্য প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পরাক্রান্ত শত্রুর গতিরোধ করিতে পারিলেন না ; তিনি গতান্তর না দেখিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শের খাঁ গোড় নগরের অবরোধ করিলেন । কিন্তু গোড় নগর অধিকৃত হইবার পূর্বেই বিহারের জনৈক জমিদার বিদ্রোহ অবলম্বন করাতে তিনি স্বীয় পুত্র জালাল খাঁকে বঙ্গদেশে রাখিয়া বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলেন । মোহাম্মদ শাহ জালাল খাঁর হস্তে বারংবার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন । ইহার পর শের খাঁ বিহারে শৃঙ্খলাস্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন, এবং অতি সহজে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন ।

শের খাঁ বঙ্গদেশ অধিকার ও বিহারের বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত

ছিলেন । এই অবসরে হুমায়ুন পাদশাহ বিহারের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া চুণার দুর্গ আক্রমণ করেন । দুর্গরক্ষক রুমি বিপুলবিক্রমে দুর্গ-রক্ষা করিয়াছিলেন । অন্ধবৎসরব্যাপী অবরোধের পর রুমি খাঁ শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ করেন । হুমায়ুন চুণার দুর্গ হস্তগত করিয়া বঙ্গদেশা-ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । বঙ্গাধিপতি মোহাম্মদ শাহ শের খাঁ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পাটনার নিকটবর্তী স্থানে হুমায়ুন পাদশাহের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বীয় দুর্দশার কাহিনী বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন । পাদশাহ তাঁহার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন ও ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন । শের খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া জালাল খাঁকে পাদশাহের গতিরোধের জন্য প্রেরণ করিলেন । কিন্তু তিনি তাঁহার গতিরোধ করিতে না পারিয়া সৈন্তে পলায়ন করিলেন । হুমায়ুন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । মোহাম্মদ শাহ ও মোগল সেনার সহযাত্রী ছিলেন । মোগল সেনা কাহালগাঁও নামক স্থানে উপনীত হইলে, তিনি শত্রুহস্তে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের নিহত হইবার সংবাদ অবগত হইলেন । গোড়দুর্গের অবরোধকালে জালাল খাঁ এই পুত্রদ্বয়কে বন্দী করিয়াছিলেন । মোহাম্মদ শাহ পুত্রশোক্রে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন ।

শের স্বীয় সৈন্তের পরাজয়বার্তা অবগত হইয়া পূর্ববর্তী নরপতিগণ কর্তৃক সঞ্চিত ধনরাশি সহ গোড়নগর পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক জায়গীর শেয়ারামে প্রস্থান করিলেন । হুমায়ুন পাদশাহ অনায়াসে গোড়নগর অধিকার করিয়া স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিলেন ।

হুমায়ুন পাদশাহ বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়া বিলাসে রত হই-লেন । কিন্তু অপর পক্ষে শের খাঁ পিতৃজায়গীরে উপনীত হইয়া হুমা-য়ুনকে বিনাশ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । তিনি

প্রথমতঃ রোটাস দুর্গ হস্তগত করিয়া পরিবারবর্গের নিরাপদ অবস্থানের উপায়বিধান করিতে মনন করিলেন। এই সময় রাজা বীরকেশ স্বাধীনভাবে রোটাস দুর্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। শের খাঁ বীরকেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যহুত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শের খাঁ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি পুনর্বার বঙ্গদেশ অধিকার করিবার জন্ত গমন করিতেছি। আমার পরিবারবর্গ ধনরাশি সহ আপনার দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থানপ্রাপ্ত হইলে আমি নিশ্চিতচিত্তে অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত প্রবৃত্ত হইতে পারি।” রাজা বীরকেশ বন্ধুর অগাধ ধনরাশি হস্তগত করিবার অতি প্রায়েই হউক, অথবা তাঁহার উপকারসাধন করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। শের খাঁ পরিবারস্থ মহিলাদিগকে ডুলির দ্বারা ও ধনরাশি ভারসংযোগে দুর্গে লইয়া যাইবার ব্যপদেশে তথায় সৈন্য ও বুদ্ধোপকরণের সমাবেশ করিয়া অকস্মাৎ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। (১) দুর্গবাসিগণ এই আকস্মিক আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। অতি সহজে পৃথিবীর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ শের খাঁর হস্তগত হইল। দুর্গমধ্যে বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি প্রোথিত ছিল; শের খাঁ তৎসমুদয় লাভ করিলেন। এই প্রতারণামূলক কোশল শের খাঁর নিজের উদ্ভাবিত নহে; ইহার পূর্বেও খান্দে-শের শাসনকর্তা আদেব দুর্গ এই ভাবে হস্তগত করিয়াছিলেন। রোটাস দুর্গবিজয় সম্পন্ন করিয়া শের খাঁ পরিবারবর্গের জন্ত নিরাপদ স্থানের

(১) তারিখ-ই-শেরশাহীর রচয়িতা এই বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ডুলির বিবরণ অমূলক বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তারিখ-ই-বানজাহান, আকবরনামা ও ফেরিস্তাতে ডুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তারিখ-ই-শেরশাহী গ্রন্থে হুমায়ুন কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার পূর্বে শের খাঁ রোটাস দুর্গ অধিকার করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমরা আকবরনামা ও ফেরিস্তার অনুসরণ করিলাম।

সংস্থান করিতে সমর্থ হইলেন । এই ঘটনার তাঁহার বন্ধুগণও প্রোৎসাহিত হইয়া একে একে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিলেন । এই ভাবে তিনি পুনর্বার সামরিকবললাভ করিয়া হুমায়ূনকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ।

বর্ষাকাল সমাগত হইলে মোগলসৈন্য বঙ্গদেশের জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল । তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক অশ্ব ও উষ্ট্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল । এই দুর্দশার সময় পাদশাহ অবগত হইলেন যে শাহজাদা হিন্দাল কলহপ্রিয় আমাত্যগণের পরামর্শে বিদ্রোহী হইয়া প্রভুত্ব রাজপুরুষদিগকে হত্যা করিয়া স্বনামে খোতবা প্রচারিত করিয়াছেন, এবং কামরান সৈন্যে আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন । তিনি ভ্রাতৃগণের বিদ্রোহের সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুল হইলেন, এবং জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাঙ্গলার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

শের শাঁ দেখিতে পাইলেন যে, মোগলসৈন্য অনবরত রোগভোগ করিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, এবং পাদশাহ নিজেও হিন্দালের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য রাজধানীতে প্রতিগমন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন । ইহাই উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া তিনি হুমায়ূনের গতিরোধ করিবার জন্য রোটাস দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন ।

শের চৌদা নামক স্থানে উপনীত হইয়া মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিলেন । তাহার তথায় তিন মাস কাল প্রতীক্ষা করিল । অবশেষে শের সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন । হুমায়ূন আগ্রা গমনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন বলিয়া তাহাতে স্মীকৃত হইলেন । শের কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সম্রাটের নামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত রাখিয়া কেবল মাত্র বঙ্গদেশ ও বিহার শাসন করিবেন, মোগলের

অধিকৃত কোনও স্থান স্বাধিকারভুক্ত করিবেন না । মোগলসৈন্য শেহের অঙ্গীকারবাক্যে আত্মস্থাপন করিয়া অসতর্ক হইলে তিনি তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন । (১) তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবারও অবকাশ পাইল না । হুমায়ুন গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আফগান সেনা তাহার অধিকাংশ হস্তগত করিল । পাদশাহ পাত্রমিত্র সহ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেন । বিংশ সহস্র সৈন্য নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল । পাদশাহ স্বয়ং নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াও অনৈক ভিত্তিওয়ারার সাহায্যে জীবনরক্ষা করিলেন । (২)

(১) এই বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাপারে আত্মসমর্থনের জন্য শের শাহ বলিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহা তারিখ-ই-শেরশাহী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি পাদশাহের নিকট শাস্তিসংস্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি । কিন্তু এ পর্যন্ত আমি তাহার যত উপকার করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্রও ফলোদয় হয় নাই । আমার সাহায্যেই তিনি জোনপুরাধিপতি শুলতান মাহামুদকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হন । কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আমাকে চূণার দুর্গ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য বতুলীল হইয়াছিলেন । গুজরাট যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতেই তিনি অতীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন না । তিনি গুজরাটে গমন করিলে আমি মোগল অধিকারে হস্তক্ষেপ করি নাই । কিন্তু তিনি গুজরাট হইতে প্রতাগত হইয়াই আমার অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কৃতকায্য হইতে পারেন নাই । তিনি বঙ্গদেশে আধিপত্যস্থাপন করিয়াছেন ; তাহার সঙ্গে সদ্ভাবে অবস্থান করিবার আশা নাই দেখিয়াই আমি তাহার প্রতিকূলচরণ করিতেছি । যদি আমি এখন তাহার সহিত শাস্তিস্থাপন করি, তবে তাহা কত কাল অব্যাহত থাকিবে ? উদীয় ভ্রাতৃগণ আগ্রাতে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে এবং মোগলসৈন্য রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্বল হওয়াতেই তিনি আমার সহিত সন্ধিস্থাপনের অন্তিমায়ী হইয়াছেন । কিন্তু আগ্রার বিদ্রোহ দমিত ও উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইলেই তিনি আমাকে সমূলে বিনষ্ট করিতে নিশ্চিতই যত্ন করিবেন ।”

(২) শূহিন বলেন যে, এই ভিত্তিওয়ারা পুরস্কারপ্রার্থী হইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলে হুমায়ুন তাহাকে দ্বার ঘণ্টার (কাহার কাহার মতে দুই ঘণ্টা) জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া পুরস্কৃত করেন । ভিত্তিওয়ারা এই অল্প সময়ের জন্য সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া নিঃসর ও আত্মীয়স্বজনের স্তরণপোষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল ।

অতঃপর হুমায়ূন হতাবশিষ্ট সৈন্য সহ, ভগ্নহৃদয়ে আগ্রার অভিমুখে গমন করিলেন । (১)

৪

শের খাঁ মোগলসৈন্য পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে গমন করিলেন । তিনি তথায় উপনীত হইয়া জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে শিবিরে আহ্বান করিয়া পাত্রমিত্রসহ বধ করিলেন । তদনন্তর তিনি স্বনামে খোতবা ও শিকা, প্রচলিত করিয়া বাঙ্গালা ও বিহার শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শাহ উপাধি ধারণ করিলেন ।

শাহজাদা কামরান মোগলসৈন্যের পরাজয়বর্তী অবগত হইয়া আল-ওয়ার হইতে অগোণে আগ্রাতে উপনীত হইলেন । তিনি দেখিলেন যে, আফগান ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া মোগলসাম্রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে । তিনি হুমায়ূনের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্তু অমৃতপু ও লজ্জিত হইয়া আফগানশক্তির বিলোপসাধনের জন্তু সাধ্যানুসারে ব্রত করিতে মনন করিলেন । যে সকল মোগল ওমরাহ বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারা ও আফগানহস্তে মোগলসৈন্যের

(১) এই যুদ্ধোপলক্ষে শের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পক্ষান্তরে তিনি বহানুভবতার পরিচয়ও প্রদান করেন । মোগলসৈন্য বিধ্বস্ত হইলে এবং পাদ-শাহ পলায়ন করিলে মোগলমহিষী ও বহুসংখ্যক স্ত্রীসত্তমহিলা পক্ষার অন্তরাল হইতে বহির্গত হন । শের খাঁ তাহাদিগকে লেখিবামাত্র অথ হইতে অবতরণ করিয়া যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন ও সাহুনাপ্রদান করেন । তাহার পর তিনি কোন মোগলরমণী, শিশু অথবা ক্রীতদাসকে এক রাজির জন্তুও অপরূক না রাখিয়া মোগল মহিষীর পট্টাবাসে প্রেরণ করিতে আদেশ দেন । সেনানায়কগণ তাহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া এতদ্যেকের আহ্বারের বন্দোবস্ত করেন । ইহার পর কিয়দিবস অতিবাহিত হইলে হুমায়ূনের মহিষী হোসেন খাঁ নিরাকরের তত্ত্বাবধানে রোটার্স দুর্গে প্রেরিত হন, এবং অগ্ৰান্ত মোগলমহিলা শের খাঁর অর্থসাহায্যে আগ্রাতে গমন করেন । মোগলমহিষী কি জন্তু রোটার্স দুর্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা কোন স্থানে লিপিবদ্ধ নাই ।

পর্যাপ্তসংবাদ শ্রুত হইয়া, শত্রুনাশ করিয়া মোগলসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত, নানা স্থান হইতে রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগিলেন । ভ্রাতৃ-
ত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া আফগানশত্রুবিনাশের উপায় উদ্ভাবনের
জন্ত প্রত্যাহ পরামর্শ করিতেছিলেন । কিন্তু পরস্পর মিলিত হইবার
জন্ত কামরানের তাদৃশ আন্তরিক আগ্রহ ছিল না বলিয়া তাহাতে
কোনও ফললাভ হইল না । এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে
কামরান লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন ।
অনর্থক বাকবিতণ্ডার অন্ধ বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার পর কামরান
সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন, এলং বিষপ্রয়োগে রোগগ্রস্ত হইয়া-
ছেন বলিয়া হুমায়ূনের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন । ইহার
পর তিনি দুর্ভাগ্য ভ্রাতার সাহায্যব্যপদেশে এক সহস্র সৈন্য আগ্রাতে
রাখিয়া লাহোর অভিযুগে যাত্রা করিলেন । এই ঘটনায় নগরবাসিগণ
যুক্তফল প্রতিকূল হইবে আশঙ্কা করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, এবং
কামরানের প্ররোচনায় অনেকে তাঁহার অনুগামী হইল ।

হুমায়ুন শত্রুর বিনাশের জন্ত ভ্রাতৃগণ সহ অনর্থক বাকবিতণ্ডার
কালযাপন করিতেছিলেন । অপর পক্ষে শের শাহ বঙ্গদেশের আভ্যন্ত-
রীণ শাসনপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মোগলসাম্রাজ্য অধিকার করিবার
জন্ত আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন । ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শের শাহ বিপুল সৈন্য
সমভিব্যাহারে আগ্রা অভিযুগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং গঙ্গার
পার্শ্ববর্তী প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিলেন । পাদশাহ এই সংবাদ
অবগত হইয়া শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্ত সেনাপতি হোসেনকে
সসৈন্তে প্রেরণ করিলেন । কালীর নিকট উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল ।
আফগান সৈন্তের কিয়দংশ পর্যাদস্ত হইয়া গেল, এবং শের শাহের পুত্র
কুতুব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিলেন । মোগল সেনানায়কগণ শেরের

বিষদন্তু ভথ করিয়া গৌরবভাজন হইবার জন্য হুমায়ূনকে আহ্বান করিলেন ।

তদনুসারে হুমায়ূন এক লক্ষ অশ্বরোহী সৈন্ত সমভিব্যাহারে আগ্রা পরিত্যাগ করিলেন, এবং কনোজের নিকটে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া আফগান্ সৈন্তের সমীপবর্তী হইলেন । কিন্তু উভয় পক্ষই প্রথমে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল । এই ভাবে এক মাস অতিবাহিত হইলে বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন সেনাপতি মুলতান মীরজা মোহাম্মদ সৈন্তে শত্রুর সহিত মিলিত হইল । তাহার অনুসরণ করিয়া আর কতিপয় সেনানায়ক শত্রুর সঙ্গে মিলিত হইলেন । পাদশাহের বিপদের অবধি রহিল না । ইহাতেও দুর্দশার একশেষ হয় নাই বলিয়াই যেন বর্ষাকাল সমাগত হইল । তাঁহার শিবির জলমগ্ন হইয়া গেল । এই সকল কারণে তিনি আর বিলম্ব না করিয়া শের শাহের সৈন্ত আক্রমণ করিলেন । মোগল সৈন্ত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিতাড়িত হইল । হুমায়ূনের অশ্ব আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল ; যদি তিনি দৌভাগ্যক্রমে একটি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে পতিত হইতেন । পাদশাহ বহু কষ্টে অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদ হইলেন ।

এই সময় হিন্দাল ও মিরজা আব্দরী আসিয়া পাদশাহের সঙ্গে মিলিত হইলেন । হুমায়ূন পূর্ববর্তী মোসলমান অধিপতিগণের পথ-নুসরণ করিয়াই শাসনকার্য্য নির্বাহ করিতেছিলেন, কোন অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়া প্রজাসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই । তিনি নিজে এক জন কোমলহৃদয় প্রজাহিতৈষী শাসনকর্তা ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার শাসনপদ্ধতি উৎকৃষ্ট ছিল না ; তাঁহার ক্ষমতা দর্শন করিয়াও প্রজাসাধারণ মুগ্ধ হয় নাই । এ জন্য তিনি কাহারও

অমুরাগ অথবা স্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। আফগান রাজ্য হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাত্তে বিদেশ হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিবারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং হুমায়ুন শত্রু কর্তৃক পরাজিত হইয়া আগ্রাতে গমন পূর্ব্বক শের শাহের গতিরোধের কোন উপায়বিধান করিতে পারিলেন না। তিনি নিরুপায় হইয়া আগ্রা পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে কামরান আপন অবিমূঢ়াকারিতার ফল বুঝিতে পারিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সৌভাগ্য দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতেই মোগল সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত অর্ধেক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কামরান এই নীতি অবলম্বন করিয়া কাবুল ও কান্দাহার রক্ষার জন্য পঞ্জাব প্রদেশ শের শাহকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

৫

হুমায়ুন শের শাহের বিনাশসাধন করিবার উপযোগী বল সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আগ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাতাতাড়িত বৃক্ষপত্রের স্থায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে হুমায়ুনের দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল। সে করুণকাহিনী পাঠ করিতে করিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া পৃথিবীর অনেক নরপতিই পথের ভিখারী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু ঈদৃশ মর্মান্তিক বৃত্তান্ত সমগ্র ইতিহাসেও দুর্লভ। অন্তরঙ্গ আশ্রিত ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব-ক্ষণ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তিনি যে সকল ক্ষুদ্র রাজার শরণাগত হন, তাঁহারা তাঁহাকে

অপমানিত করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না । কেবলমাত্র কতিপয় অনু-
বৃত্ত অনুচর ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিল । (১)

হুমায়ূন অকুল সমুদ্রে ভাসমান হইতেছিলেন ; এমন সময় যোধ-
পুরের রাণা মালবদেব তাঁহাকে আহ্বান করিলেন । তদনুসারে হুমায়ূন
তদীয় রাজ্যের প্রান্তদেশে উপনীত হইয়া দূতপ্রেরণ করিয়া আশ্রয়
প্রার্থনা করিলেন । বিপন্ন নরপতির উদ্ধারসাধনের জন্ত অতি অল্প
লোকেই অঙ্গীকারবাক্য প্রতিপালন করিয়া মহাবীর পরিচয় দিয়া থাকে ।
মালবদেব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, হুমায়ূনকে প্রত্যাখ্যান করিলে
তিনি সে অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারিবেন না ; পক্ষান্তরে তাঁহাকে
বন্দী করিয়া শের শাহের হস্তে সমর্পণ করিলে রাজদরবারে প্রতিষ্ঠানান্ত
হইবে । এই সব কারণে রাজা তাঁহাকে বন্দী করাই কর্তব্য বলিয়া
নির্দ্ধারণ করিলেন । হুমায়ূন দৈবাৎ এই ছরভিসন্ধির বিষয় অবগত
হইয়া বিপ্রহর রাত্ৰিকালে অমরকোট অভিমুখে ধাবিত হইলেন ।

পশ্চিমদেয় হুমায়ূনকে অশেষ যত্নগা ভোগ করিতে হইয়াছিল । তাঁহার
অন্য প্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তিনি তারদি বেগ নামক জনৈক
সামন্তের নিকট একটি অশ্ব প্রার্থনা করিলেন । কিন্তু এই ব্যক্তি
অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিল, পাদশাহের প্রভাবও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল ;
এ জন্ত রাজার অনুরোধ উপেক্ষিত হইল । হুমায়ূন অগত্যা উদ্বৃপৃষ্ঠে
আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । অবশেষে এক ব্যক্তি
আপন মাতাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া সেই অশ্ব পাদশাহকে
প্রদান করিল ।

(১) হুমায়ূন পাদশাহ শের শাহ কর্তৃক পরাজিত হইলে বিরজা আকরী ও
হিন্দাল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহারা পরে স্ব স্ব সুবিধা অনুসারে
কোন্ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করেন ।

হুমায়ুন অনুচরগণ সহ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতেছিলেন। অচিরে প্রবল জলকষ্ট উপস্থিত হইল। কেহ বা জলের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কেহ বা জলতৃষ্ণা সহ করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল; তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণের চীৎকার ও কাতরোক্তিতে চতুর্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন সময় শত্রুসৈন্যের আগমনসংবাদ প্রচারিত হইল; পাদশাহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শত্রুসৈন্য তখনও দূরে ছিল বলিয়া মোগলগণ রক্ষা পাইল। অবশেষে পাদশাহ একটি জলপূর্ণ কূপের পার্শ্বে উপনীত হইলেন। তাহার সদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি ভূমিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিলেন। তাহার পর তিনি সমস্ত চর্মপাত্র জলপূর্ণ করিয়া যে সকল তৃষ্ণাতুর অনুচর পশ্চাতে আসিতেছিল, তাহাদের প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। (১)

পরদিবস প্রাতঃকালে মোগলগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আবার জলকষ্ট উপস্থিত হইল। এবার তাহারা পূর্বাপেক্ষাও অধিক কাতর হইয়া পড়িল। দুই দিন পর্য্যন্ত একবিন্দু

(১) হুমায়ুনের অনুচরগণের মধ্যে একজন ধনাঢ্য বণিক ছিলেন। তিনি তৃষ্ণার একান্ত কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার উত্থানশক্তি ছিল না। তদীয় পুত্র পিতার জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্যথিতচিত্তে তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। পাদশাহ যত্নে জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া অনুচরগণকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য পশ্চাৎগামী হইয়া পশ্চিমপার্শ্বে বণিককে ভুলুষ্ঠিত দেখিতে পান। পাদশাহ তাহার নিকটে অনেক টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। পাদশাহ এই সুযোগে ঋণমুক্ত হইবার আশায় বলেন, “যদি তুমি আমাকে ঋণমুক্ত কর, তবে তোমার যত জলের প্রয়োজন, তাহা তোমাকে দিতে পারি।” বণিক প্রত্যাশ্বরে বলেন, “বর্তমান অবস্থায় এক গ্রাস জল পৃথিবীর সমস্ত ধনরাশি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। অতএব আমি জাহাপনার অন্তরে সম্মত হইলাম।”

জলও কেহ পান করিতে পাইল না। (১) চতুর্থ দিবসে তাহারা একটি জলপূর্ণ কূপের নিকট উপনীত হইল। কূপ অত্যন্ত গভীর ; জল তুলিবার ভাঙ ও তাহাদের একটির অধিক ছিল না। এ জন্ত জল তুলিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছিল। সকলেই সর্ব্বাগ্রে জলপান করিবার জন্ত ব্যগ্র। এ জন্ত হুমায়ূন কূপপার্শ্বে জনতার নিবারণ করিবার কল্পনার তাহাদিগকে দূরে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া নির্দেশ করিলেন যে, জল উত্তোলিত হইলে ঢকা নিনাদিত হইবে, এবং তদনুসারে যোগলগণ পালা ক্রমে কূপের নিকট উপনীত হইয়া জলপান করিবে। কিন্তু তাহারা ভ্রমায় এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল যে, জল উত্তোলিত হইতে না হইতেই একেবারে ১০।১২ জন কূপপার্শ্বে দলবদ্ধ হইল, এবং তাহাদের আগ্রহাতিশয্যে দড়ি ছিঁড়িয়া ভাঙ কূপগর্ভে পড়িয়া গেল, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন ভ্রমাতুরও কূপমাং হইল। এই দুর্ঘটনার মোগলের আত্মনাদে চতুর্দিক শব্দায়মান হইয়া উঠিল। কেহ কেহ যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া উদ্ভৃষ্ট বনুকার উপরে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আর যাহারা কূপগর্ভে পতিত হইয়াছিল, মৃত্যু আসিয়া তাহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান করিল। হুতাঙ্গা হুমায়ূন আপনার বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মূহ্যমুখে পতিত হইতে দেখিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন। পরদিন

(১) এই সময় একদা রাত্রিকালে হুমায়ূন অনুচরদিগকে পটগৃহ ও অগণলির চারিদিকে উদ্ভৃষ্ট দ্বারা চক্র স্থাপন করিয়া সতর্কভাবে রাত্রিযাপন করিবার আদেশ দেন। তিনি নিজেও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চক্রে চারি দিকে পাহারা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ; কিন্তু প্রভুত্ব শেখ আলী সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। উহার অনুরোধে তিনি পটগৃহে বিশ্রামার্থ শয়ন করেন। তিনি নিদ্রাভিভূত, এমন সময় একজন তরুর তথায় প্রবেশ করিয়া তাহার আগনাশ করিতে উদ্যত হয়। এজন্য নরোধম পাদশাহের উপাখ্যানের নিম্ন হইতে তরবারি বাহির করিয়া কোষ হইতে অস্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছিল ; হঠাৎ ভয় পাইয়া সে আরক কাব্য সম্পন্ন না করিয়াই প্রস্থান করে।

তাহারা একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে উপনীত হইলেন । কিন্তু এখানেও তাহাদের হুর্দশার সীমা ছিল না । ভারবাহী উষ্ট্রগুলি উপযুক্ত পরি কয়েক দিন জলপান করিতে না পাইয়া একান্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছিল ; তাহাদের অধিকাংশই অতিরিক্তমাত্রায় জলপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল । মোগলগণও জলপান করিয়া বক্ষে যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল, এবং তাহাতেই অর্ধঘণ্টার মধ্যে অনেকের মৃত্যু হইল । এই অভাবনীয় হুর্দশার পর কেবলমাত্র সাত জন অনুচর সহ পাদশাহ অমরকোটে উপনীত হইলেন ।

অমরকোটের সহদয় রাজা হুমায়ুনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার হুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া ব্যথিতচিত্তে তদীয় সমস্ত অভাব বিদূরিত করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন । তাহার সদয় ও উদার ব্যবহারে হুমায়ুন শান্তিলাভ করিলেন । তিনি পাদশাহকে রাজ্যোদ্ধারকল্পে দুই সহস্র সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন । হুমায়ুন অমরকোটে সার্কি এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া পরিবারবর্গকে তথায় রাখিয়া রাজসৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করিতে গমন করিলেন । এই সময় তাহার প্রিয়তমা মহিষী হামিদা গর্ভবতী ছিলেন । অভিযানের দ্বিতীয় দিবসে তিনি এক পুষ্করিণীর তীরে সসৈন্তে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় আকবরের জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন । এই আনন্দসংবাদ শ্রুত হইয়া ওমরাহবর্গ রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষায় সমবেত হইলে, হুমায়ুন অনুগত ভৃত্য জহোরকে যে সকল দ্রব্য তাহার নিকট ছিল, তাহা আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন । তদনুসারে জহোর দুই শত মুদ্রা, একখানি রৌপ্যালঙ্কার ও একটি মৃগনাভি কস্তুরী আনয়ন করিল । পাদশাহ মুদ্রা ও অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিয়া কস্তুরীর দানা সমাগত সামন্তবর্গকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিলেন । তাহার পর

তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমার পুত্রের জন্মো-
পলক্ষে তোমাদিগকে উপহার দিবার জন্য কেবলমাত্র এই কস্তুরীটি অব-
শিষ্টে রহিয়াছে ; কস্তুরীর স্নগন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়াছে ; আমি
আশা করি, আমার পুত্রের যশঃসৌরভে এক দিন সমগ্র পৃথিবী পুলকিত
হইবে ।”

হুমায়ূন পুত্রের জন্মসংবাদ শ্রুত হইয়া সর্বিশেষ আনন্দিত হইলেন,
কিন্তু তাঁহার দুরবস্থার অবসান হইতে তখনও বিলম্ব ছিল । ইহার পর
অচিরে তাঁহার সৈন্তমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, এবং অনেকই তথা
হইতে প্রস্থান করিল ; এমন কি, যোগল ওমরাহবর্গও শিবির পরিত্যাগ
করিলেন । শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে হুমায়ূন পরাজিত হই-
লেন, এবং তাঁহার বিশ্বস্ত অশুচর আলী যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জন করিল ।
তিনি নিরুপায় হইয়া কান্দাহারের অভিমুখে পলায়ন করিলেন । পশ্চি-
মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ বৈরাম খাঁ গুজরাট হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত
হইলেন । এই সময় কান্দাহার প্রদেশ মিরজা আকরীর অধীন ছিল ।
তিনি কামরানের প্রতিনিধিতাবে এই দেশ শাসন করিতেছিলেন । তিনি
হুমায়ূনকে আশ্রয় প্রদান করিলেন না ; পক্ষান্তরে তাঁহাকে আক্রমণ
করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিলেন ।

হুমায়ূন আকরীর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া পারস্তরাজের
আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য পারস্তে গমন করিবার মনন করিলেন ।
তিনি ফিস্তানের প্রান্তদেশে উপনীত হইলে তত্রত্য শাসনকর্তা পারস্ত-
রাজের পক্ষ হইতে সম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ; তাহার পর
তাঁহাকে অধিক সাহায্য প্রদান করিয়া সুলতানার পরিচর্য্যার জন্য
নীতদাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন । হুমায়ূন তথা হইতে হিরাটে গমন
করিলেন । তথায় পারস্তরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ সাদরে তাঁহার

অভিনন্দন করিলেন । মোহাম্মদ অতিথির সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য
 যত্নের ক্রটি করিলেন না । তিনি হুমায়ুনকে পারস্ত-দরবারে উপনীত
 হইবার উপযোগী উপকরণ প্রদান করিলেন । হুমায়ুন তথা হইতে
 পারস্তের রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । সমস্ত প্রাদেশিক
 শাসনকর্তৃগণ তাঁহার দর্শনকামনার পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
 রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তিনি কিজ্বি নামক
 স্থানে উপনীত হইয়া পারস্তদরবারে বৈরাম খাঁকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং
 তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ইহার পর হুমায়ুন পারস্তদরবারে
 উপনীত হইলেন, এবং পারস্তরাজ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসহকারে
 আশ্রয় প্রদান করিলেন ।

৬

শের শাহ হুমায়ুনের হস্ত হইতে মোগল রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া
 ছিলেন । তিনি মোগলের অধিকৃত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া
 বিপুলবিক্রমে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । শের শাহ হুমায়ুনের
 বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার সময় খিজির খাঁ নামক জনৈক সেনাপতির
 হস্তে বঙ্গদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন । শের শাহ
 দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবগত হইলেন যে, খিজির খাঁ
 বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব অধিপতি মোহাম্মদ শাহের কন্যার পানিপীড়ন
 করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছেন । এই সংবাদ অবগত হইয়া
 তিনি বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন । শের শাহ গোড়নগরের নিকটবর্তী
 হইলে খিজির খাঁ তাঁহার প্রত্যাগমনার্থ তদীয় শিবিরে উপনীত হইলেন ।
 এই সুযোগে তিনি খিজিরকে ধৃত করিয়া অবরুদ্ধ করিলেন । তাহার
 পর তিনি বঙ্গরাজ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের
 স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং কাজি ফাজিলত নামক জনৈক

সাধুপুরুষকে বিভাগীয় শাসনকর্তৃগণের কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার ভার দিলেন ।

অনন্তর শের শাহ দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং তার পর মালব দেশে গমন করিয়া তথায় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিলেন । এই সময় মালবের অন্তর্গত রায়সিন নামক দুর্গে একজন হিন্দু সামন্ত আধিপত্য করিতেছিলেন । শের শাহ এই দুর্গ অবরোধ করিলেন । দুর্গবাসিগণ প্রস্তাব করিল যে, শের শাহ তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে পারে । তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দুর্গ অধিকার করিলেন ; কিন্তু সন্ধির কথা বিশ্বৃত হইয়া দুর্গবাসী সমস্ত হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন ।

অতঃপর শের শাহ রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়োয়ার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া অভিযান করিলেন । মাড়োয়ার রাজ্য বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে স্থাপিত,—শস্ত্রসমাকীর্ণ ও “প্রকৃতির কমনীয় শোভায় অলঙ্কৃত” নহে । মাড়োয়ারীর স্থায় রণনিপুণ স্বদেশ-ভক্ত বীরদিগকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া শের শাহ কোশলে শত্রুশিবিরে ভেদ জন্মাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার চাতুরীতে কতকগুলি পত্র রাজ্যের হস্তগত হইল । এই সকল পত্র পাঠ করিয়া তিনি আপন সামন্তবর্গের প্রতি সন্দিহান হইলেন । সামন্তগণের এক জনের নাম কুস্ত । তিনি এই ব্যাপারে হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইলেন, এবং আপন নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য দশ সহস্র সৈন্য লইয়া শেরকে আক্রমণ করিলেন । তাঁহার প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া আফগান সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল ; কিন্তু অবশেষে বহুকষ্টে শের শাহ জয়লাভ করিলেন । শত্রুসৈন্য পরাস্ত হইলে তিনি মাড়োয়ার রাজ্যের অনুর্দ্ধরতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি এক মুষ্টি ভূটার

অন্ত ভারতসাম্রাজ্য হারাইতে বসিয়াছিলেন ।” ইহার পর তিনি বাড়োয়ান রাজ্য অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন ।

পর বৎসর, অর্থাৎ ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে, শের শাহ বুদ্ধেনগরে অস্তর্গত কালিঙ্গের দুর্গ অবরোধ করিলেন । এই দুর্গের অবরোধকালে ভূগন্ত বাকুদখানার অগ্নীপাত হইয়া শের শাহ দগ্ধীভূত হইলেন । কিন্তু যতক্ষণ দুর্গ অধিকৃত না হইল, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই । দুর্গ অধিকৃত হইবার সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন, “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !” এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র তাঁহার বাকুশক্তি চিরকালের জন্য লুপ্ত হইল, তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহপিঙ্গর পরিত্যাগ করিয়া গেল । (১)

(১) শের শাহ পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । কথিত আছে যে, এক জন পার্শ্ববাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “জাহাপনার কেশ শুক্লবর্ণ হারণ করিয়াছে ।” তৎক্ষণে তিনি বলিয়াছিলেন, “হাঁ, সন্ধ্যাকালে আমি সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছি ।” সিংহাসন অধিকার করিয়া তিনি চারিটি কার্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতানিবন্ধন তাঁহার একটি কল্পনাও কার্যে পরিণত হয় নাই । এ জন্য শের শাহ মৃত্যুর পূর্বে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই কল্পনাচতুষ্টয়ে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় । (১) পিতৃভূমি রো প্রদেশ জনশূন্য করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের দ্বারা লাহোর ও শিবালিকের মধ্যবর্তী প্রদেশে উপনিবেশস্থাপন । মোগলের ভারতবর্ষে আগমনের পথাবরোধ এবং পার্শ্ববাসী জমিদারগণের শাসনই ইহার উদ্দেশ্য (২) লাহোর নগরের ধ্বংস । বহিঃশত্রু ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই পশ্চিমদিক লাহোর আক্রমণ করিত, এবং তাদৃশ বৃহৎ নগর অধিকার করিতে পারিলেই শত্রু-সৈন্যের আর রসদের অভাব থাকিত না, এবং অস্তিত্বের শৃঙ্খলাবিধানও সহজসাধ্য হইত । এ জন্যই শের শাহ লাহোরের ধ্বংস করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন । (৩) মক্কাযাত্রীর গমনাগমনের সুবিধার জন্য সরাইয়ের দ্বার পঞ্চাশখানি বৃহৎ অর্ধবৃত্তাকার নির্মাণ । (৪) পাণিপথে এব্রাহিম লোদির সমাধি-প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার সম্মুখে যে সকল মোগলবংশীয় সেনাপতি শেরের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিমিত্ত আর একটি সমাধিস্থানের নির্মাণ । তিনি এই সমাধিস্থানসমূহের পরম রমণীয়ভাবে নির্মাণ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন ।

শের শাহের চরিত্রের একাংশ অত্যুজ্জল ; অপরাংশ কলঙ্ককালি-
মাঙ্কর । তাঁহার রাজত্বকালে বিচারকগণ অপক্ষপাতে ন্যায়বিচার
করিতেন । কেহই অত্যাচার অনুষ্ঠান করিয়া অব্যাহতি পাইত না ।
কিন্তু তিনি নিজে পাপাচরণে দ্বিধাশূন্য ছিলেন ; বিশ্বাসহীনন করিয়া
আপনাকে কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না । তাঁহার কার্য-
পন্থায় প্রতীত হয়, যেন বিশ্বাসহীনন ব্যাপারে একমাত্র রাজাই
অধিকারী ! কেন না, প্রজাদের মধ্যে কেহ তাদৃশ কার্যে লিপ্ত হইলে
তিনি তাহার কঠোর দণ্ডবিধান করিতেন । তাঁহার প্রকৃতি পাপপ্রবণ
ছিল না ; প্রবল রাজ্যলালসা চরিতার্থ করিবার জন্তই তিনি অসদনুষ্ঠানে
প্রবৃত্ত হইতেন । শেরের অসাধারণ প্রতিভাই তাঁহাকে রাজ্যলোলুপ
করিয়াছিল । তিনি যে পথে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন,
তাঁহার ঔচিত্যানুচিত্য বিচার করিবার অবকাশ ছিল না । যদি তিনি
কেবলমাত্র পৈত্রিক জায়গীরের শাসন সংরক্ষণ কার্যেই পরিতৃপ্ত
থাকিতেন, তাহা হইলে কার্যক্ষেত্রে তাঁহার পদস্থলন হইত না ;
সিংহাসনে তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলে তিনি সম্ভবতঃ নিম্নাপ-
নরপতি বলিয়াই জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন ।

কোন মূল মন্ত্রের সাধনায় জায়গীরদার শের পাদশাহী সিংহাসন
অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ? ঐক্যনীতিই তাঁহার প্রত্যেক
কার্যের নিয়ামক ছিল । তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আফগান-
শক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়িলে আফগানের এত দুর্দশা হইত না ।
এজন্য তিনি আফগানশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াই স্বীয় উন্নতির ভিত্তি
প্রতিষ্ঠিত করেন । আত্মকলহই আফগানশক্তির দৌর্বল্যের কারণ
ছিল । শের শাহ এই কারণ অপসারিত করিয়া সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার
উপযোগী বলসঞ্চয় করেন, এবং তাহাতেই কৃতকার্য হন । এসলাম-

ধর্ম্ম তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু তিনি তজ্জন্তু হিন্দুকে কখনও টুংপীড়িত করেন নাই । তদীয় অনুচরবর্গের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা নিবারণ করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন । শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য তিনি স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন । কখনও আলম্বের প্রশ্রয় দিতেন না । তিনি কোন কার্য্যই নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা অথবা কার্য্যাধ্যক্ষগণকে কোনও বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্ত্ব প্রদান করিতেন না । তিনি বলিতেন, “আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর অমাত্যবর্গের পাপপ্রবণতাই আমার রাজ্যলাভের কারণ ।” শের শাহ সময়কে সমান চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; এই চারি ভাগ বিচারকার্য্য, সৈন্তের শৃঙ্খলা সংস্থাপন, ঈশ্বরোপাসনা এবং বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনে অতিবাহিত হইত ।

শের শাহ সাম্রাজ্যকে ১১৬০০০ হাজার পরগণাতে বিভক্ত করিয়াছিলেন । প্রত্যেক পরগণার জন্ত পাঁচ জন কর্ম্মচারী নির্দিষ্ট ছিল । তন্মধ্যে অন্ততঃ একজন বিচারক ও একজন হিন্দু পাটওয়ারী থাকিতেন । রাজকর্ম্মচারী ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে বিচারক তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন । এসলাম শাস্ত্রের অনুশাসনের পরিবর্তে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কর্ষিত ভূমির পরিমাপ ও শস্তের অবস্থা অনুসারে এক বৎসরের জন্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল । কোনও রাজকর্ম্মচারীই দুই বৎসরের অধিক কাল এক স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেন না । সাম্রাজ্যের অন্তঃপ্রদেশ নিরন্তর হইয়াছিল ।

শের শাহ প্রজার হিতকামনায় বহু সদুপস্থান করিয়াছিলেন ; তাঁহার কৌতুকলাপ অত্যাধি দেদীপ্যমান । তিনি বাঙ্গলা হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত করিয়াছিলেন । ইহার দুই পার্শ্বে স্থানে

স্থানে পাহশানা ও কূপ ছিল । তদ্ব্যতীত তিনি রাজপথপার্শ্বে বহুসংখ্যক সৌষ্ঠবশালী মসজিদ নির্মাণ করিয়া তথায় কোরাণ-পাঠক ও মোল্লা নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন । তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রত্যেক বিশ্রাম-স্থানে পথিকগণ জাতিধর্মনির্বিশেষে বিনা ব্যয়ে আহাৰ্য্য পাইত । পথিক-দিগকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছিল । রাজকাৰ্য্য ও বাণিজ্যের সৌকৰ্য্যার্থ ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি হইয়াছিল । তাঁহার রাজত্বকালে দস্যু ও তস্করের ভয় সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছিল । তাঁহার প্রবল প্রতাপে কেহই বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিতে সাহসী হয় নাই । তাঁহার শাসনকালে কলহ-প্রিয় আফগানগণও শান্তিতে বাস করিতেছিল । তিনি কেবল পাঁচ বৎসর কাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । এই অত্যল্পকালের মধ্যেই মুশৃঙ্খল শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । (১)

(১) "From the day that Sher Shah was established on the throne no man dared to breathe in opposition to him, nor did any one raise the standard of contumacy or rebellion against him, * * * nor did any theft or robbery ever occur in his dominions. The travellers and wayfarers were relieved from the trouble of keeping watch, nor did they fear to halt even in the midst of a desert. * * * A decrepit old woman might place a basket of gold ornaments on her head and go on a journey, and no thief or robber would come near her for fear of the punishment which Sher Shah inflicted. "Such a shadow spread over the world that a decrepit person feared not a Rustum." During his time all quarrelling, disputing, fighting and turmoil, which is the nature of the Afghans was altogether quieted and put a stop to throughout the countries of Hindustan and Roh. * * * In a very short period he gained the dominion of the country and provided for the safety of the high-ways, the administration of the government and the happiness of soldiery and people."—*Tarikh-i-Sher Shahi*. শের শাহ কি প্রণালীতে

শের শাহ জীবদ্দশাতেই স্বীয় জন্মভূমি শেরারামে নিজের জন্ত সৌষ্ঠবশালী সমাধিগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; শোভাবর্ধনের জন্ত ইহার চতুস্পার্শ্বে ঝিল খনিত হইয়াছিল । তথায় তাঁহার সমাধি হয় । (১)

৭

শের শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জালাল খাঁ পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন । জালাল খাঁ জনসাধারণের নিকট সেলিম শাহ নামে পরিচিত ছিলেন । (২) তাঁহার রূঢ় ব্যবহারে রাজভক্ত ওমরাহবর্গ

দশা তত্ত্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিতেন, তাহার দৃষ্টান্তরূপ আমরা এ স্থলে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । শের শাহ যে সময়ে খানেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার শিবির হইতে একটা অথবা অপহৃত হইয়াছিল । ইহাতে তিনি শিবির হইতে বৃত্তাকার পঞ্চাশ কোশের মধ্যে যত জমিদার ছিলেন, তাঁহাদিগকে অপহৃত অথবা জন্ত দায়ী করিয়া, চোরকে তিন দিনের মধ্যে হাজির করিতে না পারিলে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন । এটোয়ার নিকটবর্তী ময়দানে একদা এক জন মনুষ্যের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল । এই ময়দানের স্বত্ব লইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল । কোন্ গ্রামের লোক হত্যা করিয়াছে, তাহার নির্ণয় করিতে না পারিয়া সমুদ্রি ঘটনাক্রমে নিকটবর্তী একটা বৃক্ষ কর্তন করিতে আদেশ দেন । কোন্ ব্যক্তি এই কার্যের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলে তাহাকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিবার আদেশ ছিল । পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক জন লোক বৃক্ষ কর্তন করিতে নিষেধ করিলে তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করা হয় । তিনি ধৃত ব্যক্তিকে বলেন, “তুমি গ্রাম হইতে এত দূরে একটা বৃক্ষকর্তনের বিষয় জানিতে পারিলে ; অথচ সেই স্থানে সংঘটিত নরহত্যার স্তায় একটা গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পার নাই । এ কি রূপ ? তিন দিনের মধ্যে হত্যাকারী ধৃত না হইলে তোমাদের সমস্ত গ্রামবাসীর প্রাণদণ্ড হইবে ।” এই উভয় অপরাধীই ধৃত হইয়াছিল ।

(১) This fine monument of the magnificence of Sher still remains entire. The artificial lake, which surrounds it is not much less than a mile in length.—Dow's History of Hindostan.

(২) আবদুল কাদের ফেরিস্তা, আবুল ফজল ও অশ্বাস্ত তৈমুরবংশোদ্ভূত ইতিহাস-বেত্তগণ জালাল খাঁকে সেলিম নামে অভিহিত করিয়াছেন । তাঁহার নিম্নিত দিল্লীর দুর্গ সেলিম-গড় নামে প্রসিদ্ধ । কিন্তু রাজমুদ্রায় তাঁহার নাম ইসলাম শাহ অঙ্কিত রহিয়াছে । যথা,—

বিরক্ত হইয়া উঠিলেন । তিনি ওমরাহদিগকে বিশ্বাস করিতেন না । শের শাহের সময়ে রাজা ও রাজপুরুষগণের মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এই ভাবে অস্বহিত হইল । সেলিম শাহ বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন না ; পিতার অবলম্বিত শাসননীতির পরিহার করিয়া অভিনব পন্থার অনুসরণপূর্বক কীর্তিসংস্থাপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল । তাঁহার প্রবর্তিত শাসনপ্রণালী প্রজার হিতকর কি না, তিনি আদৌ তাহার বিচার করিতেন না । (১) নয় বৎসরকাল রাজত্বের পর সেলিম শাহ কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় দ্বাদশবর্ষবয়স্ক পুত্র ফিরোজ শাহজাদ্যধিকারী হইলেন । মোহাম্মদ নামে শের শাহের এক ভাতৃপুত্র ছিল । সেলিম মোহাম্মদের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ফিরোজ মোহাম্মদের গর্ভজাত ছিলেন । সেলিমের মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে (২) মোহাম্মদ ফিরোজকে বধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । সেলিম জীবদ্দশাতেই বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে, মোহাম্মদ রাজ-সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন । এজন্য সেলিম তাঁহাকে বধ করিয়া ফিরোজকে নিষ্কণ্টক করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমহিষী

The world, through the favour of the Almighty has been rendered happy, since Islam Shah, the son of Sher Shah Sur has become king.

(১) They (his regulation) seem all silly and nonsensical. * * * In the first sentence of his paragraph we find land grants converted into money pensions, and in the last money pensions converted into land grants ; merely because in both instances Sher Shah had enacted otherwise and Islam Shah was desirous of showing the world that he also had his 'own thunder.'

(২) সকল ইতিহাসবেত্তাই ফিরোজের হত্যার সময় সম্বন্ধে একমত । কেবল তারিখ-ই-সালাতনি আকগানা গ্রন্থে, সেলিমের মৃত্যুর দুই মাস পরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।

ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য বারংবার কাকুতি মিনতি করাতে তাঁহার অস্ত্র-প্রায় কার্যে পরিণত হয় না । (১) মোহাম্মদ যে সময় ফিরোজকে বধ করিতে উদ্বৃত্ত হন, তখন তিনি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মাতার কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাতেও মোহাম্মদ অভীষ্টসিদ্ধ করিতে বিরত হন নাই । তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আদিল (ভায়পরায়ণ) উপাধি গ্রহণ করেন । কিন্তু তিনি যথোপযুক্তরূপে রাজ্যশাসন করিতে পারিতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাকে আদলি বলিত । সাধারণ লোকে উচ্চারণের ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে আনদেলী (অন্ধ) বলিয়া নির্দেশ করিত ।

আদিল অত্যন্ত কুক্রিয়ান্বিত ও বিলাসমগ্ন ছিলেন । তিনি রাজ্য-শাসন বিষয়ে কিছুমাত্র মনোনিবেশ করিতেন না ; কার্যদক্ষ প্রধান মন্ত্রী হিমু (২) সর্বেসর্ব্বা ছিলেন । আদিল কর্তৃক সিংহাসন অধিকৃত হইবার কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার অপরিমিত ব্যয়ে রাজকোষের সঞ্চিত ধনরাশি মিশ্রশেষিত হইয়াছিল । তাঁহার পার্শ্বচর প্রিয়পাত্রগণের শোষণের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না । এক্ষণে আদিল ওমরাহবর্গের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন । তাঁহার

(১) সেলিমের জীবদ্দশায় মোহাম্মদ কেবল আমোদ প্রমোদেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন । সেলিম তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় মহিবীর (মোহাম্মদের ভগিনীর) মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার ভাতা আমোদ ও লাম্পটাই ভালবাসে ; বাদ্যযন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও গীতবাদ্যাদ্বয়ই কালহরণ করিয়া থাকে । রাজত্ব তাহার স্পৃহনীয় নহে ।” লোকচক্ষু হইতে আপনার রাজ্যলালসা গোপন রাখিয়া অন্ধ অথবা মূঢ় হইতে অব্যাহতিলাভ করিবার জন্য তিনি পাগলের ভাণ করিতেন ।

(২) হিমুর পূর্ণ-নাম হেমচন্দ্র ; জন্মস্থান রাজপুতনার । হিমু দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ছিলেন । তিনি প্রথমে দিল্লীতে দোকান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন । এই সময়ে তিনি কোনও কারণে মোহাম্মদ আদিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হন । মোহাম্মদ আদিল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিয়া সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করেন ।

দুর্ভাবহারে সমস্ত দেশে বিদ্রোহের বেড়া আঙুন জলিয়া উঠিল । প্রথমতঃ চূণারে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল ; আদিল ও হিমু তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহের দমন করিলেন ।

কিন্তু বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার পূর্বেই এব্রাহিম শুর নামক তাঁহার একজন আত্মীয় (ভগিনীপতি) দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন । এব্রাহিম পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন । আদিল এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া এব্রাহিমকে বিনাশ করিতে ধাবিত হইলেন । পথিমধ্যে এব্রাহিমের দূত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করি-
করিলেন । তিনি বলিলেন,—“জাঁহাপনা ! আপনি এব্রাহিমকে মার্জনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার নিকট হোসেন প্রভৃতি ওমরাহগণকে প্রেরণ করিলেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন ।” আদিল একান্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন ; তিনি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ওমরাহদিগকে প্রেরণ করিলেন । তাঁহার। এব্রাহিমের ভদ্র-ব্যবহার ও প্রলোভনবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন । ইহাতে তিনি এতদূর বল-
শালী হইয়া উঠিলেন যে, আদিল তাদৃশ প্রবল শত্রুকে পরাজিত করি-
বার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া চূণারে প্রতিগমন করিলেন, এবং সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাংশের শাসনদণ্ড পরি-
চালন করিয়াই আপাততঃ পরিতৃপ্ত রহিলেন । এব্রাহিমও অচিরে সুল-
তান উপাধিগ্রহণ করিয়া পশ্চিমাংশের শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ।

কিন্তু এব্রাহিম দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারিলেন না । তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই সেকন্দর নামক আদিলের আর একজন আত্মীয় (ভগিনীপতি) পঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । (১) এব্রাহিম এই

(১) এব্রাহিমের দিল্লী ও আগ্রা অধিকারের পর আদিল সন্দেহবশতঃ সেক-

সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিষদন্ত উৎপাটন করিবার কণ্ঠ বিপুল বাহিনীসহ যাত্রা করিলেন । কিন্তু তিনি শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন ; দিল্লী ও আগ্রা সেকেন্দরের হস্তগত হইল । এত্রাহিমের অধিকাংশ সৈন্য তাঁহার বশতা স্বীকার করিল । এত্রাহিম, দিল্লী ও আগ্রা কাড়িয়া লইলে, আদিল সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাংশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এক্ষণে এত্রাহিমের পরিবর্তে সেকেন্দর পশ্চিমাংশের অধিপতি হইলেন ; আদিল পূর্ববৎ পূর্বাংশের অধিপতি রহিলেন ; এবং এত্রাহিম রাজ্যচ্যুত হইয়া নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ভারতের রাজলক্ষী আফগানের পক্ষে একান্ত চঞ্চলা ছিলেন । এক বিপ্লব উপশমিত হইতে না হইতেই আর “এক প্রবল বজ্রা উখিত হইয়া কুলপাবী তরঙ্গ তুলিত।” সেকেন্দর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন ; কিন্তু দুই দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই হুমায়ুন পাদশাহ (১) আফগান অধিকৃত ভারত সাম্রাজ্যের বিশ্-

ল্লরকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হন । তাঁহার মনোভিলাষ কোনও ঘটনাসূত্রে তদীয় ভগিনীর (সেকেন্দর-পত্নী) নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে । পত্নীর পরামর্শ মত সেকেন্দর মুগ্ধাব্যাপদেশে আদিলের সঙ্গে পরিত্যাগপূর্বক শ্যালিপতি এত্রাহিমের নিকট উপনীত হইয়া পঞ্জাবের শাসনভার প্রার্থনা করেন । তিনি তথায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া অসম্মানভরে পঞ্জাবে গমন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ।

(১) আমরা বলিয়াছি যে, হুমায়ুন ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্য-রাজের শরণাপন্ন হন । পারস্য-ইতিহাস-লেখক সুপ্রসিদ্ধ সার জন ম্যাক্‌লম খীর গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, হুমায়ুনের পারস্য দরবারে অবস্থানকালে শাহ তমশেপ তাঁহাকে আদর ও সম্মান প্রদর্শন করেন । কিন্তু পাদশাহের অনুচর ঘোহরের লিখিত বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা অবগত হই যে, তিনি পারস্য দরবারে নানারূপ লাঞ্ছনা সহ করিয়াছিলেন । এল্‌ফিনষ্টোন সাহেবও এই মতের পক্ষপাতী । তিনি বলেন যে, শাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে বখোচিত সম্মান সহকারে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতানৈক্য ছিল । হুমায়ুন স্বমত পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে তমশেপ তাঁহার সঙ্গে অসহ্যবহার করেন । যাহা হউক, পারস্যরাজ তমশেপ কান্দাহার ও কাবুল জয় করিবার জন্য নির্ধারিত পাদশাহের অধীনে

জলা দর্শন করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন । সেকন্দর তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অশীতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ধাবিত হইলেন ।

সেকন্দর মোগল অধিপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করিলে এব্রাহিম পুনর্বার রাজ্যভাষ্যের বাসনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তিপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কাল্লী নামক স্থানে সসৈন্তে সমবেত হইলেন । আদিলও আপন সম্রাজ্যের অপরাধ শত্রুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার

১৪০০০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন । তিনি এই সৈন্যদলের সাহায্যে ভাতা মিরজা আকবরকে পরাজিত করিয়া কান্দাহার দখল করেন । ভাতুম্বেহপরায়ণ হুমায়ূন মিরজা আকবরকে ক্ষমা করেন । ইহার পর কাবুল রাজ্যও হুমায়ূনের পদানত হয় । এই সময় কামরান কাবুলে রাজত্ব করিতেছিলেন । কাবুল বিজিত হইবার পর হিন্দাল আসিয়া হুমায়ূনের সহিত যোগদান করেন । হুমায়ূনের উদারতা ও সত্বাবহারে তাঁহার সঙ্গে আকবরী ও হিন্দালের মৌহদা স্থাপিত হয় । কিন্তু রাজ্যচ্যুত কামরান ভোষ্ঠ ভাতার প্রতিকূলাচরণে ক্ষান্ত ছিলেন না । অবশেষে তিনিও নিঃসহায় হইয়া হুমায়ূনের হস্তে পরিত্যক্ত হন । হুমায়ূন তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করেন । ইহার পর পাদশাহ নিকটক হইয়া রাজত্ব করিতে থাকেন, এবং আকবানের কবল হইতে ভারত সাম্রাজ্য উদ্ধার করিবার উপায় উদ্ভাবনে যত্নপর হন । তিনি পুনর্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পান যে, অন্তর্বিদ্বেহে আফগানশক্তি নিশ্বেজ ও হীনবল হইয়াছে । এই সংবাদপ্রাপ্তির পর একদা যুগ্মবার্ষিক গমনকালে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণের বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন । যে সকল ওমরাহ পুনর্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিলাষী ছিলেন, তাঁহারা পাদশাহের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে অবিলম্বে ভারত আক্রমণে লিপ্ত করিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করেন । তাঁহারা বলেন, এক জন লোক প্রেরণ করিয়া ক্রমাবয়ে যে তিন জন লোকের সঙ্গে পশ্চিমধ্যে তাহার দেখা হইবে, তাহাদের নাম জিজ্ঞাসাপূর্বক অদৃষ্টপরীক্ষা করিবার প্রাচীন নিয়ম প্রচলিত আছে । হুমায়ূন অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া এ প্রস্তাবে সন্তোষিত হইলেন । প্রেরিত লোকের সঙ্গে যে তিন ব্যক্তির ক্রমাবয়ে দেখা হইয়াছিল, তাহাদের প্রথমের নাম দৌলত (মোজাঙ্গা), দ্বিতীয়ের নাম যুসুফ (অভিলাষ), এবং তৃতীয়ের সাদিত (স্বপ্ন) । পরীক্ষার ফল পাদশাহের অনুকূল হওয়াতে তিনি অপরিমিত আনন্দ অনুভব করেন । ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আফগানের কবল হইতে ভারত সাম্রাজ্যের উদ্ধার করিবার জন্য ভারতবর্ষে উপনীত হন ।

জন্তু বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন । এই সময় তিনিও শত্রুর বিদগ্ধ ভগ্ন করিবার জন্তু প্রধান মন্ত্রী হিমুকে সৈন্যপত্যে বরণ করিয়া প্রেরণ করিলেন । তিনি প্রথমতঃ এব্রাহিমকে বিধ্বস্ত করিতে মনন করিয়া কাম্বোজে উপনীত হইলেন । তুমুল যুদ্ধে এব্রাহিম পরাজিত হইলেন ; তাঁহার সমগ্র বাহিনী একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল ; তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিবার ক্ষমতা চিরকালের জন্তু বিনুপ্ত হইল ।

এব্রাহিম সমূলে বিনষ্ট হইতে না হইতেই আর এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী রক্তক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । বঙ্গদেশের শাসনকর্তা মোহাম্মদ সুর স্বাধীনতা ঘোষণা পূর্বক দিল্লীর সাম্রাজ্যেরদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সসৈন্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । রাজ্যলোলুপ পাঁচ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রক্তভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ;—(১) আদিল, (২) এব্রাহিম, (৩) সেকন্দর, (৪) হুমায়ুন, (৫) মোহাম্মদ সুর । এব্রাহিমের বিদগ্ধ পূর্বেরই ভগ্ন হইয়াছিল ; হুমায়ুন সেকন্দর পরস্পর বিবাদ করিয়া কৌণবল হইতেছিলেন । একজন্তু আদিল মোহাম্মদ সুরকে দমন করাই সম্ভবত বিবেচনা করিয়া হিমুকে চূণারে আহ্বান করিলেন । হিমু তদনুসারে চূণারে উপস্থিত হইয়াই সংবাদ পাইলেন যে, হুমায়ুন সেকন্দরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াছেন । (১) কিন্তু আদিল ও তদীয় দক্ষিণবাহিন্যরূপ হিমু এই সংবাদ অবগত হইয়াও হুমায়ুনের বিরুদ্ধে শক্তিনিয়োগ না করিয়া বাঙ্গলার শাসনকর্তা মোহাম্মদ সুরকে সর্বাগ্রে দমন করাই আবশ্যক বলিয়া অবধারণ করিলেন ।

(১) মোগল ও আকবান (সেকন্দর) সৈন্তে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে হুমায়ুন এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি বৈরাম খাঁ শূকোশলে সৈন্ত পরিচালন করিয়াছিলেন : ঋনোদশবর্ষব্যয়ক শাহজাদা আকবর বিপুল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বীরেন্দ্রসমাজের বরণ্য হন । এই বালকের অসাধারণ পরাক্রমদর্শনে মোগলসৈন্তের হৃদয় এত দূর উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, তাহারা মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল ।

তাহারা মোহাম্মদকে দমন করিলেন । সুর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া যত্নমুখে পতিত হইলেন । এরাহিমের উত্থানশক্তি পূর্বেই বহিত হইয়াছিল ; সেকন্দরও হুমায়ূনের হস্তে পরাজিত হইয়া হতবল হইয়াছিলেন ; এক্ষণে মোহাম্মদ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিলেন । অতএব বঙ্গভূমিতে দুই জন মাত্র প্রতিদ্বন্দী অবশিষ্ট রহিলেন,—হুমায়ূন ও আদিল । অতঃপর আদিল হুমায়ূনকে বিনষ্ট করিবার অন্য আরোজনে প্রবৃত্ত হইলেন ।

হুমায়ূন রণক্ষেত্রে জয়শ্রীলাভ করিয়া আবুল মালিককে পঞ্চনদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত করিয়া হীনবল সেকন্দরকে সমুদ্রে বিনষ্ট করিবার আদেশ দিলেন । তাহার পর তিনি নগৌরবে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয়বার রাজসিংহাসন অধিকৃত করিলেন । বীরকেশরী বৈরাম খাঁর সাহায্যেই তিনি পুনর্বার রাজালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই জন্ত তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন । তারদি বেগ দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । আবুল মালিকের কর্ত্তৃহাধীনে মোগলসৈন্তের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইল ; এই অবকাশে সেকন্দর ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিলেন । হুমায়ূন এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার ধ্বংস করিবার জন্ত বৈরাম খাঁর কর্ত্তৃহাধীনে রাজকুমার আকবরকে পঞ্জাবে প্রেরণ করিলেন ।

ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন । ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে । এক দিন সায়াহ্ন সময়ে হুমায়ূন পাঠ-গৃহের ছাদে বায়ুসেবনার্থ গমন করেন । তথা হইতে অবতরণ করিবার সময়ে তিনি আজামের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কলমা পাঠ করিয়া সোপানে উপবেশন করেন । আজাম-ধ্বনি শেষ হইলে তিনি যেমন দণ্ডায়মান হইবেন, অমনই তাঁহার পদাঘাতন হয় । ইহাতেই তিনি কালগ্রাসে

পতিত হন । তাঁহার মৃতদেহ যমুনার তীরে সমাহিত হয় । আকবর তদ্ব্যয় একটি সৌষ্ঠবশালী গৃহ নিৰ্ম্মিত করিয়াছিলেন । (১)

হুমায়ুন একপঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সংবরণ করেন । তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর দিল্লী ও কাবুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । তাঁহার সুগঠিত উন্নত দেহ ও বীরত্বী দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত । হুমায়ুনের জীবনকাহিনী উপন্যাস অপেক্ষাও রহস্যময়ী । কখনও বা ভাগ্যলক্ষীর করুণারশি অজস্রধারে তাঁহার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহার পরমুহূর্ত্তেই হয় ত তিনি বিপদের উত্তাল তরঙ্গমালায় পতিত হইয়া বারংবার বিক্লিপ্ত হইয়াছেন । তাঁহার জীবনের প্রথমভাগ স্তব্ধে অতিবাহিত হইয়াছিল । কিন্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর তিনি এক দিনও শান্তিস্থখে ষাপন করিতে পারেন নাই । ভাগ্য-

(১) This mausoleum is one of the most splendid monuments which the munificence of princes has placed among the magnificent memorials of departed royalty in that country where these monuments abound to a degree perhaps unparalleled in any other. Though built of the most costly materials and with a lavish expenditure exceeding any thing which preceded it the tomb of Humayoon is remarkable for the utter absence of everything like meretricious ornament. The spectator's attention is particularly arrested by the perfect chastity of design, and singular delicacy of execution, which this celebrated edifice exhibits. It is composed entirely of marble, in some of its parts exhibiting beautiful specimens of the most costly mosaic like the Tajmehal at Agra, built by Shah Jehan, after the same design, but still more costly, much more richly ornamented, and of considerably larger dimensions. The mausoleum of Humayoon is even now the admiration of travellers, and is altogether, according to the opinion of many, in better taste than that more celebrated and elaborate edifice, the Taj. *Rev'd. Hobart Cauntar. B. D.*

বিপর্যয়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া তিনি উপযুপরি যেরূপ বিপদে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোনও নরপতিকে সেরূপ ছরবছার পতিত হইতে হয় নাই। হুমায়ূন ভ্রাতৃশ্রদ্ধার দৃষ্টান্তস্থল ; বস্তুতঃ অসাধারণ ভ্রাতৃশ্রদ্ধাই তাঁহার সমস্ত দুর্দশার মূল। তিনি ভ্রাতৃ-
 যুদ্ধকে যতই স্নেহসূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা ততই তাঁহার অনিষ্টসাধন করিয়া কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। হুমায়ূন ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্তপতির সাহায্যে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। এই সময় তিনি কামরানের চক্ষুঃ উৎপাটন করিতে আদেশ দেন। এ বিষয়ে ইতিহাসবেত্তা মোহাম্মদ কাজিম ফেরিস্তা বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা এ স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। “মোগল ওমরাহবর্গমাত্রেই তাঁহাকে কামরানের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া ভাবী বিপদের মূল উন্মূলিত করিতে বলিতেছিলেন। কিন্তু যদিও কামরান ভ্রাতৃবন্ধে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত করিয়া স্নেহের প্রতিদান দিয়াছিলেন, তথাপি হুমায়ূন ভ্রাতৃবন্ধে হস্ত কলঙ্কিত করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার তাদৃশ যুদ্ধ ব্যবহারে সৈন্তগণ বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকেই অনুধোগ করিতেছিল যে, তাঁহার উদারতাতেই মোগলগণ বারংবার দুর্দশাপন্ন হইয়াছে। অবশেষে পাদশাহ বাধ্য হইয়া আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কামরানকে অন্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। (১) এই আদেশ প্রতিপালিত হইবার কয়েক দিন পরে তিনি চূর্তাগ্য রাজকুমারকে দেখিতে যান। তাঁহার আগমনবার্তা কামরানের স্রুতিগোচর হইলে তিনি গাত্রোথানপূর্বক

(১) কামরান তাঁহার নিকট উপনীত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা জাহোর-লিখিত বৃত্তান্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

‘The king however received him graciously, and pointed him to sit down on the bed on his right hand. • • • After sometime, His

তাহার সমীপবর্তী হইয়া বলেন, “এই দুর্ভাগ্যকে দেখিলে আপনার রাজসম্মানের লাবণ্য হইবে না ।” পাদশাহ ভ্রাতার দুর্দশা দেখিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই ; তাহার হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল ।”

হুমায়ূন যুৎসবভাব ও পরোপকারী ছিলেন, এ জন্যও তাহাকে অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে । তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী ও কাব্যপ্রিয় ছিলেন । তাহার ধনভাণ্ডার প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল । তিনি বুদ্ধিমান ও রসজ্ঞ ছিলেন । তাহার চরিত্রমাধুর্য্যে সকলেই প্রীতিলাভ করিত । হুমায়ূন যুদ্ধক্ষেত্রেও পরাক্রম ও উদ্যম প্রদর্শন করিতেন ; কিন্তু তাহার হৃদয় ক্ষমাশীল ছিল । বস্তুতঃ যদি তিনি তাদৃশ কোমল ও ধর্ম্মভীরু না হইতেন, তাহা হইলে সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন ।



Majesty called for a water melon, one third of which he took and divided with his brother. • • Preparation having been made for an entertainment the whole night was passed in jollity and carousing” ইহার চারিদিন পরে কামরানকে অন্ধ করিবার রাজাদেশ প্রচারিত হয় । এই আদেশ কামরানের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘তোমরা একবারে আমার জীবন বিনষ্ট কর, ইহাই বাঞ্ছনীয় ।’ রাজাদেশ প্রতিপালিত হইলে তিনি যত্না সহ করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, ‘হে প্রভো, আমি ইহজীবনে যে কিছু পাপাশু-ভ্রম করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইলাম ; পরকালে বেন তোমার করুণালাভ করিতে পারি ।’

আকবর শাহ ।



হুমায়ূনের মৃত্যুকালে আকবর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না ।
পঞ্জাবে সেকেন্দর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন ।

এই সময় তারদি বেগ নামক জনৈক সেনাপতি দিল্লীর শাসনকর্তার
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি পাদশাহের মৃত্যুসংবাদ শুণ্ড রাখিয়া
আকবরের অভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিলেন । আকবরের
নিকট এই দুঃসংবাদ পৌঁছিলে, সমবেত আমীর ওমরাহগণ পরলোকগত
সম্রাটের জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করিয়া একবাক্যে তাঁহাকে রাজপদে
অভিষিক্ত করিলেন । সচিবশ্রেষ্ঠ বৈরাম খাঁকে নবাভিষিক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক
সম্রাটের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে শাসনসংক্রান্ত
বাবতীর ক্ষমতা প্রদত্ত হইল ।

কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনের চতুর্পার্শ্বে তখন প্রবল বাত্যা । প্রত্যেক
বৃহৎই আশঙ্কা হইতেছিল যে, এই প্রবল বাত্যা ঐয়োদশবর্ষবয়স্ক
নবীন সম্রাটের মস্তক হইতে রাজ-মুকুট খসিয়া পড়িবে । রাজবিপ্লবে
শাসনশৃঙ্খলার মূল শিথিল হইয়া পড়াতে কাবুলরাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত
হইয়াছিল । সেকেন্দর শাহ হস্তচ্যুত সাম্রাজ্যের উদ্ধারার্থ পঞ্জাবে
আকবরের সঙ্গে বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন । এক্ষণ হুমায়ূনের মৃত্যুসংবাদ
শ্রবণ করিয়া নবোৎসাহে রণাঙ্গণে মোগলের শক্তিপরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প
করিলেন । বৈরাম খাঁর সাহায্যে আকবর যোগ্যতাসহকারে শত্রুদমন
করিতে লাগিলেন । কিন্তু শত্রুকুল নির্মূল করিবার পূর্বেই আর এক
জন পরাক্রান্ত শত্রু মোগল সাম্রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য রত্নভূমিতে

অবতীর্ণ হইলেন । মোহাম্মদ আদিলের সেনাপতি হিমু মোগলশক্তি পর্যুদন্ত করিবার জন্য আয়োজন সমাপ্ত করিয়া, ত্রিশ সহস্র রণনিপুণ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পথিমধ্যে আগ্রা হস্তগত করিয়া অবিলম্বে রাজধানীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন । নগররক্ষক তারদি বেগের অবহেলা ও হঠকারিতায় হিমু নগররক্ষী মোগল সৈন্যবৃন্দকে সহজে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়া নিজে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিলেন । শত্রু কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইবার সংবাদ যে সময় আকবরের নিকট পৌঁছিল, তখন অধিকাংশ প্রদেশই তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল ; কেবলমাত্র পঞ্চনদপ্রবাহবিধৌত ভূমির কিয়দংশে তাঁহার আধিপত্য অব্যাহত ছিল ।

আকবর হিমুর বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্য মন্ত্রিসভা আহ্বান করিলেন । সম্মেলিত ওমরাহগণ তাঁহাকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন । তাঁহারা বলিলেন, “শত্রুর সৈন্যসংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু তাহার গতিরোধের জন্য আমরা কেবলমাত্র বিংশতি সহস্র সৈন্য নিযুক্ত করিতে পারিব । এক্রপ অবস্থায় আমাদের কাবুলে গমন করাই কর্ত্তব্য । আমরা এই অল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যেই কাবুল সংরক্ষণ করিতে পারিব । তার পর সুযোগ উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করা সহজসাধ্য হইবে ।” একমাত্র বৈরাম খাঁ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া শত্রুর বলপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অগোণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন । বালক হইলেও আকবর বৈরামের এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিলেন । তিনি এমন ভাবে তদীয় মতের সমর্থন করিলেন যে, সমবেত সভ্যমণ্ডলী তাহাতে মুগ্ধ

হইয়া রাজকাৰ্য্যে ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । আকবর বৈরাম খাঁকে খানবাবা উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহারই হস্তে সমস্ত বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিলেন । বৈরামও তাঁহার পরিতোষের জন্য স্বীয় পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া পরলোকগত সম্রাটের প্রেতাশ্বার নামে শপথ করিলেন যে, তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না ।

ওমরাহগণ আকবরের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কাৰ্য্যে ধনপ্রাণ সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন । এমন সময় একপ একটি ঘটনা সংঘটিত হইল যে, তাহাতে ওমরাহগণ বুঝিতে পারিলেন, রাজাজ্ঞা-প্রতিপালন ব্যতীত তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই । সুতরাং ভয় ও মৈত্রীর প্রভাবে তাঁহারা সম্রাটের সঙ্গে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন । আমরা এখানে সেই ঘটনাটির বর্ণনা করিতেছি । হিমু কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইবার সময় তারদি বেগ খাঁ দিল্লীর শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাঁহার হঠকারিতাতেই দিল্লী অধিকার করা শত্রুর পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল । বৈরাম খাঁ ও তারদি বেগের মধ্যে সন্দেহ ছিল না । ধর্মবিষয়ক মতানৈক্যে নিবন্ধন তাঁহারা পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন । দিল্লী শত্রুহস্তে পতিত হইলে তারদি বেগ পক্ষাবে আকবরের শিবিরে আগমন করেন । বৈরাম খাঁ পূর্বোক্ত অপরাধে তাঁহাকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হন । একদা আকবর ক্রৌড়া উপলক্ষে শিবির হইতে বহির্গমন করিলে সেনাপতি তাঁহার চিরশত্রুর শিরশ্ছেদন করেন । যদিও বৈরাম খাঁর এই আচরণ একান্ত কঠোর ও নৃশংস বলিয়াই চিরকাল নিন্দিত হইবে, তথাপি ইহা সেই বিপদসঙ্কুল সময়ে সেনানায়কদিগকে কর্তব্যসাধনে বহুলপরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । (১)

(১) বদায়নি প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তাগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, আকবর এই

হিমু দিল্লীবিজয় সম্পন্ন করিয়া পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে সৈন্যে সমবেত হন । এই স্থানে তাঁহার সৈন্যের সহিত মোগলের যুদ্ধ উপস্থিত হইল । মোগল সামন্তগণ রাজকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে তারদী বেগের দশা প্রাপ্ত হইবেন বলিয়াই হউক, অথবা মহত্বেশে অনুপ্রাণিত হইয়াই হউক, প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । হিমু রণনিপুণ হস্তীর সাহায্যেই সংগ্রামক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার আশা করিয়াছিলেন । কিন্তু শত্রুসৈন্যের মধ্যভাগে উপনীত হইবামাত্র প্রতিপক্ষের অস্ত্রনিষ্ক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত হইয়া হস্তীগুলি ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং মারাত্মক অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চাৎগামী হইল । ইহাতে হিমুর সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল । তথাপি হিমু ভগ্নহৃদয় না হইয়া চারি সহস্র সৈন্য সহ বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । অবশেষে শত্রুর হস্তনিষ্কিপ্ত শরে তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল । তদীয় সৈন্যগণ এই আঘাতে হিমুর মৃত্যু অবধারিত বিবে-

হতাকার্য্যে সংলিপ্ত ছিলেন । তারদী বেগের সন্তান একান্ত চঞ্চল ছিল । তিনি কখনও বা হুমায়ূনের পক্ষ অবলম্বন করিতেন, কখনও বা তাঁহার ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সঙ্কচিত হইতেন না । হুমায়ূনের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিলেন । এ সময় আকবর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পিতৃবাপুত্র তথায় ছিলেন । এ অবস্থায় একমাত্র তারদী বেগের কোশলেই আকবর বিনা বিঘ্নে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । আবুল কছল নির্দেশ করিয়াছেন যে, একপ ব্যক্তির হত্যাকার্য্যে যে আকবরের মৃৎ প্রহরীমুভব সম্রাট সংলিপ্ত ছিলেন, তাহা সম্ভবপর নহে । সুবিধাত ইতিহাসবেত্তা মোহাম্মদ কাসিম কোরস্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, বৈরাম খাঁ এ বিষয়ে সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই । তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলে সেনাপতি বলেন, জাঁহাপনা, আমি আপনার বিনা অনুমতিতেই তারদী বেগকে বধ করিয়াছি ; জাঁহাপনা বড় দয়ালু, আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে ক্ষমা করিতেন । কিন্তু এই বিপদ-সঙ্কুল সময়ে কেহ রাজকার্য্যে অবহেলা করিলে সৈন্যমধ্যে শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য তাঁহাকে রাজকোষীর দ্বার কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা কর্তব্য । আকবর এইরূপ কঠোর শাস্তির উচিত্য অনুভব করেন, কিন্তু তাঁহার অমানুষিকতায় শিহরিয়া উঠেন ।

চমা করিয়া ভরবাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ হিমু তাঁর সহ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন, এবং তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসাধারণ বীরত্ব ও একাগ্রতাসহকারে শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি বিপুল বিক্রম প্রদর্শন করিয়া সৈন্যকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, এবং কুপাণহস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া ক্রমশঃ শত্রুসৈন্য মথন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । এমন সময় কুলী নামক একজন মোগল সেনানায়ক হিমুর ইচ্ছা-চালকের প্রাণনাশ করিবার জন্য বর্ষা উত্তোলন করিলেন ; মৃত্যু-ভরবাকুল মাহত আত্মজীবনরক্ষার জন্য হিমুকে দেখাইয়া দিল । কুলী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অশ্বারোহা সৈন্য দ্বারা বেঁটন করিয়া বন্দী করিলেন । বিজয়শ্রী মোগলের অঙ্কশায়িনী হইলেন ।

মোগল সৈন্য হিমুকে বন্দী করিয়া আকবরের শিবিরে আনয়ন করিল । তখন হিমুর অবস্থা একান্ত শোচনীয় ; আহত অঙ্গ হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাবহেতু তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল । আকবর বিজিত কাকেরকে স্বহস্তে বধ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য বৈরাম খাঁ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন । কিন্তু তিনি শিক্ষকের উপদেশমত তরবারি কোথোন্মুক্ত করিয়া তদ্বারা হিমুর মস্তক স্পর্শ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । বৈরাম খাঁ রোধকষায়িত-নেত্রে আকবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যে, অসময়ে দয়া প্রকাশই তাঁহার বংশের সমস্ত বিপদের মূল কারণ । তাহার পর তিনি স্বয়ং বিজিত বীরপুরুষের শিরশ্ছেদন করিলেন । হিমুর মস্তক কাবুলে ও তাঁহার দেহ দিল্লীর দারদেপে পঃস্থাপিত করিবার জন্ত প্রেরিত হইল ।

পাণিপথের যুদ্ধের অত্যন্তকাল পরেই কাবুল বিদ্রোহের শাস্তি হইল, এবং সেকেন্দর শাহের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত হইল । আকবর

বৈরাম শাহ সাহায্যে পত্ররক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে নিরাপদ হইলেন ।

যে মোগল সাম্রাজ্য উত্তরকালে বিশালতা, ধনগৌরব ও সামরিক বলে এসিরাখণ্ডের অন্ত্যন্ত সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, যাহার গৌরব-রবি প্রাচ্য আকাশ আলোকিত করিয়া সমগ্র জগতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, যাহার ঐশ্বর্যের স্বপ্নকাহিনীতে প্রলুব্ধ হইয়া বৈদেশিক বণিকগণ দলে দলে ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং যাহার সুখিঞ্চু শ্রামল ছায়াতলে ভারতবাসী বহুদিন সুখে কালযাপন করিয়াছিল, তাহা এই ভাবে হু চিত্ত হয়। হুচনাকালে ইহার অবস্থা কিরূপ ছিল, আমরা প্রথমতঃ সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিব; তাহার পর আকবর কোন্ সাধনায় তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইব ।

“ভারতের সিংহাসন মোগল পাঠানের পক্ষে এক প্রকার অতিশয়, কেহ কখনও অবিচ্ছিন্নভাবে বংশানুক্রমে বহুদিন বহুযুগ ধরিয়া ইহার উপর বিরাজ করিতে পারে নাই । প্রথম মোসলমান আক্রমণ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এ বিষয়ের জাজ্জল্যমান সাক্ষিস্বরূপে ইতিহাস আমাদের সম্মুখে বর্তমান । দাস বংশ গেল, খিলিজি গেল, পাঠানাদিকারের অস্তিত্ব নোপ হইল । শোণিতরেখা তীরে রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন মহাপ্রাবনের প্রচণ্ড স্রোত গুলি যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না । আবার নূতন কূলপ্রাবী তরঙ্গ উঠিল । চাষটাই সমরধেনুর অমূল্য প্রাপ্তির পরিত্যাগ করিয়া কৃপাণহস্তে কল-শস্ত্র-ধন-রত্ন-পূর্ণ কুবেরের লীলাক্ষেত্র প্রকৃতির প্রমোদকানন হিন্দুস্থানে পদার্পণ করিল । চাষটাই মোগল বাবর শাহ পাঠানবংশের অস্তিত্ব লোপ করিয়া আবার অতিশয় সিংহাসনে আসন দিচ্ছিলেন । বাবর গেলেন, হুমায়ুন আসিলেন । আবার শের শাহ প্রবলবল্লা উঠাইলেন । আবার

অভিশপ্ত সিংহাসনের আশ্রয় খসিয়া পড়িল ; ভারতে মোগলের শক্তি-বিকাশের শেষচ্ছটা পর্য্যন্ত মলিন হইয়া আসিল ; সে মলিনতা যে ইহজন্মে ঘুটিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না ।” (১)

মোগলশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া সের শাহ আফগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন । হুমায়ুন অশেষ যত্নগাভাগ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইলেন । কিন্তু সেরের উত্তরাধিকারিগণের অবিম্ব্যকারিতায় হিন্দুস্থান তাহাদের হস্ত হইতে স্থগিত হইল । হুমায়ুন পুনর্বার দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন । তাহার পর দুই দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই তিনি অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন ; হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক আকাশ মেঘের ঘোরঘটায় আচ্ছন্ন হইল । এমন সময়ে কিশোরবরষ আকবর কার্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন ।

আকবর শাহের অভ্যুদয়ের পূর্বে ভারতবর্ষের কোন মোসলমান বংশের রাজত্বই সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না । কিন্তু তৈমুর বংশের প্রতিষ্ঠিত রাজত্বই সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও নিরবলম্ব ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল । গজনি ও ষোরবংশীয় নৃপতিগণের স্বদেশ বিজিত রাজ্যের সংলগ্ন ছিল বলিয়া তাহারা বিপৎকালে স্বদেশ হইতে সাহায্যলাভ করিতেন । অন্যান্যবংশীয় অধিপতিগণের রাজত্বকালেও তাহাদের স্বদেশীয় বীরগণ দলে দলে ভারতবর্ষে ভাগ্য-পরীক্ষার্থ আগমন করিতেন বলিয়া তাহারাও সর্বদা জনবলে বলীয়ান থাকিতেন । বাবর পাদশাহ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি কাবুল দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া অধিবাসিগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের স্বদেশিক্রমে কিয়ৎপরিমাণে গৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু কামরানের অধীনে এদেশ হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াতে

আকবরের রাজ্যভাবকালে উহা তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিল । আফগান
বহুল ভারতীয় মোসলমানসমাজও মোগলবংশোদ্ভব কিশোরবরক সম্রা-
টের শত্রু বলিয়া পরিগণিত ছিল । ভারতবর্ষের প্রকৃতিপুঞ্জও মোগল
রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল না । বাবর পাদশাহ ভারতবর্ষে সিংহাসন
পাতিবার পর সর্বদা সন্ধি বিগ্রহেই নিরত ছিলেন, প্রকৃতিপুঞ্জের
মঙ্গলার্থ কোন বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার
করিতে পারেন নাই । তদীয় পুত্র হুমায়ুনও শাসনসৌকর্য্যার্থ কোন
অভিনব-প্রথার উদ্ভাবন করিয়া প্রজাসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে
পারেন নাই ; তাঁহার শাসনকালেও শাসনযন্ত্র ভারতবাসীদিগকে পূর্ববৎ
পিষ্ট করিয়াছিল । ভারতবাসী মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সঙ্গে
আপনাদের সুখ দুঃখ জড়িত বলিয়া বিবেচনা করিত না । এজন্য তাহারা
উহার স্থানিত্ব অথবা বিলোপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল । ভারত-
বর্ষের বহির্ভাগেও কোন শক্তিশালী জাতি আকবরের সঙ্গে ঐক্যমুখে
আবদ্ধ ছিল না ; অথবা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও প্রকৃতিপুঞ্জ, তাঁহার
বংশের প্রতি অমুরাগী ছিল না । কেবলমাত্র মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন
দেশের লুণ্ঠনলোলুপ যুদ্ধব্যবসায়িগণ তাঁহার অনুগামী ছিল । সম্রাট
নিজে কিশোরবরক, এবং তাঁহার সৈন্যদল আত্মপরায়ণ সৈন্তে পরিপূর্ণ
ছিল ; এরূপ অবস্থায় রাজ্যের স্থায়িত্বের আশা সুদূরপর্যন্ত হইবে,
তাহা বিচিত্র কি ? ইহাতেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিকূল অবস্থার অব-
সান নহে । আকবরের অভ্যুদয়ের পূর্বে বহুসংখ্যক মোসলমান রাজ-
বংশের বিলোপ হইয়াছিল ; এই সকল বংশের যথার্থ ও প্রত্যেক উভয়-
বিধ উত্তরাধিকারিগণে সমগ্র দেশ পরিপূর্ণ ছিল । তাঁহাদের মধ্যে
কেহ শক্তিশালী হইয়া উঠিলেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ
করিতেন, এবং বহুসংখ্যক লুণ্ঠনপ্রয়াসী সৈন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার

পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইত । এই সব কারণে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালিসন সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে, "Panipat had given Akbar India, — an empire without a root in the soil liable to be overthrown by the first strong gust."

তাদৃশ নিরবলম্ব দুর্বল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ববিধানই আকবরের সর্ব-প্রধান কার্য ছিল । বিধাতৃপুরুষও তাঁহাকে এই গুরুতর কার্যসম্পাদনের উপযোগী নানাবিধ সংগুণে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ।

আকবরের হৃদয় একাধারে পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও রমণী-সুলভ কোমলতায় সুগঠিত হইয়াছিল । কিশোরবয়স্ক আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন । হিন্দু-কুলোদ্ভব হিমু সিংহাসনের চতুর্দিকে তুমুল বাত্যা তুলেন, তাহাতে বালকের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িবার উপক্রম হয় । পিতৃ-সুহৃদ বৈরাম খাঁ অক্লান্ত যত্নে ও চেষ্টায় হিমুর বিবদস্ত উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আকবরের সন্নিধানে আনয়ন করেন । বৈরাম খাঁ শত্রুর শিরশ্ছেদন করিবার জন্য আকবরকে বারবার উত্তেজিত করেন । কিন্তু আকবর আপনার প্রধান অবলম্বন পিতৃতুলা সুহৃদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাদৃশ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না, এবং বৈরাম খাঁ সে জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি আপন সকল পরিত্যাগ করেন নাই ।

আকবর দিলাস-বিমুখ, কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন । "সমর-ক্ষেত্রের কোলাহলে ও কষ্টে তাঁহার যে আনন্দ ছিল, দিল্লী আগ্রার মন্দির-ময় রত্নমণ্ডিত রাজকক্ষেও সেই আনন্দ উপভোগ করিতেন । তিনি প্রতি-দিন দুই শত লোকের জন্য মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করাইতেন । নিজে কয়েক মুষ্টিমাত্র খাইয়া বাকী আগ্রা দুর্গের প্রাচীর পার্শ্বে সমবেত দরিদ্র-

দের ধরিয়া দিতেন।” (১) তাঁহার রাজত্বকালে একবার গুজরাটে বিদ্রোহ-
 তানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তাহাতে তাঁহার শক্তি ভস্মীভূত হইবার
 উপক্রম হয়। তখন বর্ষাকাল; পথঘাট একান্ত দুর্গম। সৈন্তরাঃ
 সৈন্তের অভিযান দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু আকবর স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা
 ও ক্ষিপ্রকারিতাবশে তথায় স্বয়ং উপনীত হইবার জন্ত সঙ্কল্প করেন,
 এবং তদভিমুখে যাত্রা করিয়া এত দ্রুতবেগে পথ অতিবাহিত করিয়া-
 ছিলেন যে, সেই দারুণ বর্ষায় আগ্রা পরিত্যাগ করিবার পর নবম দিবসে
 ত্রিশ সহস্র সৈন্ত সমভিবাহারে সার্ক চারি শত মাইল দূরবর্তী শত্রুর
 সম্মুখীন হন। আকবর কখনও কখনও ব্যাঘ্রামের জন্ত কষ্ট সহ্য করিয়া
 আনন্দ অনুভব করিতেন। একবার তিনি অশ্বপৃষ্ঠে একাদিক্রমে দুই দিন
 অতিবাহিত করিয়া এক শত দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্বক আজমীর
 হইতে দিল্লীতে আগমন করেন।

বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া আকবর কখনও আনন্দ অনুভব করেন নাই;
 কিন্তু আবশ্যকমত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্ত সর্বদা প্রস্তুত
 থাকিতেন। তাঁহার অলৌকিক শৌর্যবীর্যের কাহিনীতে ইতিহাসের
 পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ রহিয়াছে; তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি
 বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র সহজাত-সংস্কার-বশে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার
 জীবন বিপন্ন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু যুদ্ধ কখনও
 তাঁহার প্রিয় ছিল না। আকবরের বীরত্বকাহিনী রাজ্যের সর্বত্র
 প্রচারিত হইবার পর বিদ্রোহপ্রবণ সাম্রাজ্য শান্ত হইয়াছিল। সন্ধি-
 বিগ্রহে তিনি স্বয়ং কখনও দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত থাকিতেন না। সমর-
 ক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার অব্যবহিত পরেই আনুষ্ঠানিক অন্যান্য কার্যের

(১) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম সংখ্যা, ১৮৯৯।

আকবর সমস্ত দিবসাত্তিতে একাধিকবার আহার করিতেন না।

ভার সেনাপতিগণের হস্তে স্তম্ভ করিয়া পুনর্বার শাসন সংরক্ষণ কার্যে মনোনিবেশ করিবার নিমিত্ত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেন ।

আকবর ঞ্চাপরায়ণ শাসনকর্তা বলিয়া জনসমাজে পুজিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ঞ্চাপরায়ণতা দয়াধর্মবিবর্জিত ছিল না । আকবর অত্যন্ত সদাশয় ও কমানীল ছিলেন । মোহাম্মদ কাজিম ফেরিষ্টা নির্দেশ করিয়াছেন যে, কমানীধর্মের অনুষ্ঠানে তিনি কখনও কখনও শাসকের কর্তব্য বিষ্মত হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল, এই ক্ষুদ্র জনসাধারণ তাঁহার কমানীলতা দুর্বলতার ফল বলিয়া বিবেচনা করিত না, বরং সদাশয় শাসনকর্তা বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত । আকবর বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করিয়া প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিতেন, কখনও তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেন না । তাঁহার হৃদয় একান্ত কোমল ছিল ; পশুপক্ষীর যজ্ঞঘাতেও তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন । একদা তাঁহার পুল সেলিম একব্যক্তির সর্বাঙ্গ হইতে জীবদশায় ঢামড়া তুলিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন । আকবর এই আদেশের বিষয় অবগত হইয়া বলেন, “মৃত পশুর চর্ম তুলিবার দৃশ্যও আমাকে ব্যথিত করে । আমার পুল হইয়া সেলিম কিরূপে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করিয়াছে ।” যদিও আকবর নিতান্ত কোমলহৃদয় ছিলেন, তথাপি তিনি আবশ্যকমত কঠোর হস্তে ঞ্চাপ-দণ্ড পরিচালন করিতে পারিতেন ।

এই হিন্দুর দেশে সর্বতোমুখ প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে ঞ্চণের সর্বাঙ্গাঙ্গ অধিক প্রয়োজন, আকবর তাহাতেও ভূষিত ছিলেন । তাঁহার ধর্মমত উদার ছিল । তিনি কখনও পরধর্ম বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই । (১)

(১) আকবরের ধর্মমত কি প্রকার উন্নত ও উদার ছিল, তাহার প্রদর্শনার্থ,

আকবর একান্ত বন্ধুবৎস ছিলেন । সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট রাজপুরুষ-গণ তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন । (১) প্রীতির

কাশ্মীরের একটি মসজিদের গাত্রে উৎকীর্ণ করিবার জন্ত তদীয় প্রধান সহচর আবুল ফজল কর্তৃক রচিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।—

O God, in every temple I see people that see thee,
And in every language I hear spoken people praise thee.
Polytheism and Islam feel after thee.
Each religion says, "Thou art one, without equal."
If it be a mosque people murmur the holy prayer.
And if it be a Christian Church people ring the bell from
love to thee.
Sometimes frequent the Christian cloister, and some times to
the mosque.
But it is thou I seek from temple to temple.
Thy elect have no dealings with heresy or with orthodoxy.
For neither of them stands behind the scene of thy truth.
Heresy to the heretic, and religion to the orthodox,
But the dust of the rose-petal belongs to the heart of the
perfume seller.

(১) আবুল ফজল ও কৈজী, বীরবল সম্রাটের সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব ছিলেন । বীর-বল পাদশাহের কার্যে শত্রুহন্তে জীবনবিসর্জন করেন ; কৈজী আজীবন আকবরের কার্যে রত থাকিয়া লোকান্তরিত হইলেন, এবং আবুল ফজল সেনিমের ষড়যন্ত্রে বিদেশে নিহত হন । এই মিত্রত্রয় একে একে আকবরের জীবদ্দশাতেই কালগ্রাসে পতিত হন । পাদশাহ মুহুৎ-লোকে অভ্যস্ত মুহুমান হইয়াছিলেন । আমরা সে বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—“In the course of action for subduing the Yousufies, Akbar's greatest personal friend Raja Birbal died owing to the rashness of Zein Khan, the general. Akbar refused to see Zein Khan, and was long inconsolable for the death of Birbal. As the Raja's body was never found, a report gained currency that he was alive amongst the prisoners and it was so much encouraged by Akbar, that a long time afterwards an impostor appeared in his name. As this second Birbal died before he reached the Court

আম্পদ সম্রাটের কার্যে প্রাণপাত করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না । আকবর প্রভুভক্ত, বিশ্বস্ত ও কৰ্ম্মঠ অমাত্যবর্গ লাভ করিয়াছিলেন ; এ বিষয়ে ভারতীয় আর কোন মোসলমান নরপতিই তাঁহার স্তায় সোভাগাশালী ছিলেন না ।

আকবর স্বভাবতঃ শাসন সংরক্ষণ কার্যের অমুরাগী ছিলেন, এবং রাজ্যকার্য নির্বাহ করিয়া যথার্থ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন । কর্তব্য সাধনে আকবরের অসাধারণ প্রীতি ছিল । তিনি কর্তব্যপালন ঈশ্বরোপাসনার তুল্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন । আকবর কর্তব্যসাধন জন্ত সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করিতেন । আমরা “ধর্ম্মতত্ত্ব” নামক পাশ্চিক পত্র হইতে তাঁহার দৈনিক কার্য-প্রণালীর বিবরণ সংকলন করিয়া দিতেছি ।

Akbar was again mourning”—*Elphinstone's History of India*. “Faizi died 5th October 1595, barking like a dog according to the austere Badauni,—but really weak and speechless. Akbar saw him at midnight ; supporting his friend's head he said gently, “Shekaji ! here is a Doctor, will you not speak to me ?” One fancies the faint look of the closing eye, but no words escaped the lips, the emperor threw his head-dress on the ground and wept aloud.”—*Keen's The Turks in India*. “When the news of that dire calamity and dreadful event (murder of Abul Fazl) reached that shadow of God, the Emperor Akbar, he was extremely grieved, disconsolate, distressed, and full of lamentation. That day and night he neither shaved as usual, nor took opium, but spent his time in weeping and lamenting.” *Wakayai-Asad Beg*. বুদ্ধেলখানের অন্তর্গত বোচ্ছার রাজা নরসিংহ, কোন কোন মতে বীরসিংহ, [জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবনবৃত্তে নরসিংহ লিখিয়াছেন] বে সেলিমের প্ররোচনায় আবুল ফজলকে হত্যা করেন, তাহা পাদশাহ আকবর অবগত ছিলেন না । তিনি বন্ধু-হত্যাকে শাস্তি দিবার জন্য সেলিমকে প্রেরণ করেন । নরসিংহের পলায়ন করাতে তাঁহার রাজ্য মোগলেন হস্তগত হয় । সম্রাট ইহার পর অত্যন্তকাল জীবিত ছিলেন ; এই জন্ত নরসিংহ নিষ্ঠুরতাভ করেন ।

আকবর দিবাভাগে কিয়ৎক্ষণ এবং রাত্ৰিকালে অল্পক্ষণ নিজার অতি-
 বাহিত করিতেন । তাঁহার অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করি-
 বার অভ্যাস ছিল । তিনি প্রাতঃকালীন উপাসনাস্থে রাজদর্শনপ্রার্থী
 সৈনিক, বণিক, কৃষক, পণ্যজীবী ও সাধারণ প্রজাদিগকে লইয়া দরবার
 করিতেন । দরবার ভঙ্গ হইলে অন্তঃপুরে গমন করিবার নিয়ম ছিল ।
 তৎসময় ধর্ম ও সংসার সম্বন্ধীয় বহুকার্য্যে অতিবাহিত হইত । এই
 সকল কার্য্য শেষ হইলে তিনি কিয়ৎক্ষণের জন্য নির্জনকক্ষে বিশ্রাম
 করিতেন । প্রতিদিন অপরাহ্নে বা সন্ধ্যাহ্নে দ্বিতীয় বার দরবার করিবার
 নিয়ম ছিল । এই দরবারে রাজকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত হইয়া রাজ্য-
 শাসন সম্পর্কে বিবিধ বিষয়ে আদেশ প্রার্থনা করিতেন । “নিশা জাগরণ
 এই জাগ্রদ্বনা সম্রাটের প্রকৃতিসিদ্ধ” ছিল । রাত্ৰিকালে তত্ত্বদর্শী
 ব্যক্তিগণের সভা হইত । তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া বিবিধ বিদ্যার
 আলোচনা করিতেন । অনেক সময় রজনীযোগে রাজ্য ও রাজত্ব
 সম্বন্ধীয় নিগূঢ় বিষয়ে মন্তব্য হইত । বিদ্যালোচনা অথবা রাজকার্য্য
 শেষ করিতে রাত্ৰি সুগভীর হইয়া উঠিত, একঘাম মাত্র অবশিষ্ট
 থাকিত । তখন নানা প্রদেশের গায়ক ও বাদকগণ সমাগত হইয়া
 ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক পাদশাহের মনোরঞ্জন করিতেন । “চারি
 দ ও রাত্ৰি অবশিষ্ট থাকিতে সম্রাট মৌনাবলম্বন করিয়া প্রেমের নিভৃত
 কুটারে অন্তর্বহি সমভাবাপন্ন করিয়া স্থিতি *• এবং তৎসাগরে সন্তরণ”
 করিতেন ।

আকবরের রাজনীতি উৎকৃষ্ট ছিল । আমরা “ধর্ম্মতত্ত্ব” হইতে তাঁহার
 নীতির উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি । “অসত্যাচরণ সকলের পক্ষে গর্হিত,
 বিশেষতঃ রাজার পক্ষে অতিশয় গর্হিত । এই সকল লোককে ঈশ্বরের
 ছায়াবলে, ছায়া সরল থাকিবে । চারিটি কার্য্য হইতে রাজা নিবৃত্ত

থাকিবেন, অধিক যুগলা, নিরন্তর ক্রীড়ামোদ, দিবা রজনী মত্ততা, স্বীলোকের সঙ্গে সমধিক ঘনিষ্ঠতা ।”

আকবরের রাজ্যোচিত গুণগ্রাম কিরূপে অসাধারণ ছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম । আকবর যে সকল কারণের সমবাহে তাদৃশ মানসিক বৈভবের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনার যোগ্য । প্রধানতঃ, দুইটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে । প্রথম, আকবরের পূর্বপুরুষগণের শৌর্য বীৰ্য, জ্ঞানানুরাগ ও মহত্ব তাঁহাতে উত্তরাধিকারক্রমে অর্পিত হইয়াছিল ; দ্বিতীয়, তিনি নিজেও সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

তৈমুর বংশীয় নরপতিগণ সাধারণতঃ পাঠক সমাজে বিচক্ষণ শাসন-কর্তা এবং বীরবাহু যোদ্ধা বলিয়াই প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানানুরাগ এবং প্রজাহিতৈষণাও নিরতিশয় প্রবল ছিল । পৃথিবীর অল্পসংখ্যক নরপতিই তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞানলিপ্সু ও পণ্ডিত মণ্ডলীর উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন । তৈমুরলঙ্গ সমরকন্দ ও বোখারায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎসমুদায়ের পরিচালনার্থ প্রচুর ধন ন্যস্ত করেন । উত্তরকালে এই দুই স্থান মোসলমান জগতের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল । তৈমুরলঙ্গই তাদৃশ উন্নতির সূত্রপাত করেন । তাঁহার আদেশে বা উদাসীন্যে দেশবিজয় অস্ত্র সহস্র সহস্র নির্দোষ নরনারীর রক্তে বসুধা কলঙ্কিত হইত । কিন্তু তিনি বিদ্বজ্জনের প্রাণরক্ষার জন্য সর্বদা যত্নবীল থাকিতেন । একবার মহাকবি হাফেজ তাঁহাকে কটুকথা কহেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার অপূর্ব কবিত্ব মুগ্ধ ছিলেন বলিয়া সে অপরাধ মাৰ্জনা পূর্বক তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন । পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহচর্য্যই তৈমুরের সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর ছিল ।

তৈমুরের উত্তরাধিকারীগণ সুবিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রবল জ্ঞানানুরাগও লাভ করেন। তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহরুখ পিতার ন্যায় শৌর্য্য বীৰ্য্যশালী ও জ্ঞানলিপ্সু ছিলেন। কিন্তু তিনি ন্যায়নিষ্ঠা ও দয়া ধর্মের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দেশ বিজয়জনিত গৌরবলাভ তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষা ও সমৃদ্ধি বিস্তার করিবার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

শাহরুখ স্বীয় পুত্র উলুগবেগকে তুর্কিস্থানের শাসনভার অর্পণ করিবার সময় বলেন, “বৎস, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আত্মসুখের জন্য আমাদেরকে ক্ষমতাশালী করেন নাই। হুঃহু ব্যক্তিদের কষ্টমোচন জন্য নিরত হওয়া আবশ্যক; ইহাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা। প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায়। * * * বিচারকগণ যাহাতে স্ব স্ব পদমর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ন্যায়বিচার করেন, তজ্জন্য মনোযোগী হইও। বিশেষভাবে কৃষককুলকে রক্ষা করিও, তাহাদিগকে রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মচারিগণের উৎপীড়ন ও অর্থলোলসা হইতে রক্ষা করিতে যত্নশীল থাকিও।”

তৈমুরের বীরত্ব ও জ্ঞানানুরাগ এবং শাহরুকের মহত্ব ও প্রজাহিতৈষণা পরবর্তী নরপতিগণের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হইত। তৈমুরের অন্যতম প্রপৌত্রের নাম আবুসৈয়দ; আবুল ফজল তাঁহাকে ধর্মপরায়ণ নরপতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তদীয় পুত্র ওমর শেখ মিরজা ন্যায়পরায়ণ বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন। ওমরের পুত্র বাবর অতুল শৌর্য্যবীৰ্য্য, প্রবল জ্ঞানানুরাগ ও নির্মল মহত্বের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

হুমায়ুনও পিতার ন্যায় মানসিক গুণরাজির অধিকারী ছিলেন। তিনি ঘোর বিপদের সম্মুখে কবি, লেখক ও পণ্ডিতগণে পরিবেষ্টিত

ধাক্কিতেন । অন্ধ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল । তাঁহার মূবহৎ গ্রন্থালয় তাঁহার জ্ঞানপিপাসার সাক্ষ্যদান করিত ।

কিন্তু তাহুশ মানসিক গুণরাজির অমুরূপ রাজনীতিজ্ঞতা ও শাসন-
কুশলতা তাঁহার ছিল না। একারণ তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বিধির
বিড়ম্বনার নানাস্থানে ঘূর্ণিত হইতে থাকেন। এই সময় তদীয় কনিষ্ঠ
ভ্রাতা হিন্দালের শিককের রূপসী কন্যা হামিদা বানু তাঁহার দৃষ্টিপথে
পতিত হন। সে অতুল রূপরাশি সন্দর্শনের প্রথম মুহূর্তেই হুমায়ূন
একবারে বিমোহিত হইয়া পড়েন, এবং হিন্দালের আপত্তি সত্ত্বেও
তাঁহাকে অচিরে অঙ্কলক্ষ্য করেন। এই বিবাহের সুমধুরফল আকবর।
হুমায়ূন স্মৃতি ছিলেন। হামিদা শিয়া মতাবলম্বিনী ছিলেন। পরস্পর
বিরোধী স্মৃতি এবং শিয়ামত সম্মিলিত হইয়া যে ফলপ্রসব করে,
তাঁহাকে বৃত্তিমান ওদার্য্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

আকবর যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন হুমায়ূনের চতুর্দিকে বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিপদের যুগাবর্ত্তে পতিত হইয়া আকবর সার্কি এক বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতামাতার মেহ-কোমল আশ্রয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন। পিতৃবৈরী পিতৃব্য কামরান তাঁহাকে হস্তগত করেন। আকবরের শৈশবকাল তাঁহার বিদেশ-কঠোর আশ্রয়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। এখানে তিনি বহু ক্লেশ ও দুর্গতির মধ্যে বর্জিত হন; অনেকবার তাঁহার জীবন বিপদসঙ্কুল হইয়াছিল। আকবর কিছুদধিক সপ্ত বর্ষকাল পধ্যস্ত অশেষ কষ্টভোগ করেন এবং পুনঃ পুনঃ নানাক্রম বিপদে পতিত হন। ফলতঃ, তাঁহার শৈশবকালে সুখেখর্ব্যের ক্রোড়ে অতিবাহিত হইয়াছিল না; ধনমদ ও চাটুবাদ তাঁহার চিত্তকে মলিন করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হয় নাই। আকবর

নামা প্রতিকূলবশ্যে লালিত পালিত হইয়া বর্ষাধৌত বিকট পন্থের
ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া উঠেন ।

ঐতিহাসিক নিজাম উদ্দীন আহম্মদ লিখিয়াছেন যে, তৈমুর বংশের
প্রথামুসারে চারি বৎসর চারি মাস, চারি দিন বয়ঃক্রম কালে আকবরের
বিদ্যারম্ভ হয় । শুভক্ষণে তাঁহার “হাতে খড়ি” হইবার কথা ছিল । কিন্তু
শুভক্ষণ সমাগত হইলে তিনি বালমূলভ চপলতাবশতঃ লুপ্তায়িত হন ;
তাঁহাকে বহু অনুসন্ধানেও সময় মত পাওয়া যায় না । একারণ তাঁহার
বিদ্যাভ্যাস সম্ভাবজনক হইবে না বলিয়া সকলের বিশ্বাস জন্মে ।
মোলানা আজাম উদ্দীন তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে নিযুক্ত হন ।
আজাম উদ্দীনের ক্ষিদানের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয় । তখন তৎপদে
মোলানা বায়েজিদকে নিযুক্ত করা হয় । ইহার কিছুদিন পরে মুনিমখাঁ
রাজশিক্ষক নিযুক্ত হন । মুনিম খাঁ রাজকুমারকে রাজকাৰ্য্য নির্বাহো-
পযোগিনী শিক্ষাপ্রদান করেন । এই সময় তিনি অশ্ব আরোহণ এবং
বিবিধ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন ।

হুমায়ূনের পরলোকগমনের পর বৈরাম খাঁ আকবরের অভিভাবক
নিযুক্ত হন । বৈরাম খাঁ তাঁহাকে রাজকাৰ্য্য নির্বাহোপযোগিনী শিক্ষা-
দানের ব্যবস্থা করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলেন না ; তিনি তাঁহার মানসিক
উৎকর্ষ সাধন জন্যও সমুচিত বন্দোবস্ত করেন । বৈরাম খাঁ নিজে
জ্ঞানামুরাগী ছিলেন । তিনিও তাঁহার স্বর্গগত প্রভু হুমায়ূনের ন্যায়
সর্বক্ষণ পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিতে ভাল বাসিতেন । তাঁহার
প্রতিনিধিত্বের সময় দিল্লীর রাজদরবার চতুঃপার্শ্ববর্তী দেশসমূহের
বিষয়জ্ঞানে পূর্ণ থাকিত । বৈরাম খাঁ এই পণ্ডিতশ্রেণী হইতে সর্বিশেষ
বিবেচনাপূর্বক মির আকুল লতিফকে রাজশিক্ষকের পদে নিযুক্ত
করিয়াছিলেন । আকুল লতিফ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন । তিনি

কোন কারণে তদ্রত্য অধিপতির বিষদৃষ্টিতে পতিত হন । এজন্য তিনি দিল্লীর দরবারে আশ্রয়প্রার্থনা করেন । গুণগ্রাহী হুমায়ুন তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন । তদনুসারে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন । তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পরেই হুমায়ুন পরলোকগত হইলেন । তার পর বৈরাম খাঁ তাঁহাকে নবীন সম্রাটের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন । এই সর্ববিদ্যাবিশারদ শিক্ষকের নিকট আকবর তৎপরচিত্তে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন । তিনি প্রহেলিকাপূর্ণ গল্পগুলি পাঠ করিয়া অপরিমিত আনন্দ অনুভব করিতেন । এই সময় তিনি হাফেজের সুমধুর পদাবলী কণ্ঠস্থ করেন । প্রথম শিক্ষাই মনুষ্যের হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে । এজন্য সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আকবর উত্তরকালে যে অসাধারণ সমদর্শিতা ও মনোবিতার পরিচয় দেন, তাহার মূল তিনি আদুল লতিফের সমীপেই প্রাপ্ত হন । আদুল লতিফ মহামতি ছিলেন, “সর্বত্র শাস্তি স্থাপন” তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল । তাঁহার ধর্মমত একরূপ সংযত ও উদার ছিল যে, পারস্যের অধিবাসীরা তাঁহাকে সূন্নি ও হিন্দুস্থানের মোসলমানেরা তাঁহাকে শিয়া বলিয়া মনে করিত । কিন্তু তিনি সূন্নি কিংবা শিয়া, কোন মতাবলম্বীই ছিলেন না । তাঁহার তেজস্বিনী প্রকৃতি কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না । আদুল লতিফ সর্ববিধ সাম্প্রদায়িক বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইচ্ছিয় বিকার নির্মুক্তবিবেকবাণীকেই স্বীয় জীবনের নিয়ামক করিয়াছিলেন । তাঁহার মহোচ্চ উপদেশ সমূহ উর্বর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল ; আকবর স্বভাবতঃ জ্ঞানার্জনে অতুরাগী ছিলেন, এবং সংসদে বাস নিবন্ধন তাঁহার সে জ্ঞানস্পৃহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।

ফলতঃ আকবর কি বংশগৌরব, কি শৌর্যবীৰ্য্য, কি সুলিকা ও

মহত্ব, সর্ব প্রকারেই ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার ও মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজত্বের প্রথম ভাগেই এবিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।

আকবর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় বৈরাম খাঁ রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। তিনি আকবরের নামে শাসনকার্য্য নির্বাহ করিতেন। তদানীন্তন শাসন-প্রণালী বৈরাম খাঁর মতানুগত ছিল; পাদশাহের সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

আকবর আশৈশব বৈরাম খাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে বর্জিত হন। বৈরামের অসীম রণনৈপুণ্য ও অক্লান্ত উদ্যমের বলেই আফগানের গ্রাস হইতে মোগল সাম্রাজ্যের উদ্ধার হইয়াছিল। এ জন্য পাদশাহ তাঁহাকে খানবাবা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁ দীর্ঘকাল পাদশাহের সহিত স্নেহমুত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। আবুলফজল নির্দেশ করিয়াছেন যে, বৈরাম প্রথমতঃ নির্মলচরিত্র ও লোকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু প্রভূত ক্ষমতানাভের সঙ্গে সঙ্গে তোষামোদজীবীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কুরস্বভাব ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন।

একদা আকবর হস্তীর ক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া বৈরাম খাঁর পট্টাবাসে প্রবেশপূর্বক নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটায়, এবং তাহাতে বৈরাম খাঁর জীবন সংশয়াপন্ন হয়। এই ঘটনা তাঁহার প্রাণনাশের বড়যন্ত্র, এইরূপ সন্দেহ করিয়া, তিনি হস্তী-চালকের প্রাণদণ্ড বিধান করেন। কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্তিলাভ না করিয়া কয় দিন পাদশাহের সঙ্গেও অসদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বৈরাম খাঁ একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুরুষকে অতি লঘু অপরাধে নিহত

করেন । পাদশাহের অশ্রুতর শিক্ষক মীর মোহাম্মদও তাঁহার হস্তে প্রাণ হারাইতেছিলেন, কিন্তু অল্পের জন্য পরিত্রাণলাভ করিয়া রাজধানী হইতে নির্বাসিত হন । সন্দিগ্ধচিত্ত বৈরাম খাঁর সন্ধেহের ফলে পাদশাহের অশ্রুতরগণও সর্বদা নিগৃহীত হইতেন । এই সকল কারণে রাজদরবারে তাঁহার শত্রুসংখ্যা অল্প ছিল না । পাদশাহ নিজেরও তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হন । শত্রু-দল বৈরামকে অপদস্থ করিবার জন্য পাদশাহকে সর্বদা উত্তেজিত করিত । বৈরাম খাঁ রাজনীতি-বিশারদ কার্যাপটু মন্ত্রী ছিলেন ; পাদশাহ মন্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তদীয় সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিতেন । পাদশাহ স্বীয় খাজী মাহমুদ আক্কার একান্ত অহুরক্ত ছিলেন ; তিনিও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পাদশাহকে উত্তেজিত করিবার জন্য যত্নবতী ছিলেন । অবশেষে আকবরও বৈরামের ক্ষমতা লুপ্ত করিবার প্রয়াসী হন । আকবর জানিতেন, হুরাকাজক বৈরাম খাঁর হস্তে আংশিক ক্ষমতা থাকিলেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিবেন না । সুতরাং তাঁহাকে অপদস্থ করিতে হইলে তাঁহার সমগ্র ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে হইবে । এই জন্য তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এরূপ কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যে, পাদশাহ আর নীরব থাকিতে না পারিয়া স্বহস্তে শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্যের ভার গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে আদেশ-লিপি প্রচারিত করিলেন । (১)

(১) এই সময় আকবর দিল্লীতে এবং বৈরাম খাঁ আগ্রাতে অবস্থান করিতেছিলেন । পাদশাহ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া খানখানাকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন :—
 “As I was fully assured of your honesty and fidelity, I left all important affairs of State to your charge and thought only of my pleasures. I have now determined to take the reins of the government into my own hands, and it is desirable that you should now

এই আদেশ-লিপি প্রচারিত হইলে বৈরাম খাঁ দেখিলেন যে, তিনি ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন, এবং পাদশাহ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পূর্বেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সমস্ত পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছেন। এ জন্ত তিনি মক্কা অভিযুখে যাত্রা করিবার উদ্দেশে নাগরে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া পাদশাহের অনুকূল আদেশের আশায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাদশাহ পুনরাহ্বানের পরিবর্তে তাঁহাকে অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাইবার জন্ত পীর মোহাম্মদকে সসৈন্তে প্রেরণ করিলেন। এইরূপ রূঢ় ব্যবহারে খান-খানান নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু অচিরে পরাজিত হইয়া অন্ততপ্তচিত্তে তাঁহার নিকট ক্ষমাতিক্ষা চাহিলেন। খানখানান সাম্রাজ্যের সঙ্কটকালে তাঁহার স্বার্থ যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা পাদশাহের স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইল। তিনি তাঁহাকে মাগুস্ত করিয়া রাজদরবারে আনয়ন করিবার জন্ত দূত প্রেরণ করিলেন। বৈরাম খাঁ রাজদরবারে উপনীত হইয়া গলদেশে পাগড়ী বন্ধন পূর্ব্বক বাম্পাকুললোচনে সিংহাসনতলে পতিত হইলেন। পাদশাহ হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া ওমরাহ-শ্রেণীর শীর্ষস্থানে উপবেশন করাইলেন; তাহার পর তাঁহার আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্ত মূল্যবান খেলাং প্রদান করিয়া বলিলেন, “যদি খানখানান সামরিক জীবন প্রিয় বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কালী ও চিনদেরীর শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিতে পারি; সেখানে তিনি আপনার প্রতিভার সম্যক্ অন্বেষণ করিতে পারিবেন। আর যদি তিনি রাজদরবারেই

make the pilgrimage to Mecca upon which you have been so long intent. A suitable jagir out of the pergunas of Hindustan shall be assigned to your maintenance, the revenue of which shall be transmitted to you by your agent.”—*Tabakt-i-Akbari*.

মোহন যন্ত্রে সম্মিলনস্থলে গ্রথিত করিয়া এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে মনন করিলেন । তিনি প্রতিভা বলে দেখিতে পাইলেন যে, এই সার্বভৌম সাম্রাজ্যের কর্ণধার ভারতবর্ষের হিন্দু নরপতি ও প্রজাগণ কর্তৃক কেবলমাত্র অধিনেতৃত্বপে গৃহীত হইলেই অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না, তাঁহাকে ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া জাতীয় অধিনেতার ত্রায় প্রতীকমান হইতে হইবে । ইহা একান্ত দুর্লভ সমস্তা । বিগত সার্ক তিন শতাব্দীর মোসলমান নরপতিগণ কখনও এ দিকে মনোনিবেশ করেন নাই । তাঁহারা সামরিক বলেই ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছেন, এবং তাহার ভ্রাসবৃত্তিতেই বারংবার রাজবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে ।

আকবর প্রথমতঃ খণ্ডরাজ্যসমূহ জয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্র করিতে সক্ষম করিলেন । তিনি এ জন্ত বহুলপরিমাণে হিন্দুর বাহুবল প্রয়োগ করিয়া কার্যোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । রাজ্যভয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজতত্ত্ব ও প্রকৃতিগুণের মঙ্গলবিধায়ক বিধানসমূহ প্রবর্তিত হইতে লাগিল । বিপদে অকৃত্রিম বন্ধু, বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে উদ্ধার-কর্তা, জাতীয় ভাব ও আচার ব্যবহারের মর্যাদারক্ষক, জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতিপালক এবং হিন্দু-মোসলমান-সমাকীর্ণ দেশে অপক্ষপাতী বিচারকর্তা ও সমবিধির প্রবর্তক-রূপে, কি রাজা কি প্রজা, সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাজন হইবার কল্পনাতেই তিনি এইরূপ নীতি অবলম্বন করিলেন ।

আকবর উজবেগ, আফগান, হিন্দু, পার্সী ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন-জাতীয় যোদ্ধাদিগকে সমরবিভাগে গুণানুসারে নিযুক্ত করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । আকবর আপনার সেনাপতিবর্গকে বিজিত শত্রুর স্ত্রী পুত্র কন্যাাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত অথবা দাসবিপণীতে

বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন, বহু অর্থাগমের পপস্বরূপ যাত্রিকর তুলিয়া দিলেন, হিন্দুর পক্ষে একান্ত ঘৃণ্য ও অপমানজনক জিজিয়া রহিত করিলেন, এবং গোহত্যাহার্যের জন্ত সচেষ্ট হইলেন। অবশেষে তিনি রাজপুত রাজত্ববৃন্দের সহিত দুশ্শেণ্য পরিণয়বন্ধন সংস্থাপন করিয়া তাঁহা-দিগকে মোগল সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিলেন। (১) ফলতঃ, আকবর বাহুবলে ও কৌশলে রাজ্যের পর রাজ্য বশীভূত করিয়া বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে একচ্ছত্র করিলেন।

(১) ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে আকবরই হিন্দুধর্মকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম হিন্দু পত্নী জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্লের কন্যা ছিলেন। আকবরের আর এক হিন্দু পত্নী ছিলেন, তিনি ঘোষণাপুরাধিপতির কন্যা। ঘোষণাপুরী বেগমের পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্লের পৌত্রিকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। মহাস্বা টড্ নির্দেশ করিয়াছেন যে, জয়পুরের রাজবংশ বিহারী মল্লের পৌত্রীর বিবাহের পূর্বে মোগলের সঙ্গে বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। কিন্তু আকবরের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা নিজাম উদ্দীন আহম্মদ নির্দেশ করিয়াছেন যে, জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্ল তাঁহার হস্তে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। আকবরের সর্বসমেত আট ধর্মপত্নী ছিলেন। আমরা এখানে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি।

১ম। সুলতানা রাকিয়া বেগম।—ইনি মিরজা হিন্দালের কন্যা।

২য়। সুলতানা সালিমা বেগম।—ইহার কবিত্বশক্তি ছিল। ইনি প্রথমতঃ দৈরাম ধীর সহিত পরিণীতা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আকবর ইহাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইনি বাবরের দৌহিত্রী।

৩য়। জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্লের কন্যা।

৪র্থ। আবদুল্লাহমীর রূপবতী পত্নী।

৫ম। ঘোষণাপুরের মহারাজের কন্যা।

৬ষ্ঠ। বিবি দৌলদশাদ।

৭ম। আবদুল্লা মোগলের কন্যা।

৮ম। খানেশ প্রদেশের মবারক শাহের কন্যা।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহুসংখ্যক উপপত্নী ছিল। একবার নওরোজার সময় তিনি কামবিস্তল হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ফলতঃ, সর্বগুণালঙ্কৃত আকবর ইচ্ছিতদোষবর্জিত হইতে পারেন নাই।

অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও আমাদের বংশের উপকারী বন্ধু রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবেন না । যদি তিনি ধর্মার্থ মকাম তীর্থযাত্রা করিবার মানস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদোচিত সম্মানসহকারে তথায় পহুঁছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা যাইবে ।” খানখানান উত্তর করিলেন, “আমার প্রতি পাদশাহের প্রীতি ও বিশ্বাসের অবশ্যই হ্রাস হইয়াছে । আমি আর কখনও পূর্ববৎ রাজার প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাজন হইতে পারিব না । এ অবস্থার কেন আমি রাজসকাশে অবস্থান করিব ? রাজকৃপাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ; কুমাই আমার পূর্বরাজসেবার যথোচিত পুরস্কার । দুর্ভাগ্য বৈরাম খাঁ ইহ-সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পারত্রিক মঙ্গলের কামনার নিরত ও মক্কার পথের পথিক হইবে ।” অতঃপর বৈরাম সমুদ্রকূলাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পথিমধ্যে একজন আফগানের হস্তে নিহত হন । এই আফগানের পিতা খানখানানের হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জন করিয়াছিল । আকবর সিংহাসনারোহণের পঞ্চম বৎসরে স্বহস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলেন ।

অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক এক জন তরুণ যুবককে দিল্লীর সর্বম্বর কর্তা দেখিয়া ছুরাকাক্ষ মোগল রাজপুরুষগণ রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডান করিয়া আকবরকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন । প্রথমতঃ শের-বংশীয় শেব নরপতি আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শেরশাহ সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া আকবরের বিরুদ্ধে উদ্ভিত হইলেন । আকবরের নিয়োগক্রমে সেনাপতি জয়ান খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন । কিন্তু জয়ান খাঁ তরুণবয়স্ক প্রভুকে তুচ্ছ করিয়া লুপ্তিত্র্যব্যের রাজভাগ আত্মসাৎ করিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন হইবার প্রয়াসী হইলেন । আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন । তখন জয়ান খাঁ অনন্তোপায় হইয়া বশতা স্বীকার করিলেন ।

এই সময় আফগানগণ মালব দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন । আকবর মালব দেশ হইতে আফগানদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য সেনাপতি আদম খাঁকে নিযুক্ত করিলেন । আদম খাঁ স্বকায়সাধন করিয়া আকবরের বশুতাপাশ ছিন্ন করিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন হইলেন । আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য নিজে মালব দেশে যাত্রা করিলেন । আদম খাঁ রাজসৈন্তের গতিরোধ করিতে না পারিয়া বশুতা স্বীকার পূর্বক ক্ষমালাভ করিলেন ; কিন্তু পাদশাহের ক্ষমাশ্রুতি অতি সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন বলিয়া আপনার চরিত্র সংশোধিত করিলেন না । তিনি ক্ষমালাভ করিবার পর রাজধানীতে উপস্থিত হন । এই স্থানে উজ্জীরের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয় । একদা উজ্জীর পাদশাহের কক্ষপার্শ্বে উপাসনায় নিরত ছিলেন, এমন সময় আদম খাঁ অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন । পাদশাহ এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাসাদের উপর হইতে হত্যাকারীকে ঘমুনাগর্ভে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করেন । আদম খাঁর পর পাদশাহের অন্ততর শিক্ষক পীর মোহাম্মদ মালবের শাসনভার প্রাপ্ত হন ; কিন্তু তাঁহার শাসনকালে তথায় নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয় । সুতরাং অচিরে শাস্তিহাপনের অভিপ্রায়ে আকবর তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন ।

ইহার পরেই নাগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল । আবদুল মালি ও সেরফ উদ্দীন নামক দুই জন সামন্ত বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । কিন্তু অবিলম্বে আকবরের আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাঁহারা কাবুলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ।

পীর মোহাম্মদের পদচ্যুতির পর পাদশাহ উজবেগ-বংশোদ্ভব আবদুল্লা খাঁকে মালবের শাসনভার অর্পণ করেন । আবদুল্লা অত্যন্ত কোপন-

স্থাব ছিলেন । তিনিও অনতিবিলম্বে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বাধীন হইলেন । আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং পুনর্বার মালব দেশে গমন করিলেন । আবদুল্লা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত হইয়া গুজরাট রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এই ঘটনার সমস্ত উজবেগ সৈন্ত পাদশাহের বিরুদ্ধে উত্তীর্ণ হইল ; বিদ্রোহ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ।

পাদশাহ উজবেগ বিদ্রোহের পূর্বে নর্মদাতীরবর্তী গড়মগুল রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য সেনাপতি আসফ খাঁকে প্রেরণ করেন । তৎকালে রাণী দুর্গাবতী গড়মগুলের শাসয়িত্রী ছিলেন । দুর্গাবতী তেজ-স্বিনী, বীররমণী ছিলেন । আসফ খাঁ গড়মগুল রাজ্য আক্রমণ করিলে, রাণী বিপুলবিক্রমে শত্রুসৈন্ত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন । মোগল সৈন্ত প্রমাদ গণিল । এমন সময়ে শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীরে দুর্গাবতীর এক চক্ৰ বিদ্ধ হইল । তিনি সৈন্তপরিচালন করিতে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিলেন । বীররমণীর আকস্মিক মৃত্যুতে আসফ খাঁ অতি সহজে গড়মগুল অধিকার করিলেন । তিনি গড়মগুল অধিকার করিয়া অপরিমিত অর্থ হস্তগত করিলেন । কথিত আছে, তিনি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ এক শত কলস প্রাপ্ত হন । আসফ খাঁ এই ধনরাশির অধিকাংশ আত্মসাৎ করাতে পাদশাহের সহিত তাঁহার মনোমালিণ্যের সূত্রপাত হয় । উজবেগগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে আসফ খাঁ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া আকবরকে ঘোর বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিলেন । আকবরের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিল । উজবেগগণ ক্রমশঃ দিল্লীর নিকটবর্তী হইতে লাগিল । আকবর বিপুলবিক্রমে বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হইলেন । দুই বৎসর চেষ্টার পর বিদ্রোহ প্রায় উপশমিত হইয়া আসিয়াছিল ; এমন সময়ে পাদশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করাতে

তিনি বিদ্রোহ-দমন পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন । হাকিমকে দমন করিয়া পাদশাহ কতিপয় মাস পরে দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে, বিদ্রোহী দল পুনর্বার বলসংগ্রহ করিয়া এলাহাবাদ ও অযোধ্যা প্রদেশের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে, এবং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে । তখন বর্ষাকাল । রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পক্ষে বর্ষাকাল প্রশস্ত সময় নহে । কিন্তু পাদশাহ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । বিদ্রোহী দল বিতাড়িত হইয়া গঙ্গার অপর তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল । বর্ষায় গঙ্গা ক্ষীণ হইয়াছিল ; এ জন্য বিদ্রোহী সৈন্য তথায় আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিল । কিন্তু গঙ্গার প্রবল প্রাবল্য ও পাদশাহের গতিরোধ করিতে পারিল না । তিনি নিশীথে দুই সহস্র অপেক্ষাও ন্যূন সৈন্য লইয়া সস্তরণ করিয়া গঙ্গার অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করিলেন । এই আকস্মিক অক্রমণে বিদ্রোহী সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল । সাত বৎসর অশ্রান্ত যুদ্ধের পর পঞ্চবিংশ-বর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক আকবর সমস্ত বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করিলেন । তিনি এই বিদ্রোহদমনে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বীরসমাজের বরেণ্য হইলেন, এবং যে-নিশ্চুক্ত পূর্ণচন্দ্রের দ্বায় আপনার রশ্মিজালে সমগ্র প্রাচ্য গগন উদ্ভাসিত করিলেন ।

আকবর বৈরাম খাঁর অধীনে পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষানবিশী করিয়া এবং সাত বৎসরকাল ছরাকাজ্জ রাজপুরুষগণের বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত থাকিয়া, ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্বের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত করিলেন, এই বার দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল ।

পাদশাহ সমগ্র ভারতের একুতিপুত্র ও রাজকুলকে প্রীতির

আকবর পররাজ্যবিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সর্বপ্রথমেই রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত করেন । রাজপুত জাতির বাসভূমি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সাধারণ নাম রাজপুতানা, অথবা রাজওয়ারা । ইহার পশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশ, পূর্বে বুদ্ধেলখণ্ড, উত্তরে জঙ্গল দেশ নামক বালুকাভূমি, এবং দক্ষিণে বিক্রাপর্বত ।

জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্ল প্রথমেই আকবরের সঙ্গে সখ্যমুদ্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার কন্যা সমর্পণ করেন । আকবর রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সর্বপ্রথমে যোধপুর (মাড়োয়ার) রাজ্যে সৈন্ত প্রেরণ করেন । তথাকার রাজা কিছু দিন যুদ্ধ করিয়া দিল্লীর বশতা স্বীকার করেন । পাদশাহ তদীয় কন্যাকে ধর্ম্যপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া রাজাস্তম্ভপুরে স্থান প্রদান করেন । যোধপুরী বেগমের এক ভগিনী বিকানৌরের অধিপতি রায়সিংহের পত্নী ছিলেন । স্মৃতরাং রায়সিংহও এই মূদ্রে পাদশাহের সহিত সম্মিলিত হন । এই ভাবে কোথাও বা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া, কোথাও বা সৌহৃদ্যসংস্থাপন করিয়া, পাদশাহ সমগ্র রাজপুতানার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন । একমাত্র মিবারাধিপতি রাণা ও তাঁহার অনুগত কতিপয় ক্ষুদ্র সামন্ত আকবরের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই । আকবর ইহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন । কিন্তু ক্রমাগত দশ বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ও বিপুল অর্থব্যয়েও মিবার-বিজয় সম্পন্ন করিতে না পারিয়া আকবর আপনার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।

আকবর রাজপুতানাবিজয় করিয়া, এবং উদারতা ও সমদর্শিতা গুণে প্রধান প্রধান হিন্দু রাজার সঙ্গে সদ্ভাবসংস্থাপন করিয়া, প্রধানতঃ হিন্দুর বাহুবল নিয়োগপূর্বক ভারতবর্ষের খণ্ডখণ্ড মোসলমান রাজ্য স্বাধিকারভূক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন । পাদশাহী সৈন্তের ক্ষিপ্ৰকারিতার

ও রণচাতুর্য্যে গুজরাটরাজ্যে, বিহার প্রদেশে, বঙ্গভূমিতে ও উড়িষ্যা দেশে অল্পকালের মধ্যেই মোগল-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল । ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি উড়িষ্যা-বিজয় সম্পন্ন করেন ।

এই সময় আকবরের গৌরবরবির মধ্যাহ্নকাল । বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিবার সময় পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, আজমীর, গোয়া-লিয়ার এবং অযোধ্যায় আকবরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল । এই সময় এক দিকে নর্মদা নদীর তটবর্তী পর্বতশৃঙ্গ হইতে অকাস-নদী-বিধৌত প্রদেশ পর্য্যন্ত, এবং অন্য দিকে বঙ্গোপসাগরের তীরদেশ হইতে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের নরনারী তাঁহাকে সম্রাটরূপে গ্রহণ করিয়াছিল । ক্ষমতায়, বৈভবে, প্রতাপে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না । রাজনীতিবিশারদ তোডরমল্ল রাজস্ব-মন্ত্রী পদে, বীরশ্রেষ্ঠ মিরজা আকবুর রহিম প্রধান সেনাপতির পদে, এবং মহামহোপাধ্যায় ফৈজি ও আবুল ফজল প্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।

আকবর বাহুবলে ও সৌন্দর্য্যশ্রমে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের প্রভুত্ব লাভ করিলেন । কিন্তু কেবলমাত্র রাজশক্তিমূলক শ্রেষ্ঠতালাভ করি-য়াই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্রাটের পরিতৃপ্তি হইল না ; তিনি মানবের মানসিক রাজ্যেও আধিপত্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হইলেন । কিন্তু তিনি তরবারিহস্তে জনসাধারণকে আপনার মতাবলম্বী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন না । বস্তুতঃ, সম্রাটের আত্মীয় বন্ধুগণও মতস্বাতন্ত্র্যের জগু কখনও তাঁহার বিরাগভাজন হন নাই । কি ভাবে মানবের পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহার জ্ঞাননয়নে উজ্জলভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল । তিনি নিজে ধর্ম্ম বিষয়ে যে স্বাধীনতা উপভোগ করিতে-ছিলেন, তাহা প্রকৃতিপুঞ্জকে প্রদান করিবার মানস করিলেন । এবং

তদ্রূপ স্বাধীনতাকেই সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃষ্ট ভিত্তি বালিয়া
হির করিলেন । আকবর ভারতবর্ষে আপন প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে
সঙ্গে সর্বসাধারণের হিতকরে বিবিধ সুবিধানের প্রবর্তন করিতে আরম্ভ
করেন ; কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁহার সুবিধান সকল তাদৃশ কার্যকর
হইতে পারিয়াছিল না । এই সময় মোলানাগণের প্রভূত ক্ষমতা ছিল ;
দেশের শিক্ষাকার্য্য তাঁহাদের হস্তেই লুপ্ত ছিল । মোলানাগণই বিচার-
পতি নিযুক্ত হইতেন । রাজদরবারে তাঁহাদের প্রতিপত্তির সীমা ছিল
না ; এমন কি অনেক সময় কোরাণও তাঁহাদের মতের নিকট প্রতি-
স্থিত হইয়া পড়িত । ভারতবর্ষের অধিকাংশ মোসলমানই সুন্নি মতাব-
লম্বী । আকবরের সময়ে সুন্নিরা এই সকল মোলানার অঙ্গুলি সঙ্গে-
তেই পরিচালিত হইত । মোলানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ
ছিল । তাঁহারা গোঁড়ামি বশতঃ হিন্দু ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী মোসলমান-
দিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন । এই সকল কারণে উদারনীতি-
মূলক বিধান সমূহ প্রবর্তিত করিয়া তৎসমুদয়কে কার্য্যকর করিবার
সময় নানাবিধ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় ; এবং তজ্জন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর
স্পষ্ট অনুভব করেন যে, উদার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত শাসনকার্য্য
অতীষ্টানুরূপ পরিণত ও শৃঙ্খলাবল হইবে না ।

আকবর উদার ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । আক-
বরের স্বভাব উদার ছিল, এবং মহামতি আকুল লতিফও তাঁহাকে
উদার শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি আজন্ম মোসলমান
সমাজে বর্জিত হইয়াছিলেন বলিয়া জীবনের প্রথম ভাগেই সাম্প্রদায়িক
ধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন নাই । কলতঃ,
তাঁহার স্বাভাবিক উদারতাব ও উদার শিক্ষা সত্ত্বেও তুর্দীক ধর্ম্মবিশ্বাস
কতক পরিমাণে মোসলমান সমাজের অঙ্গুগত রূপেই গঠিত হইয়াছিল ।

বস্তুতঃ, তিনি রাজত্বের প্রথম ভাগে কোরাণ-অনুগত ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি তীর্থস্থান দর্শন ও মোসলমান মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎলাভের অমুরাগী ছিলেন। এমন কি, তিনি এসলাম-শাস্ত্রবিরুদ্ধ উদার ধর্মমত প্রচার করিবার তিন বৎসর পূর্বেও মক্কা গমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার দ্রুত আন্তরিক অভিলাষী ছিলেন। আকবরের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা শেখ নকলহক নির্দেশ করিয়াছেন যে, পাদশাহ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজধানীতেই থাকুন, কি শিবিরেই অবস্থান করুন, প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ পড়িতেন, এবং রাজকীয় কোরাণ-পাঠকগণ উপাসনাকালে ও* অন্যান্য সময়ে কোরাণ আবৃত্তি করিতেন। উপাসনাকালে পাদশাহ স্বয়ং সকল বিষয়ে অগ্রবর্তী থাকিতেন।

আকবরের ধর্মমত পরিবর্তিত হইবার কারণ কি ? সাম্রাজ্যের হিত-কামনার তিনি অসঙ্কোচে পরধর্মাবলম্বী রাজপুরুষগণের সঙ্গে মিলিত হইতেন, এবং এইরূপ অবাধ-মিলনের ফলে তাঁহাদের গুণরাজি সুস্পষ্ট-ভাবে উদারস্বভাব পাদশাহের নিকট প্রকাশিত হইছিল। তিনি তাঁহাদের গুণরাজিদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আমরা শেখ মুর্কলহকের গ্রন্থ হইতে সে বিবরণের অমুবাদ প্রদান করিতেছি।

“আকবরের রাজসভা সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতাবলম্বীর, এবং সকল জাতির, খোরসান, ইরাক, মাওরাওরাহার ও হিন্দুস্থানের বিদ্ব-জ্ঞানের, শাস্ত্রবেত্তা ও ধর্মবিদের, সিন্ধা ও সুন্নির, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও গুণানের, ব্রাহ্মণের ও প্রত্যেক প্রচলিত ধর্মের প্রচারকের আকর্ষণকেন্দ্র ছিল। পাদশাহের কুখোপকথনস্পৃহা ও সৌজন্তের খ্যাতি, তত্পরি তাঁহার রাজবর্ষাধা ও কর্মতাব কথা, এমন কি, তাঁহার দীনতার ও শ্রেষ্ঠতার

বিষয় পরিশ্রুত হওয়াতে ইহার দলে দলে তাঁহার সম্মিথানে উপনীত হন, এবং ইতিহাস ও ভ্রমণের বর্ণনা ও প্রত্যাশন, Prophecy ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায় আপনাদিগকে নিরত করিয়া সর্বদা বাগ্‌বিত-
 ডায় কালযাপন করিতে আরম্ভ করেন । সাধারণতঃ তাত্ত্বিকদের
 যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহারাও সেইরূপ অত্যন্ত স্বমতাবলম্বী করিবার
 জন্য সচেষ্ট ছিলেন । পাদশাহ এই প্রথম অত্যাচার জাতির ইতিহাস,
 আচার ব্যবহার ও ধর্মমতের বিষয় শ্রবণ করিয়া উহাদের অভিনবত্ব
 দেখিয়া বিস্মিত হন । তিনি কেবল সত্যসিদ্ধান্তের জন্যই উদগ্রীব
 ছিলেন বলিয়া, যে সকল পরম্পরবিরোধী মত ব্যক্ত হইত, তাহা হইতে
 সম্বলিত মনোযোগ পূর্বক বিবেচনা করিয়া সার গ্রহণ করিতেন । তিনি
 রাজকর্মচারী, শাস্ত্রবেত্তা ও সামন্তগণের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে বলিতেন,
 “হে স্তানী মোল্লাগণ, সত্যনির্ধারণ ও প্রকৃত ধর্মমত লাভ করিয়া প্রচার
 করা এবং ধর্মের ঈশ্বরাদিষ্ট মূল অনুসন্ধান বাহির করাই আমার এক-
 মাত্র উদ্দেশ্য । অতএব মনুষ্যচিত্ত দুর্বলতার বশীভূত হইয়া সত্যগোপন
 ও ঈশ্বরাদেশের বিরোধী কোন মতপ্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইও না ।
 যদি তোমরা তজ্ঞাপ কর, তাহা হইলে তোমরা অধর্মচারণের জন্য ঈশ-
 রের নিকট দায়ী হইবে ।” * * * পূর্বোক্ত অভিমত পরিবর্তিত
 হইবার পূর্বে মোলানা আবদুল মুলতান পুরি ও শেখ আবদুল নবি
 অবিরত রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন, এবং পাদশাহের নিকট বহু
 অনুগ্রহলাভ করিতেন । এই দুই জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এসলাম ধর্ম ও
 শাস্ত্র সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মতদাতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন । তাঁহারা অধি-
 কাংশ সময়েই পরম্পরবিরোধী মত পোষণ করিতেন, এবং স্ব স্ব
 বক্তব্য উদ্ভেদনা ও পরিবাদসহকারে প্রকাশ করিতেন । অবশেষে
 পাদশাহের নিকট তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং

তাহারা যে ধর্মের প্রচার করিতেন, তৎসম্বন্ধে পাদশাহের ঔদাসীভ্য
জন্মে ।”

আমরা বদায়ুনির গ্রন্থ হইতেও কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি ।

“পাথরের উপর যেমন ক্রমে ক্রমে রেখা অঙ্কিত হইয়া থাকে,
সেইরূপ পাদশাহের হৃদয়েও এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছিল যে, সকল
ধর্মই বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এবং সকল জাতিতেই সুধীর বিবেচক ও আলৌ-
কিক ক্ষমতাশালী মনুষ্য রহিয়াছেন । যদি প্রকৃত জ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে
সর্বত্রই লাভ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে এক ধর্মই, অথবা এস-
লাম ধর্মের স্তায় একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অনধিকসহস্রবর্ষব্যয়
ধর্মই সত্য আবদ্ধ থাকিবে কেন ? এক সম্প্রদায় যাহা অস্বীকার করে,
অন্য সম্প্রদায় কেন তাহা দৃঢ়তাসহকারে যথার্থ বলিয়া প্রচার করিবে,
এবং কোন এক সম্প্রদায়কে উৎকর্ষ প্রদত্ত না হইয়া থাকিলেও সে
সম্প্রদায় কেন শ্রেষ্ঠতার দাবি করিবে ?

“বিশেষতঃ, প্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ সর্বদা পাদশাহের সঙ্গে নির্জন
সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিতেন । তাহারা নৈতিক, শারীরিক ও আধ্যা-
ত্মিক গ্রন্থ বিষয়ে অত্যান্ত বিদজ্জনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং পার-
লৌকিক জ্ঞান, পারমার্থিক ক্ষমতা ও মানবীয় পূর্ণতার উচ্চাদর্শ লাভ
করিয়াছিলেন ; এ জন্য তাহারা আপনাদের ধর্মের সত্য ও পরধর্মের
ভ্রমপ্রদর্শনার্থ জ্ঞান ও প্রমাণমূলক যুক্তি উপস্থিত করিতেন । তাহারা
আপনাদের ধর্মমত এরূপ দৃঢ়ভাবে প্রচার করিতেন, এবং যে সব বিষয়
বিবেচনাসাপেক্ষ, তাহাও এরূপ সুকৌশলে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন
করিতেন যে, কেহই সন্দেহপ্রকাশ করিয়া (এমন কি, পর্তত ধূলিমাৎ
হইয়া গেলেও এবং আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও,) পাদশাহকে সন্দেহ
করিয়া তুলিতে পারিত না ।

“এ জন্তু পাদশাহ resurrection, day of judgment ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ, এসলাম ধর্মের প্রত্যাশা ও আমাদের পয়গম্বরের জনশ্রুতির অনুগত বাবতীয় ব্যবস্থা বর্জন করেন ।”

এই ভাবে যে সময় তাঁহার ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইতেছিল, তখন তিনি সাম্রাজ্যের শাসনসংরক্ষণের জন্তু অভিনব পন্থার উদ্ভাবনে নিযুক্ত ছিলেন । শাসনসংস্কার কার্যে সফল ধর্মমতাবলম্বী রাজপুরুষগণ তাঁহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করাতে তিনি আপনার ধর্মমত পরিবর্তিত করিয়া উদারধর্মাবলম্বী হইলেন, এবং সর্বসাধারণের মধ্যেও নূতন ধর্মের প্রচার করিতে সক্ষম করিলেন । অগাধধীসম্পন্ন আবুল ফজল তাঁহার সহায় হইলেন ।

রাজত্বের একবিংশতিতম বর্ষে (১৫৭৬ খৃঃ) গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হইল । আকবর রাজসুদ্রায় প্রচলিত কল্মা পরিত্যাগ করিয়া আপনার নাম-সংবলিত বচন অঙ্কিত করিবার আদেশ দিলেন । তিনি রাজসুদ্রায় “আল্লাহ্ আকবর” বচন অঙ্কিত করা যাইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে সতর্কজিহ্বাস্থ হইলেন । অধিকাংশ ব্যক্তিই এই পরিবর্তনের অনুমোদন করিলেন । কেবল হাজি এব্রাহিম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, উহার দুই প্রকার (১) অর্থ হইতে পারে, সূত্রাং কোরাণের “নাজিকর আল্লাহি আকবর” নামক একার্থমূলক (২) শ্লোকাংশ গ্রহণ করাই সম্ভব । এব্রাহিমের যুক্তি পাদশাহের মনোমত হইল না । তিনি বলিলেন, “মনুষ্যের অক্ষমতা এত দূর জাঙ্জল্যমান যে, কেহই ঈশ্বরত্বের দাবি করিতে পারে না । অতএব ‘আল্লাহ্ আকবর’ বচন সুদ্রায় অঙ্কিত করিলে দুষণীয় হইবে না ।”

(১) ঈশ্বর মহান্, অথবা আকবর ঈশ্বর ।

(২) ঈশ্বরের বিষয় ধ্যান করাই সর্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাণ্ড ।

সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টার ব্রুকম্যান নির্দেশ করিয়াছেন যে, “আল্লাহ আকবর” বচনের দুই অর্থ হইতে পারে বলিয়াই পাদশাহ উহা রাজমুদ্রায় অঙ্কিত করিবার আদেশ দেন। “আকবর ঈশ্বর,” এই অর্থবোধক মুদ্রালিপি মোসলমান-সমাজে সহিয়া গেলে তিনি আবুল ফজলের সাহায্যে ধর্ম সপক্ষে আমূল পরিবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আবুল ফজল প্রস্তাব করিলেন যে, রাজ্য পরমার্থিক বিষয়েও প্রকৃতি-গুণের অধিনেতা। কোরাণের অনুশাসন মানবীয় ব্যবস্থা কর্তৃক নিয়-মিত হইতে পারে না, ইহাই এসলাম ধর্মের মূলমত। আবুল ফজলের প্রস্তাব উহার মূলোচ্ছেদক হইল। মোসলমান শাস্ত্রবেত্তাগণ বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। একদিকে আবুল ফজলের মত প্রত্যাখ্যান করিলে পাদশাহ আপনাকে অসম্মানিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, অপর দিকে উহা গ্রহণ করিলে এসলাম ধর্মের ভিত্তিতে সাংঘাতিক আঘাত করা হইবে। অবশেষে রাজসম্মান রক্ষা করাই তাঁহাদের স্পৃহনীয় হইল। মরহুম উল-মক্ক, শেখ আবুল নবি, কাজি জালাল উদ্দীন মুলতানি, শেখ মবারক ও গাজি খাঁ বদক্ষি ত্রায়পরায়ণ রাজাকেই পারমাথিক বিষয়েরও অধিনেতা বলিয়া আপন আপন নান স্বাক্ষরপূর্বক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। আমরা সেই ঘোষণাপত্রের অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

“আমরা একমতাবলম্বী হইয়া মীমাংসা করিতেছি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মুক্ততাহিদগণের পদ অপেক্ষা একজন সুলতান-ই-আদিলের (ত্রায়পরায়ণ সম্রাটের) পদ শ্রেষ্ঠ। আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এসলামের সুলতান, মনুষ্য জাতির আশ্রয়স্থল, বিশ্বাসিগণের নেতা ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া আবুল ফতে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ আকবর পাদশাহ গাজি (ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন) একজন অত্যন্ত ত্রায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও ঈশ্বরভীরু রাজা। অতএব মুক্ততাহিদ-

গণের মধ্যে কোনও মতবৈধ উপস্থিত হইলে যদি পাদশাহ স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারণায় ও অভ্রান্ত বিচারে কোন এক পথ অবলম্বন করেন, এবং মানব-জাতির মঙ্গলবিধান ও পৃথিবীর উপযুক্ত পরিচালনার নিমিত্ত নিজের মীমাংসা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই মীমাংসা সমস্ত জাতির ও আমাদের গ্রহণীয় বলিয়া আমরা এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি । আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, পাদশাহ স্বীয় অভ্রান্ত বিচারে যদি কোরাণের অবিরোধী ও জাতির মঙ্গলবিধায়ক কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা হইলে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য গ্রহণীয় ও পালনীয় । এই আদেশের অতিকূলাচরণ পরলোকে অনন্ত নরক বিধান করিবে, এবং ইহলোকে ধর্ম ও উন্নতির ক্ষতিকারক হইবে । ঈশ্বরের গৌরব ও ইসলাম ধর্মের বিস্তারের জন্য সাধু উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাপত্র লিখিত ও হিজিরা ৯৮৭ অব্দের রজব মাসে প্রধান প্রধান উল্মা ও শাস্ত্রজ্ঞ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল ।”

পূর্বোল্লিখিত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে পাদশাহের ধর্মসংস্কারের পথ পরিষ্কৃত হইল, এবং ইমামের মীমাংসাই গরীয়সী বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল । এক্ষণে পাদশাহ প্রকাশ্যভাবে আপনার অভিনব ধর্ম-বিধানের প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন ।

৯৮৮ (খৃঃ ১৫৮০) হিজিরীর জমাল আউল মাসের প্রথমতারিখে, কতেপুরের জুম্মা মসজিদে আকবর প্রকাশ্যভাবে আপনার অভিনব ধর্ম-বিধানের প্রচার করিলেন । পাদশাহ প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণের জন্য কৈফীর রচিত নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার পর মূলমন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ।

“The Lord to me the kingdom gave,

He made me wise, and strong, and brave,

He girdeth me in right and truth,
 Filling my mind with love of truth.
 No praise man can sum His state.
 Allahu Akbar !—God is great."

আকবর অভিনব ধর্মমতের নাম তৌহিদ-ই-ইলাহি রাখিয়াছিলেন।
 আকবর-প্রবর্তিত ধর্মমতের মূলমন্ত্রগুলি কি ? এসলাম ধর্মের গোড়া
 ও আকবরবিদেষ্টা বদায়ুনি নূতন ধর্মের বহু নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে,
 উহা তাঁহার (পাদশাহের) হৃদয়দর্পণের প্রতিবিম্বরূপ। প্রত্যেক
 ধর্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়াই আকবর আপনার অভিনব ধর্মবিধানের
 প্রচার করেন। তৌহিদ-ই-ইলাহির গঠনের হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম সব-
 শেষ সাহায্য করিয়াছিল। বীরবল সিংহ সূর্য্যের অপার মহিমা সযত্নে
 আকবরের প্রতিষ্ঠা জন্মাইয়াছিলেন ; অগ্নিউপাসকগণও শুজরাট হইতে
 রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনাদের ধর্মমত সত্যমূলক
 বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন। (১) বস্তুতঃ, আকবর প্রবর্তিত ধর্ম
 ধাবতীয় ধর্মের সম্বায়ে গঠিত হইয়াছিল। (২) ঈশ্বর এক ও অদ্বি-
 তীয় এবং আকবর তাঁহার প্রতিনিধি ; ইহাই নবধর্মের প্রথম সূত্র। (৩)
 নিরাকার ঈশ্বরকে জাগরণে বা স্বপ্নে দর্শন করা যায় না, কিন্তু উপা-

(১) প্রথম হইতেই আকবর হিন্দুমহাবিশিষ্টের মনোরঞ্জনার্থ রাজ্যান্তঃপুরে
 হোমোথ্রি প্রমুখিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রাজত্বের পঞ্চবিংশতিতম বর্ষে
 সূর্য ও অগ্নির সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে তুলুষ্ঠিত হন, এবং সম্রাটকালে দীপমালা প্রমুখিত
 হইলে, রাজাজায় সমস্ত সভাসন সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নির সম্মুখীন করেন। এই
 বর্ষেই পাদশাহ একদিন মলাটে ত্রিপুরক ও গলদেশে অর্ণোপবীত ধারণ করিয়া রাজ-
 সভায় আগমন করেন।

(২) আচার্য্য ম্যাক্সমুলার আকবরের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Akbar the first
 student of Comparative religion."

(৩) আকবরের ধর্ম ধারণা কিরূপ মহোচ্চ ছিল তাহা অবদর্শন করিবার মত

সকের বিবেক সমুজ্জল হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে, তাদৃশ স্বরূপই ধ্যেয় । যাহার হৃদয় সকল বিষয় হইতে মুক্ত, তিনি অনুপম ঈশ্বর প্রেমের পদানুসরণ করিয়াছেন । হৃৎপ্রবৃত্তির দমন ও লোকহিত-কর কার্যের অনুষ্ঠানই পারত্রিক শ্রেয়ঃলাভের প্রকৃষ্ট উপায় ।

ভ্রম ও পাপ মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবজ বলিয়া ধর্মোপদেষ্টার মতানু-সারে অন্ধ ভাবে কোন প্রকার ক্রিয়া কলাপের সম্পাদন নিষিদ্ধ ছিল । আকবর আপনার ধর্মবিধান হইতে পৌরহিত্যের প্রথা তুলিয়া দিয়া-ছিলেন । তিনি পৌরহিত্যের প্রথা তুলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি মনুষ্যকে শাস্ত্রের অনুশাসন হইতেও মুক্ত করিয়া একমাত্র জ্ঞান ও বিবেকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন । তিনি বিবেকের স্বাধীনতা প্রদান করেন । তিনি বলিতেন, “কতক সরল-চিত্ত পরানুবর্তী লোক প্রাচীন কাহিনী সকলকে জ্ঞান-নির্দেশিত বলিয়া স্বীকার করে ও চিরকতিগ্রস্ত হয়” (ধর্মতত্ত্ব) । মনুষ্য উজ্জল বিবেকানু-সারে শ্রেষ্ঠতালভ করে, সুতরাং বিবেক পরিমার্জিত করিয়া তদনুসারে সমস্ত কার্য নির্বাহ করাই আবশ্যক । কিন্তু মনুষ্য যাহাতে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অশ্রের অনিষ্টোৎপাদন করিতে না পারে, তজ্জন্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল ।

আমরা আবুলফজল কর্তৃক প্রচারিত তাঁহার দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি । ১ । অত্যেক ব্যক্তি অনুপম ঈশ্বরকে নিজের নিজের ভাবনানুসারে এক এক নামে সম্বো-ধন করিয়া থাকে, অস্ত্রথা অনির্দেশ্যের নাম কোথা ? ২ । সন্দেহ নিরাকরণের জন্য নামকরণ, প্রকৃতপক্ষে পবিত্র স্বরূপে তাহার যোগ হয় না । আকবরের ঈশ্বর বিশ্বাস হৃৎগতীর ও সর্ব প্রকার কুসংস্কার বর্জিত ছিল । তাঁহার রাজত্বকালে একবার দেশ মধ্যে দীর্ঘকাল দৃষ্টি না হওয়াতে হাহাকার উঠে । আবুল ফজল তাঁহাকে বৃষ্টির কামনা করিয়া ঈশ্বরোপসনা করিতে বলেন । তিনি উত্তর করেন, “ঈশ্বর সর্বত্র এবং আমা-দের নিজেদের অপেক্ষাও আমাদের হিতৈষী, সুতরাং আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে উদ্বেগ করিবার প্রয়োজন নাই ।” (ধর্মতত্ত্ব ১৮১২ শক)

দুর্জলচিত্ত উপাসকের চিত্তবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদনের জন্য কোন অবলম্বনের আবশ্যক হইলে অগ্নি অথবা সূর্য্যকে প্রতিক্রম রূপে গ্রহণ করিবার বিধান ছিল ; আকবর ঈশ্বরকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এক্ষণেই এ প্রকার ব্যবস্থা করা হয় । (১)

পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে আকবরের বিশ্বাস অনেকাংশে বৌদ্ধ শাস্ত্রানুযায়ী ছিল । তিনি বিশ্বাস করিতেন, জীবাত্মা মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি ভ্রমণ করে এবং ইহকালের শুভাশুভ কর্ম্মের অনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ যোনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে পূর্ণশুদ্ধি লাভ করিয়া ঈশ্বরে বিলীন হয়, ইহাই স্বর্গস্থলভোগ, এতদ্ব্যতীত পরলোকে পুণ্যের অন্ত কোন প্রকার পুরস্কার নাই । //

এসলাম ধর্ম্মানুগত উপাসনা প্রণালী সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাহার পরিবর্তে অভিনব প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছিল । প্রার্থনাংশ পারসীক ধর্ম্মের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল, এবং অনুষ্ঠানংশ হিন্দু পদ্ধতির অনুযায়ী নির্দিষ্ট হইয়াছিল । কিন্তু সামাজিক উপাসনার কোনরূপ বিধান ছিল না । আকবর নিশাযোগে বিচিত্র আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত করিয়া একাকী ঈশ্বরোপাসনা করিতেন ।

অতিরিক্ত উপাসনা, উপবাস ও দান অনেক সময় কপটাচরণের

(১) আকবর সূর্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না । এ সম্বন্ধে কাউন্ট লোয়ের বাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহা বিকি বেভারিজের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

“Akbar never identified his deity with the sun, but the universal focus of light and warmth served as the purest symbol for his conceptions ; he chose the sun as his emblem, because he believed all existence to be but the effluence of the God head. Not knowing or not comprehending this inner meaning, the populace held that he worshipped the Sun.”

প্রতিপোষক হইয়া থাকে, এজন্য তৎসম্বন্ধে সকলকে নিরুৎসাহ করা হইত ; কিন্তু তাহাদের আচরণ নিষিদ্ধ ছিল না । আকবরের মতে ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বাহ্যিক উপাসনার আবশ্যক । প্রকৃত উপাসনা অন্তরের যন্ত ; বাহ্যাদ্বয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই ।

নূতন ধর্ম খাড়াখাড়ের কোন প্রকার বিচার ছিল না । কিন্তু এ সম্বন্ধে নিরুত্তি মার্গের অনুসরণই চিত্তশুদ্ধির অন্ততম উপায় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছিল । মাংস আকবরের প্রিয় খাদ্য ছিল না । তিনি অনেক সময় একাদিক্রমে বহুদিন পর্য্যন্ত মাংস আহার করিতেন না । তিনি ফলমূল আহার করিয়াই অপরিমিত তৃপ্তিঅনুভব করিতেন । তিনি বলিতেন যে, ফল সৃষ্টিকর্তার সর্বোৎকৃষ্ট দান ।

নূতন ধর্মবিধান যেন সকল সম্প্রদায়েরই হিতসাধন করে, এবং যেন কাহারও পীড়নের হেতু না হয়, তদুদ্দেশ্যেই আকবর সকল ধর্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

পাদশাহ সহমরণ নিবারণ জন্য যত্ন করেন, ঘনিষ্ঠ স্বগণের পরিবর্তে দূরতর সম্পর্কে বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্তিত করিতে উद्यোগ করেন, বিধবা বিবাহের বিধি প্রচার করেন, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন, বহু বিবাহের বিরুদ্ধে অভিমত প্রদান করেন, এবং ধর্মার্থ পণ্ডিত্যের দোষ প্রদর্শন করেন । কিন্তু এই সকল বিষয়ে রাজার অভিলাষ মত কার্য্য করিবার জন্য বলপ্রয়োগ না করিয়া তিনি দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক প্রকৃতিপুঞ্জকে নববিধির অনুরাগী করিতে যত্ন করিতেন । আমরা এই প্রসঙ্গে আকবরের নিজের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—“পূর্বে অনেক লোককে বলপূর্বক স্বধর্ম আনয়ন করিয়াছি, এবং ইহাকে মোসলমানী বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম, যখন

জ্ঞানের উদয় হইল, তখন লজ্জিত হইলাম। • • • বেজন বলপ্রকাশ করে, সে কবে ধার্মিকের নাম গ্রহণ করিতে পারে ?" (১)

আকবর এসলাম ধর্মের গোড়া বিচারকদিগকে পদচ্যুত করিয়া বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, এবং হিন্দুর দাস্য-ধিকার সম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসার জন্য হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করেন।

সাম্য মন্ত্রের উপাসক আকবর উদার ধর্মের প্রবর্তন ও সামাজিক সুব্যবহার প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন না ; তিনি মোসলমান-দিগকে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়াও তাহাদিগকে উদার ও সমদর্শী করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। ফলতঃ, তাহার যত্ন ও উৎসাহে মোসলমান পণ্ডিত সমাজে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। (২)

(১) ধর্মতত্ত্ব।

(২) আকবরের সময়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল ; এজন্য অনেকের বিশ্বাস যে, মোসলমানকুলে কৈজিই সর্বপ্রথমে সংস্কৃতের অনুশীলনে নিরত হইয়াছিলেন, এবং আকবরের রাজত্বের পূর্বে মোসলমান পণ্ডিত সমাজে সংস্কৃত ভাষার প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল না, এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। আকবরের বহুপূর্বে মোসলমান সমাজে পঞ্চতন্ত্রের আরবী অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু কোন কোন পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে এই পুস্তক মূলগ্রন্থ অবলম্বনে অনুবাদিত হয় নাই। পঞ্চতন্ত্র বাতীত সংস্কৃত ভাষার লিপিবদ্ধ অন্যান্য গ্রন্থেরও আরবী অনুবাদ প্রচলিত ছিল। পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ বোঙ্গাদ প্রবাসী হিন্দু-গণই এই সকল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এসলাম ধর্মের জ্যোতিঃ প্রচারিত হইবার অল্প পরেই যে, মোসলমান পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বল্পাংশেও প্রমাণ করা যাইতে পারে। খলিফা আল মামুনের রাজত্বকালে মোহাম্মদ বিনমুসা বীজগণিত এবং মিকা ও ইবনদহন চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থপ্রচার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থত্রয় রচিত হইবার সময়ে সংস্কৃত ভাষা যে মোসলমান সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা পাঠকালে স্পষ্টই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই গ্রন্থত্রয় রচিত হইবার পূর্বে চরক ও সুশ্রুত নামক চিকিৎসা বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের আরবী ভাষার অনুবাদিত হইয়াছিল। মোসলমান-গণ অধম হইতেই চিকিৎসাবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। তাহারা হিন্দুর আয়ুর্বেদের

তৎকালের সংস্কৃতজ্ঞ মোসলমান পণ্ডিতগণ মধ্যে আকবরের সর্ব-
শ্রেষ্ঠ পরিষদ ফৈজী, নকিব খাঁ মোল্লা মোহাম্মদ, মোল্লা সাবরি, সুল-
তান হাজি, হাজি এব্রাহিম এবং বদায়ুনি প্রধান ছিলেন। এই পণ্ডিত-
সমাজের পরিশ্রমের ফলে যে সকল অনুবাদগ্রন্থ প্রচারিত হয়, তন্মধ্যে

একাত্তর গজপাঠী ছিলেন। এমন কি, হাকিম-উল-রসিদের দরবারে দুইজন হিন্দু
চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের দুর্গ-প্রাকারে মোসলমানের বিজয়নিশান
উখিত হইতে না হইতেই মহামহোপাধ্যায় আল বারানী হিন্দুর ভাষা, সাহিত্য ও
বিজ্ঞানের অনুশীলনে সচেষ্ট প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং কঠোর পরিশ্রমে অচিরে সংস্কৃত
ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যলাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এতদূর পারদর্শিতা
জন্মিয়াছিল যে, তিনি সংস্কৃত হইতে পারসীতে ও পারসী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ
করিতে পারিতেন। সুলতান ফিরোজ শাহ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নগর-
কেটে অবরোধ করেন। এই সময় তাঁহার হস্তে তত্রত্য একাণ্ড পুস্তকালয় পতিত
হইয়াছিল। তিনি এই পুস্তকালয় হইতে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক একখানি ও সামুদ্রিক
শাস্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মোলানা ইম্মুদীন খলিদা খানিকে অনুবাদ করিতে
আদেশ করিয়াছিলেন। খলিদা খানি অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।
লক্ষ্য নগরীর নবাব জালালদৌলার পুস্তকালয়ে একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক
সংস্কৃত গ্রন্থের পারসী অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ গ্রন্থও সুলতান ফিরোজ শাহের
রাজত্বকালে অনুবাদিত হইয়াছিল। এই সময় ভারতবর্ষের মোসলমান সমাজে হিন্দুর
ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচিত হইত। লক্ষ্য রাজকীয় পুস্তকালয়ে গো-
চরিকানা বিষয়ক একখানি পারসীগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; ইহা সংস্কৃতের অনুবাদ।
গিয়াস উদ্দীন মোহাম্মদ শাহের আদেশে এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল। এই দুর্লভ
গ্রন্থও ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে অনুবাদিত হইয়াছিল। সংস্কৃত গ্রন্থকর্তা গ্রন্থকের শিক্ষাভর
ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অনুবাদের ভূমিকাপাঠে আমরা অবগত হই যে, অপ-
বর্ণবেলদী হিন্দুগণের নিমিত্ত শিক্ষালাভের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই এ
গ্রন্থ হিন্দুর ভাষা হইতে মুকোমল পারসীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থের
অনুবাদক(২) ঠিক কোন্ সময়ে সমাধা হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করা
বাইতে পারে না। কারণ ঠিক ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন নামধারী কোন মোসল-
মান আধিপতি ভারতবর্ষের কোন স্থানে আধিপত্য করেন নাই। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে
গিয়াস উদ্দীন তোপলক নামক একজন নরপতি দিল্লীর রাজপদে আধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং
১৪৮১ খৃষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন নামক আর একজন নরপতি মালবদেশে রাজত্ব করিয়া-
ছিলেন। গিয়াস উদ্দীন নামে বঙ্গদেশেও দুইজন শাসনপতি ছিলেন। একজনের

কোন কোন পুস্তক হিন্দীর অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু তৎকালের মোসলমান পণ্ডিতগণ কোন্ অর্থে হিন্দীশব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্দেশ করা যাইতে পারে না ।

ইতিহাস-লেখক নিজাম উদ্দীন নির্দেশ করিয়াছেন যে, আদুল কাদের বদায়ুনি কর্তৃক কতিপয় হিন্দীগ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল । বদায়ুনি রামায়ণ ও সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি নামক গ্রন্থদ্বয় অনুবাদ করিয়াছিলেন । তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থানুবাদ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার সারমর্ম প্রদান করিলাম । কান্ত-কুন্ডে অবস্থানকালে পাদশাহ মালব দেশের অধিপতি বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক গল্পবিশিষ্ট সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি নামক একখানি গ্রন্থ তাঁহাকে গদ্য-পদ্যে অনুবাদ করিবার জন্ত আদেশ করেন । এই গ্রন্থ তুতিনামার অনুরূপ । তিনি অগৌণে কার্য্য আরম্ভ করিতে এবং প্রথম দিনেই অনুবাদের প্রথম পৃষ্ঠা সমাপ্ত করিতে আদিষ্ট হন । একজন সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছরহস্থলের অর্থব্যাখ্যা করিবার জন্ত নিয়োজিত ছিলেন । বদায়ুনি প্রথম দিনেই প্রথম গল্পের উপক্রমণিকাংশের অনুবাদ শেষ করিয়া পাদশাহের সমীপে উপস্থিত করিলে তিনি তাঁহার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন । সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত হইলে অনুবাদকর্তা উহার নাম খিরদ আফ্জা রাখিয়াছিলেন । এই নাম হইতে অনুবাদের তারিখ নির্দেশ করা যাইতে পারে । পাদশাহ অনু-

রাজত্ব ১২১২ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ও অপরজনের রাজত্ব ১৩৬৭ হইতে ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । যাহা হউক, আকবরের সময়ের পূর্বেই যে গ্রন্থের অনুবাদ জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিলাম, তদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, মহা মহোপাধ্যায় কৈফিই সংস্কৃতজ্ঞ প্রথম মোসলমান নহেন । তবে আকবরের রাজত্বকালেই মোসলমান পণ্ডিতসমাজে সংস্কৃত চর্চার প্রসার অতুলপূর্ব্বভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।

গ্রহ পুরঃসর এই অনুবাদ গ্রহণ করিয়া রাজকীয় পুস্তকালয়ে হানপ্রদান করেন । ইহার পর তিনি তাঁহাকে রামায়ণের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন । বদায়ুনির মতে এ কাব্য মহাভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং ইহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চবিংশ সহস্র, ও প্রত্যেক শ্লোকের অক্ষরসংখ্যা ৩৫ ; অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র এই কাব্যের নায়ক ; হিন্দুজাতি তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে । চারি বৎসরের পরিশ্রমে বদায়ুনি রামায়ণের অনুবাদ সমাপ্ত করেন । তিনি এই পুস্তক পাদশাহের নিকট উপস্থিত করিলে উহা অত্যন্ত প্রশংসিত হয় । রচনা ও বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, বদায়ুনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অবলম্বনেই অনুবাদের কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন ।

আকবরের আদেশে মহাভারত পারসীতে অনুবাদিত হইয়াছিল । এ অনুবাদকার্য্যও যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনেই সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । এই অনুবাদকার্য্যে বহু পণ্ডিতের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল । বদায়ুনি লিখিয়া গিয়াছিল যে, ৯৯০ হিজিরী অর্থে পাদশাহ কতিপয় হিন্দু পণ্ডিতকে একত্র করিয়া মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত আদেশ করেন ; তার পর তিনি নিজে কয়েক রাত্রি পর্য্যন্ত নকিব খাঁর নিকট উহার তাৎপর্য্য বিবৃত করেন ; পারসীতে মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত নকিব খাঁ আদিষ্ট ছিলেন । তাঁহার কার্য্য সহজসাধ্য করিবার জন্তই পাদশাহ নিজে মহাভারতের তাৎপর্য্য বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । তৃতীয় দিন রাত্রিতে তিনি বদায়ুনিকে আহ্বান করিয়া নকিব খাঁর সহযোগে মহাভারতের অনুবাদ সমাধা করিতে আদেশ করেন । মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত । তিনি তিন চারি মাসের পরিশ্রমে ছই পর্কের অনুবাদ শেষ করেন । মহাভারতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দেশ করিবার সময়

পেরাজ ভক্ষণ নিবন্ধ হইয়াছে। ঈদুশ গ্রন্থের অনুবাদকার্যে নিযুক্ত হওয়াতে এসলাম ধর্মের গোড়া বদায়ুনি আপন অদৃষ্টের বহু নিন্দা করিয়াছেন। ইহার পর মোল্যাশি ও নকিব খাঁ একযোগে কিয়দংশের অনুবাদ করেন। তাহার পর সুলতান হাজি খানেশ্বরী একাকী এক পর্কের অনুবাদ করেন। অতঃপর শেখ ফৈজী পূর্বকৃত প্রাথমিক অনুবাদ পারিপাট্যপূর্ণ গল্প-পঙ্কে পরিবর্তন করিবার জন্ত আদিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার হস্তে ছই পর্কের অধিক সমাপ্ত হইতে পারে নাই। তাহার পর পূর্বোক্ত হাজি অনুবাদের অবশিষ্টাংশের ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া পুনরনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার আরও কার্য শেষ হইবার পূর্বেই তিনি অবসরপ্রাপ্ত হন। বদায়ুনি মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, “যে সকল পণ্ডিতের সহায়তায় এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদিত হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই কোরব পাণ্ডবের সহবাসী হইয়াছেন। এক্ষণে যাহারা জীবিত আছেন, তাঁহারা যেন ঈশ্বরের করুণায় পরিত্রাণলাভ করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের অনুতাপ যেন গৃহীত হয়। মহাভারতের অনুবাদের নাম রাজনামা। অনুবাদগ্রন্থ চিত্র দ্বারা পরিশোভিত হইলে আমীর ওমরাহবর্গ এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবার জন্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধবাদী আবুল ফজল ছই পাত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ছিলেন। ঈশ্বর আমাদের নাস্তিকতা ও অবাস্তবতার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।” বদায়ুনি আর এক স্থানে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, পাদশাহ তাঁহাকে অর্থক্স বেদ পারসী ভাষায় অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের ভাষা কঠিন ও অর্থ দুর্বোধ জন্ত তিনি রাজ্যাদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হন; তার পর হাজি এব্রাহিম দিরহিন্দী এই কার্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উহা সুচারুরূপে সম্পাদন

করেন । ফলতঃ আকবর পাদশাহের রাজত্বকালে মোসলমান পণ্ডিত যশস্বীতে সংস্কৃত চর্চার সবিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল, এবং এক বদায়ুনি ব্যতীত তৎকালের সমস্ত সুশিক্ষিত মোসলমান উহার অনুশীলনে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন ।

মোসলমান সম্রাট কুলতিলক আকবর ধর্ম, সমাজ ও শাসনকার্যের নানাবিধ সংস্কার করিয়াছিলেন ; তাহার আদেশে এবং উৎসাহে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বহু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু রাজস্ব বিষয়ক সংস্কারই তাহার সর্বপ্রধান কীর্তি । রাজনীতিবিদগণ শের শাহ রাজস্বনীতির যে রেখাপাত করেন, আকবর তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তুলেন । আকবর প্রথমতঃ সমস্ত ভূমির বিভক্ত পরিমাপ করিয়া প্রত্যেক বিঘায় কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারই নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন । এ জন্ত তিনি সর্ব স্থানের জন্য একজাতীয় নলের সৃষ্টি করেন । এই নল দ্বারা সমস্ত ভূমির পরিমাপ হইলে কোন্ ভূমিতে কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নির্দ্ধারণ করেন । উর্বরতা অনুসারে সমস্ত ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ।

শ্রেণী ।	গম ।	তুলা ।
প্রথম শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘার	১৮/০	১০/০
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘার	১২/০	৭ ৥ ০
তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘার	৮ ৬ ৫	৫/০
	৩৮ ৬ ৫	২২ ৥ ০

এই তিন শ্রেণীর জমিতে গমের গড় উৎপন্ন বার মণ সাড়ে আট-ত্রিশ সের ও তুলার গড় উৎপন্ন সাত মণ বিশ সের । ইহার এক

তৃতীয়াংশ রাজার প্রাপ্য । গমের জমির প্রত্যেক বিঘা হইতেই যে চারি মণ সাড়ে বার সের ও তুলার জমির প্রত্যেক বিঘা হইতেই যে দুই মণ বিশ সের শস্য রাজকরস্বরূপ গ্রহণ করা হইত, তাহা নহে । ইহা রাজস্বের সর্বোচ্চ হার মাত্র ছিল । প্রজা ইচ্ছা করিলেই আপন জমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবার জন্ত আবেদন করিতে পারিত । এই পরিমাণ দ্বারা যে শস্য পাওয়া যাইত, তাহারই তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল । এতদ্ব্যতীত এ সম্বন্ধে অন্তরূপ আদেশও ছিল । যে জমিতে বীজবপনের জন্ত চাষের আবশ্যক ছিল না, তাহার রাজস্ব প্রত্যেক ফসলের সময় পূর্ণহারে গ্রহণ করা হইত । যে জমিতে বীজবপনের জন্ত চাষের আবশ্যক হইত, তাহার রাজস্ব কেবলমাত্র আবাদ হইলেই প্রদান করিবার নিয়ম ছিল । জমি জলপ্লাবনে নষ্ট হইলে, অথবা একাদিক্রমে তিন বৎসর অনাবাদী অবস্থায় পতিত থাকিলে, অথবা জমীর পুনঃকর্যণের জন্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে, প্রথম বৎসর দুই পঞ্চমাংশ রাজস্ব-স্বরূপ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল । তাহার পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরে অল্প অল্প করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া পূর্ণহারে আদায় করা হইত । ভূমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া শস্যের পরিবর্তে মুদ্রায় রাজস্ব গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল । এ নিমিত্ত কোন জমির পরিমাপ দ্বারা রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবার সময় তৎপূর্ববর্তী উনবিংশ বর্ষের শস্যের মূল্যতালিকার গড় অনুসারে মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইত । কিন্তু এ নির্দ্ধারণও কখনও কখনও বাজার দর মত পুনরায় বিবেচনাধীন করিবার নিয়ম ছিল, এবং কোন প্রজা মুদ্রার হার অতিরিক্ত মনে করিলে শস্য দ্বারাই রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিত । কোন কোন ভূমির জন্ত নগদ অর্থেই রাজস্ব গ্রহণ করা হইত । নীল, গাছা ও ইক্ষু প্রভৃতি যেসকল ভূমিতে

উৎপন্ন হইত, তাহার রাজকর নগদ অর্থেই দিবার নিয়ম ছিল। প্রথমতঃ প্রতি বৎসর রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হইত ; কিন্তু পরে এক কাজে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত হওয়া বিরক্তিকর হইয়া উঠাতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। জমীর পরিমাণ, শ্রেণীবিভাগ, পত্তন ও রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রাম্য কর্মচারীর সেরেস্তায় লিপিবদ্ধ থাকিত ।

আকবর রাজস্বের পূর্বোক্তরূপ উন্নতিবিধান করিয়া নানাবিধ রাজ-প্রাপ্য ও আমলান-প্রাপ্য কর তুলিয়া দেন। ইহার ফলে বর্দ্ধিত রাজস্ব নিবন্ধন প্রকৃতিপুঞ্জ করভারে নত হইয়াছিল না। পাদশাহ বাগিচ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য শুষ্ক এবং জলকরের পরিমাণ লঘু করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্তর্দিকে আদায়কারী রাজকর্মচারিগণের তহবিল তহরূপ করিবার পথ পূর্বোপেক্ষা সঙ্কুচিত করাতে রাজকোষের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। আকবর রাজস্বকর্মচারিদিগকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই যে, প্রজাবর্গ যাহাতে সুখসচ্ছন্দতা সন্তোষ করে, এবং রাজস্ব বিষয়ক নব ব্যবস্থা যাহাতে উদার ভাবে পরিচালিত হয়, তন্নিমিত্ত তিনি একান্ত যত্নশীল ছিলেন। কোন বিভাগের রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিবার প্রথা ছিল না। গ্রাম্যমণ্ডল ও পাটওয়ারীর কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া চাষী প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বন্দোবস্ত করিবার জন্য পাদশাহের আদেশ ছিল। রাজস্ব-মন্ত্রী টোডরমলের সাহায্যে আকবর রাজস্বসংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আকবর শাসনসৌকর্য্যার্থ সমস্ত সাম্রাজ্য পঞ্চদশ সুবায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। (১) প্রত্যেক সুবার জন্য একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা

ছিলেন । তাঁহার উপাধি সুবাদার বা নাজিম ছিল । তিনি পাদশাহের উপদেশ মত শাসন ও সৈন্যবিভাগসম্বন্ধীয় সকল প্রকার কার্যের পরিচালন করিতেন । প্রত্যেক সুবার রাজস্বসংক্রান্ত কার্য নিৰ্বাহ করিবার জন্য এক একজন দেওয়ান নিযুক্ত থাকিতেন । স্বয়ং পাদশাহ দেওয়ান মনোনীত করিতেন । প্রত্যেক সুবা কতিপয় সরকারে, প্রত্যেক সরকার কতিপয় পরগণাতে এবং প্রত্যেক পরগণা কতিপয় দাঙ্গরে বিভক্ত ছিল । এই সকল বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীগণ নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিতেন । প্রত্যেক সরকারের জন্য একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন । তাঁহারা আপন আপন বিভাগের সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন । সরকারসমূহের শান্তিরক্ষা ও সুশাসনের নিমিত্ত তাঁহারাষ্ট দায়ী থাকিতেন । কাজি ও মুক্তির সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন হইত । বৃহৎ বৃহৎ নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কোতওয়ালগণ নিযুক্ত ছিলেন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে রাজস্বকর্মচারীগণই শান্তিরক্ষার কার্য সম্পাদন করিতেন । পল্লীগ్రামের বিচারকার্য পঞ্চ-মতী প্রণয় নিৰ্বাহিত হইত । উইলসন নির্দেশ করিয়াছেন যে, কোনও বিবাদে উভয় পক্ষ হিন্দু হইলে ব্রাহ্মণগণ তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন ।

আকবর এই কর্মচারিদিগকে যে সকল আদেশলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে তাঁহার প্রজাপ্রীতি ও জায়পন্নায়ণতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । তিনি গুজরাটের শাসনকর্তাকে একবারি আদেশপত্রে প্রাণদণ্ড, বেত্রদণ্ড ও লৌহদণ্ড ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দণ্ডবিধান করিতে নিষেধ করেন ; কিন্তু একমাত্র প্রবল রাজদ্রোহ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অপরাধে প্রাণদণ্ডবিধান না করিবার আদেশ ছিল ।

৬ । আজমীর, ৭ । গুজর, ৮ । মালব, ৯ । অযোধ্যা, ১০ । এলাহাবাদ, ১১ । বিহার, ১২ । বঙ্গ, ১৩ । খান্নেল ১৪ । বেরার, ১৫ । আমেদনগর ।

প্রাণদণ্ডবিধান করা আবশ্যক হইলে পাদশাহের নিকট সমস্ত কাগজ-পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত । প্রাণদণ্ড-বিধানকালে বিকলাঙ্গ অথবা অন্য কোন প্রকার নিষ্ঠুরাচরণও নিষিদ্ধ ছিল ।

ভারতবর্ষের সৈন্তাধ্যক্ষদিগকে বৃত্তিস্বরূপ নগদ অর্থের পরিবর্তে জায়-গীরদান করিবার প্রথা ছিল । এই প্রথার ফলে সৈন্তাধ্যক্ষগণ আপন আপন জায়গীরে যথেষ্টভাবে করআদায় করিয়া প্রজাপীড়ন করিতেন । সৈন্তসংগ্রহের প্রণালীও দুষণীয় ছিল । জায়গীরের উপস্থিত দ্বারা সৈন্তা-ধ্যক্ষদিগকে নিরমমত যে পরিমাণ সৈন্তপরিপোষণ করিতে হইত, তাঁহারা তত সংখ্যক সৈন্ত রাখিতেন না । সৈন্ত সহ উপস্থিত হইবার জন্য রাজ্যদেশে প্রচারিত হইলে তাঁহারা যাহাকে-তাহাকে ধরিয়া সৈনিক পরিচ্ছদে শোভিত করিতেন, এবং তাহার পর তাহাদিগকে ভাড়াটিয়া অশ্বে আরোহণ করাইয়া সসৈন্তে রাজশিবিরে উপস্থিত হইতেন । এই জন্য আকবর বৃত্তিস্বরূপ জায়গীর প্রদান করিবার প্রথা পরিবর্তিত করিয়া নগদঅর্থ দিবার নিয়ম প্রচলিত করেন । তদ্যতীত বৃত্তিপ্রদানের সময় সৈন্তদিগকে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আদেশ ছিল । তিনি প্রত্যেক সৈনিকপুরুষের আকৃতি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ রাখিবার ও প্রত্যেক অশ্বের গাত্রে চিহ্ন অঙ্কিত করিবার রীতি প্রচলিত করেন । আকবর সৈন্তাধ্যক্ষদিগকে মনসবদার নাম প্রদান করেন, এবং তাঁহারা গুণানুসারে দশ সহস্র, সপ্ত সহস্র, পঞ্চ সহস্র, বা তদপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক সৈন্ত রক্ষা করিতেন । এই সকল সেনার বেতন রাজকোষ হইতে প্রদান করা হইত । সৈন্তাধ্যক্ষদিগকে তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্তের সংখ্যানুসারে দশহাজারী, সাতহাজারী, অথবা পাঁচহাজারী বলা হইত । পাঁচহাজারী সেনাপতির মাসিক বৃত্তি ১০৬০৭ হইতে ৩০০০০ টাকা

পর্যাপ্ত ছিল । এই বৃষ্টি হইতেই অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও অস্ত্র প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত ।

অভিনব ধর্মবিধানের সংগঠন, শাসনকার্যের সর্বদীন পরিবর্তন ও রাজস্ব সম্বন্ধে নববিধির প্রচলন রাজত্বের সমুদ্রিংশতম বর্ষে (১৫৯২ খৃঃ) সম্পন্ন হইল । এই সময় আকবর “প্রদীপ্ত যশঃপ্রভায় দীপ্তিসম্পন্ন ।” মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং “দূর-দূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া” মোগলের সিংহাসনতলে ভক্তি ও প্রীতিতে উচ্ছৃঙ্খিত হইতেছিল ।

এই সময় মন্ত্রীপ্রধান টোডরমল পরলোকে গমন করিলেন । আকবর তাঁহার সাহায্যেই রাজত্বের নুতন বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করিয়া যশোমন্দিরে অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন । টোডরমল আজীবন রাজসেবার নিরন্ত থাকিয়া জীবনের শেষভাগ ধর্মকর্ম্যে অতিবাহিত করিবার জন্য পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বারে গমন করেন । আকবর এই সর্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রীর অভাবে একান্ত ব্যথিত হইলেন । ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল দুই-হাজারী মনসব লাভ করিয়া ওমরাহ-শ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হইলেন । এই বৎসরই ফৈজী দোতাপদে বৃত্ত হইয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন । ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে আকবরের সুহৃদযুগলের পিতা শেখ মবারক পরলোকে গমন করিলেন । ইহার দুই বৎসর পরেই ফৈজী মানবলীলা সংবরণ করিলেন । পাদশাহ অস্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে একান্ত শোকাকুল হইলেন । পর বৎসর আকবর দক্ষিণাপথ বিজয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন । এই সময় দক্ষিণাপথ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ছিল । ১৫৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল সর্বপ্রথম যুদ্ধ করিবার জন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলেন । সাহিত্যরথী যুদ্ধক্ষেত্রেও শৌর্যবীর্যের একশেষ প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন ! এই সময় তিনি রাজভক্তি ও নিঃস্বার্থপর-

তারও যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন । তদীয় ভগিনীপতি খান্দেশের অধিপতি ছিলেন । তিনি আবুল ফজলকে মহার্য উপহার প্রদান করিয়া বশীভূত করিবার প্রয়াসী হইলে তিনি বলেন যে, পাদশাহের অমুগ্রহেই তাঁহার সমস্ত ধনলালস! পরিতৃপ্ত হইয়াছে । পর বৎসর আবুল ফজল আশির দুর্গ অধিকার করিলেন । ১৬০২ খৃষ্টাব্দে পাদশাহী সৈন্য খান্দেশ দেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইল । এই বৎসরই আবুল ফজল রাজাজ্ঞার দক্ষিণাপথ হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় পথিমধ্যে শাহজাদা সেলিমের ষড়যন্ত্রে নিহত হইলেন । পাদশাহ চিরসহচরের অপঘাতে শোকাবুল হইয়া দুই দিন অন্তর পরিত্যক্ত করিলেন ।

খান্দেশ-বিজয় সম্পন্ন হইলে আকবর নিজপুত্র দানিয়ালের নামানুসারে সে দেশের নাম দান্দেশ রাখিলেন, এবং ফতেপুরের রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে খান্দেশ-বিজয়ের স্মারকলিপি উৎকীর্ণ করিলেন । এই স্মারকলিপিতে পাদশাহের বহু গুণাবাদের পর নিম্নলিখিত বাক্যটি খোদিত ছিল । “Said Jesus, (on whom be peace!) The world is a bridge, pass over it, but build no house there. He who hopes for an hour hopes for an eternity. The world is but an hour : spend it in devotion, the rest is unseen.”

খান্দেশ-বিজয়ের চারি বৎসর পরে শাহজাদা দানিয়াল অকস্মাৎ মানবলীলা সংবরণ করিলেন । প্রিয়তম পুত্রের অকালমৃত্যুতে পাদশাহ শোকে মুহমান হইলেন । তিনি দুর্দশায় এই দারুণ শোকতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্তিম শয্যায় পতিত হইলেন । ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দারুণ ব্যাধি তাঁহাকে প্রবলরূপে আক্রমণ করিল ।

তৎকালীন ভিষকশ্রেষ্ঠ হাকিম আলী রাজচিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন । তিনি রোগের লক্ষণসমূহ পরীক্ষাপূর্বক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া রোগীর শারীরিক ভেজ্জেই উহা দূরীভূত হইবে, এই আশা করিয়া অষ্টাহ প্রতীক্ষা করিলেন । নবম দিবসে পাদশাহের দুর্বলতা ও ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়াতে চিকিৎসক বৈদ্যকশাস্ত্রের শরণাপন্ন হইলেন ; কিন্তু কোনও ফললাভ হইল না । উদরায়ণ গুরুতর আকার ধারণ করিল ; এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল । সকলেই বৃদ্ধিতে পারিল যে, পাদশাহের আর জীবনের আশা নাই ।

আকবরের ছ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম ইহার কিছুদিন পূর্বে বিদ্রোহাচরণ করিয়া তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন । পাদশাহ পীড়াক্রান্ত হইলে রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের ভার সচিবশ্রেষ্ঠ খান-ই-আজমের উপর অর্পিত ছিল । রাজা মানসিংহ আকবর শাহের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন ; মোগল দরবারে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল । সেলিমের ছ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু মানসিংহের ভাগিনের ও খান-ই-আজমের জামাতা ছিলেন । পাদশাহের জীবনদীপ নির্বাণিত হইবার উপক্রম হইলে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সেলিমের পরিবর্তে খুসরুকে রাজসিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

পাদশাহ এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া অস্তিম মুহূর্তে রাজসভার সমস্ত ওমরাহকে আপনার শরনকক্ষে আনয়ন করিবার জন্ত সেলিমকে ইঙ্গিত করিলেন । তিনি বলিলেন, “আমার পুত্র ও আমার জীবনের সুখ-দুঃখভাগী রাজপুরুষগণের মধ্যে যে মনোমালিঙ্গ থাকিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না ।” ওমরাহগণ সমবেত হইলে পাদশাহ তাঁহাদের নিকট সমরোপযোগী বাক্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার পর তাঁহাদের প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের কাহাকেও মনঃকষ্ট

দিয়া থাকিলে তজ্জন্ত ক্ষমাভিক্ষা চাহিলেন । ইহার পর সেলিম পাদশাহের পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন । পাদশাহ সেলিমকে স্বীয় প্রিয় তরবারি গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন । অনন্তর পাদশাহের আদেশে সেলিম রাজপরিবার-ভুক্ত মহিলাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে এবং তদীয় পুরাতন বন্ধুগণকে প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । আকবর সেলিমকে উত্তরাধিকারী নিমুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে চিরকালের জন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । “ঈশ্বর তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, ঈশ্বরের নিকটই তিনি প্রতিগমন করিলেন ।” (১)

আকবরের জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল ? আবুল বাকি নামক তাঁহার একজন সভাসদ নির্দেশ করিয়াছেন যে, “His object being to unite all men in common bond of peace.” আকবরের জীবন সফল ; সার্কি তিন শত বৎসরেও যে দেশে মোসলমান শাসন শৃঙ্খলাপূর্ণ ও বদ্ধমূল হয় নাই, তিনি সেই দেশের আপাদমস্তক একহুত্রে গ্রথিত করিয়া মোগলের সিংহাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন ।

(১) কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, আকবর শাহ মানবলীলা-সংবরণ করিবার পূর্বে এনলাম ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্ত অনুতাপপ্রকাশ পুস্তক পুনরায় কলমা পাঠ করেন । ইহা কি বিখ্যাস্য ? যে মোল্লার সাহায্যে আকবর মৃত্যুর পূর্বে কলমাপাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম কাদির জাহান, এবং তিনি নিজেও একজন নব ধর্মবিবাসী ছিলেন । থাকি খাঁ আকবরের পুনরায় এনলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার বিবরণ কিছুই লেখেন নাই । এরূপ কিছু দিগিলে থাকি খাঁ অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন । থাকি খাঁ নির্দেশ করিয়াছেন যে, বদাশুনি আকবরের ধর্মমত সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা তাঁহার বলা কঠবা ছিল না । মোল্লা তাতারসনের সহচর আকবরের যে কুৎসাপ্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি কখনও এনলাম ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্ত অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই ।

আহম্মদ আমিন আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিয়াছিলেন, “আকবর স্বীয় সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক কোণের শাসনকার্য্য দৃঢ়তাসহকারে ও ঋয়ানুমোদিতভাবে নির্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজসভায় সকল প্রকার অবস্থাপন্ন লোকের সমাগম হইত। এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে অনন্তশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রজাবৃন্দ তাঁহার আশ্রয়ে নিরাপদভাবে বাস করিত।” ফলতঃ, ম্যালিসন সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন, “We are bound to recognise in Akbar one of those illustrious men whom Providence sends in the hour of a nation's troubles to re-conduct it into those paths of peace and toleration which alone can assure the happiness of millions.”



জাহাঙ্গীর ।



মোগলকুলরবি আকবর অন্তগত হইলে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর (জগৎজয়ী) উপাধিধারণ করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন । তারতবর্ষের মোগলমান রাজত্ববৃন্দ মধ্যে আকবরের কর্তব্যজ্ঞান সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ছিল । তাঁহার রাজত্বকালে রাজপুত রাজত্বগণের সহিত সৌহার্দ সংস্থাপিত, অবাধ্য সামন্তগণ বশীভূত, প্রজাহিতৈষণা প্রসারিত এবং রাজা প্রজার মধ্যে অবিশ্বাস দূরীকৃত হইয়াছিল । আকবর বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার গৃহীত ব্রত অতি পবিত্র, এবং তৎপ্রতিপালন জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী । তিনি এই কর্তব্য যথাযথরূপে প্রতিপালন জন্য শাসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন । ফলতঃ, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, "Every minute spent in comprehending small things is a minute spent in the service of God." কিন্তু তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর বাক্যে ও কার্যে তাঁহার বিপরীত পন্থাবলম্বী ছিলেন । তাঁহার স্বরচিত জীবন-বৃত্ত পাঠ করিলে এই ধারণা জন্মে যে, তিনি ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করা রাজোচিত গৌরব ও সম্মানের লাঘবজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন । আকবরের জায় কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পুত্রের এক্রপ কর্তব্য-পরায়ুখতা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে । পুত্রের কুশিক্ষার জন্য আকবর কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তিনি জাহাঙ্গীরের চরিত্র সংগঠন জন্য যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন

না। জাহাঙ্গীরের জন্মবিবরণ অলৌকিক। রাজমহিষী (অমরা-
ধিপতির ছুহিতা) বক্ষ্যা ছিলেন। পাদশাহ সিংহাসনারোহণের চতু-
র্দশ বর্ষ তীর্থ দর্শনোপলক্ষে আজমীর অভিযুখে যাত্রা করেন, এবং পুত্র
কামনার রাজমহিষীকে পথিমধ্যে ফতেপুরের সাধুপ্রব্রু সেলিমের
আশ্রমে রাখিয়া যান। কথিত আছে যে, সেলিমের ঈশ্বরারাধনার কালে
রাজমহিষী এই স্থানে পুত্রমুখ সন্দর্শন করেন। রাজকুমার ধর্মপিতার
নানানুসারে সেলিম নামে অভিহিত হন, এবং পাদশাহ তাঁহাকে আদর
করিয়া সেলু বাবা নাম প্রদান করেন। ঈদৃশ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া
ও পরিবর্তিত হইয়া রাজকুমার যে অস্থিরমতি, স্বেচ্ছাচারী, কুসংস্কার-
পন্ন ও সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাহা বিশ্বয়ের বিষয় নহে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সর্ব প্রথম ঘটনা খুসরুর বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ-
দমনকার্যে তাহার শ্রমশীলতা ও নৃশংসতা যুগপৎ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া-
ছিল। পাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, “আমার পিতার
পীড়ার সময়ে কতিপয় অপরিণামদর্শী ব্যক্তি * * * তাহাকে (খুসরুকে)
সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে এবং রাজ্যভার তাহার হাতে সমর্পণ করিতে
মনন করিয়াছিল। * * * খুসরুর ও তদীয় নির্বোধ অনুচরবর্গের
হঃস্বপ্ন অবমাননা ও লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুতেই পরিণত হইতে
পারে না। আমি রাজ্যভার লাভ করিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করি।
* * * তথাপি তাহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি তাহার প্রতি দয়া
প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমার বাসনা বিফল হইয়াছিল।
* * * অবশেষে খুসরু তদীয় সহযোগীগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জেল-
হজ্জ মাসের ২০শ তারিখে আমাকে জানাইয়াছিল যে, সে আমার
পিতার সমাধিমন্দির দর্শন করিবার জন্ত যাইতেছে। * * * কিয়ৎক্ষণ
পরেই সংবাদ পৌঁছিল যে, খুসরু পলায়ন করিয়াছে। * * * যাহা

ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, “কি করিতে হইবে ? আমি কি নিজেই অশ্বারোহণে তাহার পশ্চাদানুসরণ করিব অথবা থরমকে প্রেরণ করিব ?” আমার-উল-ওমরা বলিলেন যে, আমি অনুমতি দিলে তিনি যাইতে পারেন । আমি বলিলাম “আচ্ছা ।” * * * আমি তাঁহাকে প্রেরণ করিলাম । ইহার পর আমার স্মরণপথে পতিত হইল যে, খুসরু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, এবং তিনিও (আমীর-উল-ওমরা) * * * ঈর্ষান্বিত । * * * আমীর-উল-ওমরা ঈর্ষাকুল হইয়া তাহাকে বিনষ্টও করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল । অতএব তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলাম । * * * সংবাদ পাইছিল যে, খুসরু পঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে । পরদিন প্রাতঃকালে আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম, কোন বাধা বিঘ্ন গ্রাহ্য করিলাম না । খুসরু কর্তৃক লাহোর আক্রমণের উদ্যোগের সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করিতে এবং আমাকে সতর্ক করিয়া দিতে দিলওয়ার খাঁ ফরওয়ারদিন মাসের ২৪শে তারিখে আমার নিকট বার্তাবাহক প্রেরণ করিয়াছিলেন । (এই সময় দিলওয়ার খাঁ লাহোর রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন, ও পাদশাহ লাহোর হইতে কিয়দূরে অবস্থান করিতেছিলেন ।) * * * (ইহার) দুইদিন পরে * * * খুসরু নগরের নিকট উপনীত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করে । অবরোধের নবম দিবসে খুসরু নিজের এবং অমুচরবর্গের অনুসরণকারী রাজসৈন্তের আগমনবার্তা পরিজ্ঞাত হয় । অল্প উপায় না থাকাতে খুসরু রাজসৈন্তের সম্মুখীন হওয়াই কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করে । * * * রাজসৈন্ত ও বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয় । * * * ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমি দ্বিধাশূন্য চিত্তে যাত্রা করি । * * * সেতু উত্তীর্ণ হইবার পরেই বিজয়বার্তা শ্রবণ করি । * * * খুসরুর মৃত হইবার

সংবাদ অবগত হইয়া আমি তাহাকে আমার নিকট আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ করি । * * * মিরজা কামারনের চেষ্ঠাতেই আমার নিকট খুসরুকে হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছিল । * * * আমার অনুচর ও সহচরগণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া খুসরু কম্পিত হইতেছিল ও অশ্রুবিসর্জন করিতেছিল ।” এই সময় পাদশাহ তাঁহাকে তদীয় অনুচরবর্গের নাম জিজ্ঞাসা করেন । তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, “আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, আমি তজ্জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি ; সুতরাং বন্ধুগণের নাম প্রদান করিয়া আত্মসম্মান লাভ করিতে ইচ্ছা করি না ।” ইহার পর পাদশাহ তাঁহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন । হাসন বেগ ও আবদুল রহিম নামক ওমরাহদ্বয় খুসরুর প্রধান সহযোগী ছিলেন । পাদশাহের আদেশে হাসন বেগকে ঘৃষের চর্ম্ম মধ্যে ও আবদুল রহিমকে গর্দভের চর্ম্ম মধ্যে পুরিয়া গর্দভপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করান হইল । হাসন বেগ এই অবস্থায় রুদ্ধনিশ্বাস হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন ; কিন্তু আবদুল রহিম ঈশ্বরানুগ্রহে ও বন্ধুগণের সাহায্যে প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন । (১) ইহার পর রাজপথের উভয় পার্শ্বে ত্রিশূল সকল প্রোথিত করিয়া খুসরুর তিন শত অনুচরকে তদুপরি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল । অনুগত অনুচরবর্গের ঈদৃশ নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রদর্শন দ্বারা খুসরুকে ভীতিবিহ্বল ও শোকাবুল করিবার কল্পনার তাঁহাকে

(১) In the excess of his impudence he drew a dog's skin over his face (*i. e.* he acted like a dog,) and as he was led through the streets and bazars, he ate cucumbers and any thing else containing moisture that fell in his hands. He survived the day and night. Next day the order was given for taking him out of the skin. There were many maggots in the skin, but he survived it all. *Ikbāl-nama*.

প্রত্যহ বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হইত । ঈদুশ কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করিয়াও পাদশাহ ইহার পর কিছুদিন অতিবাহিত হইলেই পিতৃ-স্নেহের বশীভূত হইয়া বিদ্রোহী পুত্রকে আংশিক স্বাধীনতা প্রদান করিলেন । কিন্তু ইহার পরেও রাজকুমার পিতার বিরুদ্ধে বার-বার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়াতে তিনি তাঁহারে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিবার জন্য আদেশ দেন । রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে জাহাঙ্গীর তাঁহার বহুলা ও অসুখতাপ দর্শনে ব্যথিতচিত্ত হইয়া চক্ষুর চিকিৎসা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । চিকিৎসাশুণে রাজকুমার পুনর্বার কিঞ্চিৎ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন । জাহাঙ্গীর ইহাতে সন্তোষলাভ করিয়া চিকিৎসকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন ।

রাজকুমার খুসরুর বিদ্রোহ দমিত হইবার অব্যবহিত পরেই (জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বর্ষে) বর্ধমানের জায়গীরদার সের আফগানের হস্তে বাঙ্গলার সুবাদার কুতব উদ্দীন, ও কুতুব উদ্দীনের অনুচরগণের হস্তে সের আফগান নিহত হন । ইহাই জাহাঙ্গীরের জীবনের ও রাজত্বের সর্ব প্রধান ঘটনা । রিয়াজ কর্তা গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, সের আফগান দুর্কার্যে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সম্রাটের আদেশানুসারে কুতব বর্ধমান গমন করেন । এই স্থানে সের তাঁহার আকার ইঙ্গিতে শঙ্কিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে বধ করেন । এবং এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মোগল অনুচরগণ তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করে । জাহাঙ্গীর পাদশাহ সেরের বিধবা পত্নী মেহেরুলনেছাকে পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ করেন । সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা থাকি থা উল্লেখ করিয়াছেন যে, সের আফগানের মৃত্যুর পর পাদশাহ যে তাঁহার পত্নীকে হস্তগত করিবেন, তাহা তাঁহার (সের আফগানের) অবিদিত ছিল না । কোন স্থত্রে সের

এবিষয় অবগত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সেরের সঙ্গে বিবাহিতা হইবার পূর্বে জাহাঙ্গীর মেহেরুলনেছার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আকবরের অভিমত না হওয়ায় মেহেরুলনেছা সের আফগানের সঙ্গে পরিত্যক্ত হন। জাহাঙ্গীর ভগ্নমনোরথ হইয়াও মেহেরুলনেছার মূর্তি মানস পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন না। এবং তাঁহার প্রবল অনুরাগ ও অদম্য আসক্তির সংবাদ সের আফগানের জীবদ্দশাতেই নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। জাহাঙ্গীর পাদশাহের রাজত্বের আরম্ভে মানসিংহ বাঙ্গলার শাসন কর্তৃপদে বৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে অল্প দিনের মধ্যেই রাজধানীতে আহ্বান করেন। রাজা মানসিংহকে কেন বাঙ্গলা দেশ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল, তাহার কোন কারণ জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবনবৃত্তে উল্লেখ করেন নাই। মানসিংহের পর তাঁহার একান্ত প্রীতিভাজন ও অনুরাগ কুতব উদ্দীন বাঙ্গলার শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত হন ; এবং তিনিই সের আফগানের হত্যার কারণ স্বরূপ হইয়াছিলেন। এজন্য কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, মেহেরুলনেছার লোভেই জাহাঙ্গীর সেরকে নিহত করাইয়াছিলেন।

(১) আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুল ফজল জাহাঙ্গীরের ঘড়যত্রে নিহত হইয়াছিলেন। পাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে এই গুরুতর অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু সের আফগানের হত্যাকাণ্ডে তাঁহার ইঙ্গিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। (২) সম সাময়িক ইকবলনামার লেখক এবং মোহাম্মদ হাদি খাঁ উভয়েই সেরের হৃদয়ই তাঁহার হত্যার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) বিধবা মেহেরুলনেছা পাদশাহের নিকট নীত হইবার পর চারি বৎসর পর্যন্ত তিনি তাঁহার মুখাবলোকন করেন নাই, এবং তাঁহার ভরণ

পোষণের জন্য অতি সামান্য ব্যক্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন । এই তিন কারণে গ্রীষ্মক ক্রিন সাহেব জাহাঙ্গীরকে সের আফগানের হত্যাকাণ্ডে নিশাপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । (১) আবুল ফজল এসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোষণা করিয়াছিলেন ; এজন্য তিনি মোসলমান সমাজে একান্ত হেয় ছিলেন । আবুল ফজল জাহাঙ্গীরের উন্নতির পথের কণ্টক স্বরূপ ছিলেন । মোসলমান পাদশাহগণ রাজনৈতিক উন্নতির পথের কণ্টক তরবারি হস্তে উন্মূলিত করিতেন ; মোসলমান সমাজে তাদৃশ কার্য্য বড় নিন্দনীয় ছিল না । সুতরাং আবুল ফজলকে হত্যা করার জন্য জাহাঙ্গীরকে পরিবাদগ্রস্ত হইতে হয় নাই, বরং কাকের তুল্য আবুল ফজলকে হত্যা করার জন্য তিনি গোড়া মোসলমান সমাজে প্রণাসভাজনই হইয়াছিলেন । কিন্তু মোসলমান সমাজে স্বীকৃতিতে কাহাকেও হত্যা করা চিরকালই একান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত থাকে । সুতরাং জাহাঙ্গীর লোকাপবাদ ভয়ে সেরের হত্যাকাণ্ডে স্বীয় সংশ্রবের কথা গোপন করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব নহে । (২) ইকবলনামা জাহাঙ্গীরের অদেশে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার লেখক মোগল দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন । প্রভু যে বিষয় গোপন করিবার জন্য অভিলাষী ছিলেন, তাহা তিনিও প্রচার করিতে পারেন নাই । মোহাম্মদ হাদি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের, বিশেষতঃ ইকবলনামার অবিকল অনুকরণ করিয়াছিলেন । (৩) মোহাম্মদ হাদি নির্দেশ করিয়াছেন যে, পাদশাহ কুতবের শোকে অধীর হইয়া মোহরুলনেহার সঙ্গে অসদ্যবহার করিয়াছিলেন । আকবর দীর্ঘকাল অপূরক ছিলেন । তাহার পর সেখ সেলিম সাধুর কৃপায় পুত্রসন্তান লাভ করেন । এই পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর ।

কুতব সাধু সেলিমের জামাতা ও জাহাঙ্গীরের খাজী-পুত্র । তাঁহার আজন্ম একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন । তাদৃশ অন্তরঙ্গ ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকে অধীর হওয়া অসম্ভব নহে । কিন্তু যদি মেহেরুলনেছার অতুল রূপরাশি মুখ্য অথবা গৌণ ভাবেও কুতবের বিনাশের কারণ না হয়, তবে পাদশাহ যে নিরপরাধা বিধবাকে রাজাস্তঃপুরে বন্দি করিয়া ছিলেন, তাহা বিচিত্র বটে । মেহেরুলনেছা তেজস্বিনী বীর রমণী ছিলেন । শোকাবেগে প্রথমে স্বামীহস্তার সঙ্গে পরিণীতা হইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করাও অসম্ভব ছিল না ।

যাহা হউক, মেহেরুলনেছার চারি বৎসর রাজাস্তঃপুরে অবস্থিতি করার পর জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মহা সমারোহে পরিণয়মন্ত্রে আবদ্ধ করেন । পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইবার পর জাহাঙ্গীরের উপর বেগমের অতুল প্রভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল । পাদশাহ তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যো হস্তক্ষেপ করিতেন না । বস্তুতঃ কখন কোন রাজমহিষী মোসলমান নরপতির উপর তাঁহার স্থায় সর্বতোমুখ প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহের স্থল । ইতিহাসবেত্তা হাদি খাঁ লিখিয়াছেন, “তিনি অচিরে পাদশাহের প্রিয়তমা মহিষী হইয়া উঠেন । তিনি প্রথমতঃ নূরমহাল (the Light of the Palace,), এবং তাহার পর অল্পদিন মধ্যেই নূরজাহান বেগম (the Queen, the Light of the World) উপাধিতে ভূষিত হন । তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হন । * * * পাদশাহ ও তদীয় আত্মীয়-বর্গ সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত হন, এবং ইতিমদ উদ্দোলার (নূরজাহানের পিতা গিয়াসবেগ) ভৃত্য ও খোজা সকল খাঁ ও তুর খাঁ পদবী লাভ করে । দিলরাণী নামী প্রাচীনা দাসী পাদশাহের প্রিয়তমা মহিষীকে

প্রতিপালন করিয়াছিলেন । তিনি হাজি কোকাকে অতিক্রম করিয়া রাজপ্রাসাদের দাসীদের অধিনেত্রীপদ প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার মোহর (মোহর যুক্ত অমুমতি পত্র) ব্যতীত সদ্-উস-সদূর তাহাদের বেতন প্রদান করিতেন না । নূরজাহান রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতেন, সর্ব্বপ্রকার সম্মান বিতরণের ভার তাঁহার হস্তেই সংশ্লিষ্ট ছিল, নূরজাহান স্বাধীন নরপতির ভূলাই ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন । কেবল তাঁহার নিজ নামে খোতবা পঠিত হইত না । ইহা ভিন্ন তাঁহার আর কোনও অভাব ছিল না ।

কিছুকালের জন্ত তিনি ঝারোকর (Balcony) পার্শ্বেও উপবিষ্ট থাকিতেন, এবং আমীর ওমরাহবর্গ তাঁহাকে অভিবাদন করিতে, এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিতে আগমন করিতেন । তাঁহার নাম সংযোগে রাজমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল । (১) এবং সনদের রাজকীয় মোহরও তাঁহার স্বাক্ষরে শোভিত হইত । সংক্ষেপে তিনি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের অবিসম্বাদিত অধিশ্বরী হইয়াছিলেন,—একমাত্র রাজনাম তাঁহার ছিল না । পাদশাহ নিজে তাঁহার হস্তে ক্রীড়ণকে পরিণত হইয়াছিলেন । তিনি বলিতেন, রাজকার্য্য নির্বাহ করিবার জন্ত তিনি (বেগম) মনোনীতা হইয়াছেন এবং তিনি তৎপরিচালনে উপযুক্ত ; কেবল এক বোতল মদ এবং এক টুকরা মাংসই আমার নিজের সন্তোষবিধানের পক্ষে যথেষ্ট ।

নূরজাহান সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন । যাহারা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইত, তাহাদের সকলের প্রতিই তিনি গ্ৰায়বতী ও দানশীল ছিলেন ।

(১) রাজমুদ্রায় জাহাঙ্গীরের নামের পার্শ্বে নূরজাহানের নামও অঙ্কিত থাকিত । যে মনোরম বাক্যসহ নূরজাহানের নাম অঙ্কিত থাকিত তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি ।

"By order of the Emperor Jahanger gold acquired a hundred times additional value in the name of the Emperors Noor Jehan."

তিনি নিপীড়িতের আশ্রয়স্থল ছিলেন ; এবং অনেক উপায়হীনা বালিকা তাঁহার নিজস্ব অর্থসাহায্যে পরিণীতা হইয়াছিল । তিনি তাঁহার জীবনে প্রায় পাঁচ শত বালিকাকে যৌতুক প্রদান করেন ; এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার সদাশয়তার উপকৃত ও কৃতজ্ঞ ছিল ।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাসন সংরক্ষণকার্য্যে আকবর প্রবর্তিত সুব্যবস্থাই অনুসৃত হইয়াছিল ; এবং প্রধান রাজপুরুষগণ সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থভাবে নিরত ছিলেন । যদিও পাদশাহ নিজে অলস, বিলাসপটু, ও নৃশংস ছিলেন ; তথাপি পূর্বোক্ত কারণদ্বয়ে তাঁহার শাসনকালে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে,—অস্ত্রব্যয়িত্ব ও কৃষিকার্য্যে উন্নতিমার্গে ক্রমশঃ ধাবিত হয়, এবং সর্বত্র পূর্ণশান্তি বিরাজ করে । প্রধানতঃ চারিজন কৰ্ম্মনামকের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নেই সাম্রাজ্যের তাদৃশ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । উজীর গিয়াসবেগ, মন্ত্রী আসফ খাঁ, সেনাপতি মহাবত খাঁ এবং রাজকুমার খরম, এই চারি ব্যক্তিকেই জাহাঙ্গীরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি, বৈভব ও শৃঙ্খলার মূলধার ছিলেন ।

গিয়াসবেগ নূরজাহানের পিতা, নূরজাহানের প্রাধান্যই তাঁহার উজিরী পদপ্রাপ্তির কারণ । কিন্তু তিনি সর্বতোভাবে এই পদের উপযুক্ত ছিলেন । তাঁহার চরিত্রে সাধুতা ও রাজকার্য্যে দক্ষতা ছিল । তিনি একজন স্মারপরাঙ্গ ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন । গুণগ্রাহী প্রজাপুঞ্জ তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তদীয় নামোচ্চারণে তাহাদের হৃদয় প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারসে উচ্ছ্বসিত হইত ।

আসফ খাঁ নূরজাহানের ছোট ভ্রাতা । ইহার উন্নতির মূলেও নূরজাহানের প্রাধান্য বর্তমান । কিন্তু ইনিও পিতার স্মার রাজনীতি বিশারদ সুদক্ষ রাজকৰ্ম্মচারী ছিলেন । আসফ খাঁ প্রজারঞ্জনই জীবনের

মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন, — অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্বদা ছুটির দমন ও শিষ্টের পালনে নিরত থাকিতেন ।

মহাবত খাঁ পাঠান কুলোদ্ভব ও নূরজাহানের আশ্রিত ছিলেন । তাঁহার ইচ্ছিতেই মহাবতের ভাগালক্ষী স্ত্রীসম্মা হইয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহার এই অনুগ্রহ অপাত্রে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল না । তৎকালীন রাজ-পুরুষগণ মধ্যে মহাবত খাঁই সর্বাধিক্য প্রতিভা-সমুজ্জল ছিলেন । তাঁহার কার্যদক্ষতা, তেজস্বিতা ও সাহসিকতা মোগল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । মহাবত খাঁ পাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন ।

রাজকুমার খরম পাদশাহের তৃতীয় পুত্র এবং রণকুশল তেজস্বী বীরপুরুষ । আকবর শাহ এক মিবার বাতীত সমগ্র রাজস্থান বশীভূত করিয়াছিলেন । মিবরাধিপতি স্বদেশ-প্রাণ প্রতাপ সিংহের অলৌকিক বীরত্বে আকবর তথায় প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিলেন না । জাহাঙ্গীর মিবার বশীভূত করিয়া রাজস্থান বিজয় সম্পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হন, এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজকুমার খরমের অধীনে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন । প্রতাপপুত্র অমর সিংহ পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড পরাক্রমে দণ্ডায়মান হন, কিন্তু পরাক্রান্ত শত্রুর হস্তে বারবার পরাজিত হইয়া গতাস্বর না দেখিয়া অবশেষে মোগলের বশ্যতাস্বীকার করেন । মিবার বিজয় হইতেই খরমের সৌভাগ্যের সূচনা । পাদশাহ তাঁহার কার্যে প্রীতীলাভ করেন, তিনি পুরস্কার স্বরূপ রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হন । ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে মিবার বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল । আকবর শাহ দক্ষিণাপথের স্বাধীন মোসলমান রাজ্যসমূহ অধিকার করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রথমতঃ দক্ষিণাপথের অন্ততম রাজ্য আমেদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

এদেশের কিয়দংশে মোগল-পতাকা উড্ডীন হইলেও আকবর সন্ধি স্থাপন করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর মালিক আদার নামক জনৈক সেনাপতি অস্ত্র ধারণ করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধবোধনা করেন। জাহাঙ্গীর লুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথে সৈন্ত প্রেরণ করেন ; কিন্তু মালিক আদারের নিকট মোগলশক্তি প্রতিহত হয়। শত্রুহস্তে মোগল সৈন্ত বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া পাদশাহ একান্ত ম্রিয়মান হয়। তিনি শত্রুকে নির্যাতন করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিরত ছিলেন, এমন সময় শাহজাদা খরম মিবর বিজয় সম্পন্ন করিয়া নবোদিত সূর্যের স্থায় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পাদশাহ দক্ষিণাপথের দুরূহ কার্যেও খরমকেই নিরোজিত করিলেন। এবারও বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্গশায়িনী হন ; এবং মালিক আদার বিজিত স্থানসমূহ খরমের হস্তে সমর্পণ করেন। শাহজাদা এইরূপে স্বকার্য সুসম্পন্ন করিয়া মহা গৌরবে পিতৃ-মন্নিধানে প্রত্যাবর্তন করেন। মিবর বিজয়ে খরমের যে সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় হইয়াছিল, আমেদনগরে মালিক আদারের পরাজয়ে তাহা মধ্যাহ্নাকাশে সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাগত হইবার পর প্রথম দর্শনে পাদশাহ প্রিয়পুত্রকে বারম্বার দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন না। মিবরের রাণাকে বশীভূত করিয়া খরম বিংশ সহস্র পদাতিক ও দশ সহস্র অশ্বরোহী সৈন্তের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিবার সময় পাদশাহ তাঁহাকে শাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি রাজপ্রসাদ স্বরূপ ত্রিশ সহস্র পদাতিক ও বিংশতি সহস্র অশ্বরোহী সৈন্তের অধিনায়কতা ও শাহজাহান (the Lord of the World) উপাধিলাভ করেন। পাদশাহ এই সকল অমুগ্রহ বর্ষণ করিয়াও

পরিতৃপ্ত না হইয়া দরবারের সময় রাজ সিংহাসনের পার্শ্বেই খরমকে পৃথক আসন প্রদান করেন ;—ঈদৃশ রাজসম্মান সম্পূর্ণ অভিনব ছিল, ইহার পূর্বে তৈমুরবংশীর আর কোন রাজকুমার রাজ সিংহাসনের পার্শ্বে পৃথক আসনে উপবিষ্ট হইতে পারেন নাই । শাহজাহান জাহাঙ্গীরের কিদৃশ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা আর একটি ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । পাদশাহ একান্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন ; মৃগয়ায় ব্যাপৃত হইয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন । একদা শাহজাহানের একটি পুত্র জীবনসংশয় কাতর হইলে পাদশাহ পোত্রেয় আরোগ্যকামনায় স্বার্থত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নিকট শপথ পূর্বক মৃগয়া পরিত্যাগ করেন, তাহার পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর কাল তিনি এই অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়াছিলেন ।

যে চারিজন কৰ্ম্মনায়কের চেষ্টা ও যত্নে জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব ও বৈভব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গিয়াস বেগ ও আসফ খাঁ পাদশাহের অন্তরঙ্গ কুটম্ব, মহাবত খাঁ তাহার নিঃসম্পর্কীয় হইলেও একান্ত প্রীতিভাজন, এবং শাহজাহান তাহার প্রাণাধিক পুত্র ছিলেন । ফলতঃ, তাহারা যে কেবল মাত্র মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, তাহা নহে ; পাদশাহের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনেও আবদ্ধ ছিলেন । কিন্তু নূরজাহান বেগম পাদশাহকে প্রণয়ের কুহকমন্ত্রে একরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহার প্রয়োজনায় শাহজাহানের শ্রায় সময়ক্ষেত্রের প্রধান অবলম্বন প্রাণাধিক পুত্রকে এবং মহাবত খাঁর শ্রায় প্রীতির আশ্রয় ও কার্যক্ষেত্রের প্রধান সহায় সেনাপতিকেও হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই । আমরা সে বিচিত্র কাহিনী এখানে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দক্ষিণাপথে আমেদনগর

রাজ্যে মালিক আদার যুদ্ধঘোষণা করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহার দমন জন্ত সৈন্য প্রেরণ করেন ; এবং প্রথমতঃ মোগল সৈন্য শত্রুহস্তে পরাজিত হয়, ও তারপর শাহজাহান তথায় গমন পূর্বক মোগলের লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিয়া পিতৃ সন্নিধানেন প্রত্যাবৃত্ত হন । এই ঘটনা জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে, অর্থাৎ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে, সংঘটিত হইয়াছিল ।

ইহার কতিপয় বৎসর পরে, ১৬২১ খৃষ্টাব্দে, মালিক আদার পুনর্বার দক্ষিণাপথে গোলযোগ উপস্থিত করিলে, পাদশাহ শাহজাহানকে দ্বিতীয়বার দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিলেন । এবারও বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন, তিনি নানাপ্রকারে মালিক আদারকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন । কিন্তু সে গোলযোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইবার পূর্বেই তিনি নুরজাহানের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইলেন ।

জাহাঙ্গীরের পর মোগল সাম্রাজ্য করতলগত করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা শাহজাহান হৃদয়ের নিভৃত কোণে পোষণ করিতেন, ইহা তীক্ষ্ণদর্শিনী নুরজাহানের অপরিজ্ঞাত ছিল না । জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু বিদ্রোহ অবলম্বনের পর হইতে বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন । দক্ষিণাপথের তৃতীয় যুদ্ধকালে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন । দ্বিতীয় পুত্র প্রবেজের প্রতি পাদশাহ প্রীতিমান ও সন্তুষ্ট ছিলেন না । বিশেষতঃ তিনি একজন উচ্চাশাবিহীন নিরীহ প্রকৃতি ছিলেন । সুতরাং তৃতীয় পুত্র শাহজাহানের সাম্রাজ্যলাভের আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা ছিল । শাহজাহান নুরজাহান বেগমের তাদৃশ অমুগত ছিলেন না । সের আফগানের ঔরসজাতা নুরজাহানের এক কন্যা ছিল । পাদশাহের চতুর্থ পুত্র শাহ-রিয়ার তাঁহাকে রাজাদেশে পরিণয়মুত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । শাহ-রিয়ার নুরজাহানের একান্ত অমুগত ছিলেন । শাহজাহান সিংহাসনে

উপবিষ্ট হইলে নূরজাহানের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিনুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল ; পক্ষান্তরে, শাহরিয়ার পিতৃপদের অধিকারী হইলে আজীবন তাঁহার (নূরজাহানের) অঙ্গুগত থাকিবেন বলিয়াই লোকে বিশ্বাস করিত। এজন্য নূরজাহান শাহরিয়ারকে সাম্রাজ্যে স্থায়ী করিয়া স্বীয় প্রাধান্য ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শাহজাহান তাঁহার আশার কণ্টক স্বরূপ ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, শাহজাহান পাদশাহের নিটক থাকিতে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবার আশা সুদূর-পর্যন্ত। যখন শাহজাহান দ্বিতীয়বার দক্ষিণাপথে সংগ্রামক্ষেত্রে ব্যাপ্ত, সেই সময় পারস্তাধিপতি মোগলের হস্ত হইতে কান্দাহার কাড়িয়া লইলেন। নূরজাহান সম্রাটের নিকট হইতে শাহজাহানকে দূরবর্তী করিবার ইহাই উত্তম সূযোগ মনে করিয়া, তাঁহাকে কান্দাহারের উদ্ধার জন্য প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। পাদশাহ শাহজাহানকে কান্দাহারে গমন করিতে আদেশ করিলেন। শাহজাহান এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিতে পারিলেন যে, তাঁহার সিংহাসনারোহণের পথে কণ্টক রোপণ করিবার অভিপ্রায়েই নূরজাহান চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে দূরদেশে প্রেরণ করিতেছেন। সুতরাং তিনি রাজ্যদেশ প্রতিপালন করিতে কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। বেগম এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পিতা পুত্রে মনোমালিণ্য ঘটাইয়া দিলেন ; তাহার ফলে পাদশাহ তাঁহার সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন।

অতঃপর শাহজাহান বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পশ্চিমবঙ্গে রাজসৈন্তের সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। শাহজাহান রাজ-সৈন্তের হস্তে পরাজিত হইয়া দক্ষিণাপথে পলায়ন করিলেন। শাহজাদা প্রবেজ ও সেনাপতি মহাবত খাঁ রাজ্যদেশে তাঁহার পশ্চাদ্গমন

করিতে লাগিলেন । দক্ষিণাপথের কোন নরপতি অথবা শাসন-
কর্তা শাহজাহানের পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি
অনন্তোপায় হইয়া উড়িষ্যার পথে বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন । এই
সময় নূরজাহানের অন্ততম ভ্রাতা এব্রাহিম ফতেজঙ্গ বঙ্গদেশের শাসন
কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি প্রবল পরাক্রমে শাহজাহানের গতি-
রোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন । কিন্তু অবিলম্বে রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে
নিহত হইলেন । রাজ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল । সমগ্র বঙ্গদেশ
রাজকুমারের পদানত হইল । তিনি তথায় স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োজিত
করিয়া বিহার অভিযুগে যাত্রা করিলেন । তত্রতা রাজপুরুষগণ রাজ-
কুমারের আগমনবার্তা ও বঙ্গদেশ বিজয়ের সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া ভয়-
ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিলেন । শাহজাহান বিহারের বন্দোবস্ত করিয়া
সগৌরবে রাজধানী অভিযুগে যাত্রা করিলেন । এলাহাবাদের নিকট
বড়ী জুসি নামক স্থানে শাহজাদা প্রবেজ ও সেনাপতি মহাবত খাঁর
অধীনে রাজ-সৈন্য তাঁহার সম্মুখীন হইল । তুমুল যুদ্ধে শাহজাহান
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া
গেল । শাহজাহান পুনর্বার দক্ষিণাপথে গমন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের
চিরশত্রু মালিক আশ্বারের সঙ্গে যোগ দিলেন । পাদশাহ পুত্রের
পরাজয় সংবাদে প্রীত হইয়া মহাবত খাঁকে বঙ্গদেশের সুবাদারি পদে
নিযুক্ত করিলেন ; কিন্তু শাহজাহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হওয়া
পর্যন্ত তাঁহাকে যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিতে, ও তদীয় পুত্র খানজাদ খাঁকে
প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্য নির্বাহ করিতে আদেশ করিলেন ।

কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই মহাবত খাঁর দুর্দশার সূত্রপাত হইল ।
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহরিয়ারকে রাজপদে বরণ করিবার বিষয়ে মহা-
বত খাঁ নূরজাহানের যতাবলম্বী ছিলেন না ; এবং তাঁহার সঙ্গে আসফ

খাঁর মনোমালিন্য ছিল । এ জন্ত তাঁহারা উভয়েই মহাবত খাঁর অহিত-
কামী ছিলেন । শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধকালীন বহুসংখ্যক হস্তী মহাবত
খাঁর হস্তগত হইয়াছিল । তিনি এই সকল হস্তী যথাসময়ে পাদশাহের
নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন না । নূরজাহান এবং তদীয় ভ্রাতা এই
উপলক্ষে মহাবত খাঁকে রাজদ্রোহী ও রাজস্ব অপহরণকারী বলিয়া
প্রতিপন্ন করিয়া তুলিলেন । পাদশাহ তাঁহাদের প্ররোচনায় তাঁহাকে
আবরুদ্ধা পৱিত্যাগ করিয়া অগোপে দরবারে হাজির হইবার জন্ত
আদেশ দিলেন । এই আদেশপত্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধিতে পারি-
লেন যে, তিনি শত্রুর ষড়যন্ত্রে পাদশাহের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া-
ছেন । এ জন্ত তিনি আবশ্যক হইলে পাদশাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান
হইবার কল্পনায় তাঁহার কার্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ পঞ্চ সহস্র অসমসাহসী
রাজপুত যোদ্ধা সমভিব্যাহারে রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন । এই সময়
পাদশাহ কাবুলে গমন করিতেছিলেন । পশ্চিমধ্যে ঝিলামের তটে
মহাবত খাঁ রাজশিবিরে উপনীত হইলেন । কিন্তু আসফ খাঁর চক্রান্তে
রাজদর্শনলাভ করিতে পারিলেন না । মহাবত খাঁ রাজার অনুমতি না
লইয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন । পাদশাহ তজ্জন্ত তদীয় জামা-
তাকে বেত্রদণ্ড বিধান করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন । এই সকল
ঘটনায় মহাবত খাঁ বুদ্ধিতে পারিলেন, পুনর্বার জাহাঙ্গীরের প্রীতিলাভ
করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । তখন তিনি স্থির করিলেন, বলপূর্বক পাদশাহকে
হস্তগত করিবেন । এই সময় পাদশাহ একদিন প্রত্যুষে ঝিলামের তটে-
দেশ পরিত্যাগ করিয়া কাবুল অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন । পাদ-
শাহের শিবিরের সম্মুখে ঝিলাম,—ঝিলামের অপর পার হইতে কাবুলের
পথ । প্রথমতঃ সৈন্তগণের এবং তৎপশ্চাতে পাদশাহের ঝিলাম উত্তীর্ণ
হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল । তদনুসারে সৈন্তগণ অতি প্রত্যুষে পাদশাহ

ও তদীয় পার্শ্বচরদিগকে শিবিরে রাখিয়া নো-সেতু যোগে ঝিলাম উত্তীর্ণ হইল । রাজসৈন্য অপর তীরে উপনীত হইবামাত্র মহাবত খাঁ রাজপুত সৈন্যের সাহায্যে নো-সেতু ভগ্নাভূত করিয়া পাদশাহকে অবরুদ্ধ করিলেন । এই সময় নুরজাহান বেগম পাদশাহের সঙ্গে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, মহাবত খাঁ পাদশাহকে অবরুদ্ধ করিতেই ব্যাপৃত ছিলেন, অত্ৰ্যদিকে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ ছিল না । বেগম এই সুযোগে অত্ৰ্যের অলক্ষ্যে ঝিলাম পার হইয়া অপর তীরে রাজসৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন ।

বেগম তথায় উপনীত হইয়া ওমরাহদিগকে সমবেত করিলেন ; তাঁহারা অপরিণামদর্শীর ন্যায় পাদশাহকে পশ্চাতে রাখিয়া ঝিলাম উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত ভৎসনা করিলেন, এবং মহাবতের হস্ত হইতে স্বামীর উদ্ধারসাধন জন্য তাঁহাকে পর দিবস সৈন্য আক্রমণ করিতে সচেষ্ট হইলেন । তদনুসারে পরদিন প্রত্যুষে উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । বেগম স্বয়ং গজারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সৈন্যদিগকে কেবল উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন । তিনি কেবল উৎসাহ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, নিজেও শত্রু সৈন্যমধ্যে ক্ষিপ্ৰহস্তে তীরনিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ক্রমাগত তিনজন হস্তিচালক শত্রুনিষ্ক্ষিপ্ত শরে নিহত হইল, তথাপি বেগমের অদম্য তেজ প্রতিহত হইল না, তিনি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তেজস্বিনী বীররমণী স্বামীর উদ্ধারকল্পে যুদ্ধক্ষেত্রে শৌধ্যবীৰ্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না । রাজপুত সৈন্যের প্রবল আক্রমণে রাজসৈন্য বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল । অগত্যা নুরজাহান লাহোর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

মহাবত খাঁ পাদশাহকে বন্দী করিয়া মগৌরবে কাবুল অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। যদিও তিনি পাদশাহকে বন্দী করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে কখনও ত্রুটি করিতেন না। পাদশাহের রাজপদোচিত সম্মান ও মর্যাদা দৃষ্টতঃ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল; আরামপ্রিয় সম্রাটের পক্ষে তাহাই পর্যাপ্ত হইল। জাহাঙ্গীর মহাবত খাঁর সঙ্গে আপনার সম্প্রীতির বর্ণনা করিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্ত কোনও উদ্যোগ করিতে নিষেধ করিয়া বেগমকে পত্র লিখিলেন, এবং বেগমকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলেন।

নূরজাহানের লাহোর পঁছছিবার কতিপয় দিবস পরেই এই রাজ-লিপি তাঁহার হস্তগত হইল; এবং তিনি রাজ্যদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পাদশাহের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্ত যাত্রা করিলেন। নূরজাহান কাবুলের পথে রাজশিবিরে উপনীত হইলে, মহাবত খাঁ তাঁহাকে রাজ-দর্শন করিতে দিলেন না। তিনি বেগমের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভি-যোগ আনয়ন করিলেন। (১) মহাবত জাহাঙ্গীরকে বলিলেন, “জাঁহা-পনা, মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, আমরা আপনাকে লোকাভীত কম তাপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। ঈশ্বরের অনুকরণে আপনার কাজকরা কর্তব্য। আপনি ব্যক্তি বিশেষের সম্মান রক্ষক নহেন।” বেগমের যে মোহিনী শক্তিতে পাদশাহ অভিভূত ছিলেন, অদর্শনের

(১) That she had conspired against the Emperor by estranging the hearts of his subjects : that most cruel and unwarrantable actions had been done, by her capricious orders in every corner of the empire, that her haughtiness was the source of public calamities, her malignity the ruin of many individuals : that she had even extended her views to the Empire by favouring the succession of Shahariar to the throne, under whose feeble administration she hoped to govern India at pleasure.

ফলে তাহা অপসারিত হইয়াছিল। তদ্বিধা তিনি মহাবত খাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিলেন। এজন্য তিনি মহাবত খাঁর অভিযোগ শ্রবণ করিয়া বেগমের প্রাণদণ্ডের জন্য আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই ভীষণ সংবাদ বেগমের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, “দন্দী নরপতি প্রাণদণ্ড বিধানের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। একবার আমাকে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, এবং তিনি যে হস্তে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেই হস্ত অশ্রুসিক্ত করিতে দাও।” মহাবত খাঁর সাক্ষাতে নূরজাহান পাদশাহের নিকট আনীতা হইলেন। মানসিক যজ্ঞগায় তাঁহার সৌন্দর্য্য চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি একটি বাকাও উচ্চারণ করিলেন না। জাহাঙ্গীর বাম্পাকুল লোচনে বলিলেন, “মহাবত, তুমি কি এ রমণীর জীবনরক্ষা করিবে না? দেখ, নূরজাহান কিরূপ অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।” মহাবত খাঁ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “মোগলাধিপতির যাক্সা কখনও বিফল হইতে পারে না।” ইহার পর নূরজাহান প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

অতঃপর পাদশাহ কাবুলে উপস্থিত হইলেন। অল্প বৎসর কাবুলে অতিবাহিত করিয়া তিনি লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। জাহাঙ্গীর মধুর প্রকৃতি ও ক্ষমাশীল ছিলেন। এজন্য মহাবত খাঁর সঙ্গে তাঁহার মিলন হইয়াছিল; তিনি তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রীতি ও সদাশয়তা প্রদর্শন করিতেন। মহাবত খাঁ পাদশাহের প্রসাদলাভ করিয়া আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যদি বেগম পাদশাহকে গোপনে মহাবত খাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন, তবে তাহা তিনি অকপটভাবে প্রকাশ করিয়া দিতেন। এই সব কারণে মহাবত খাঁ নিঃশঙ্ক ও নিঃসন্দেহ হইয়া অসতর্ক হইয়া পড়িলেন, এবং সম্রাটকে হস্তামলকের

জাহাঙ্গীর স্বীয় করতলগত রাধিবার জন্ত যে রাজপুত্র সৈন্যদল পালন করিতে-
ছিলেন, তাহার সংখ্যাহ্রাস করিয়া ফেলিলেন । নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে
মহাবতের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত একদিনের নিমিত্তও
নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । মহাবত খাঁকে অসতর্ক দেখিয়া স্নকোশলে
তাঁহার অধীনতাপাশ ছিন্নকরিয়া ফেলিলেন । মহাবত খাঁ প্রাণভয়ে
অধীর হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । আসফ খাঁ
তাঁহার দুরবস্থা অবলোকনে কৃপাপরবশ হইয়া পাদশাহের সঙ্গে তাঁহার
পুনর্শিলন ঘটাইয়া দিলেন ।

এই সময় পিতৃদ্রোহী শাহজাহান দক্ষিণাপথে নানারূপ উৎপাত
করিতেছিলেন । তাঁহাকে দমন করিবার জন্ত মহাবত খাঁ ও শাহজাহান
প্রবেশ পুনর্বার নিয়োজিত হইলেন । কিন্তু দক্ষিণাপথে পঁচছিব্বার পূর্বেই
প্রবেশ অতিরিক্ত সুরাপান নিবন্ধন অকালে কালগ্রাসে পতিত হই-
লেন । এদিকে শাহজাহান পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া সমস্ত মনো-
বাদের মূলচ্ছেদ করিলেন । শাহজাহান ও মহাবত খাঁ উভয়েই বিজোহ
অবলম্বন করিয়াছিলেন । মহাবত খাঁ পূর্বেই পাদশাহের ক্ষমাতাভ
করিয়াছিলেন ; এক্ষণ শাহজাহানও পুনর্বার রাজানুগ্রহ লাভ করিলেন ।
কিন্তু কাহারও ভাগ্যে পূর্ব-গৌরব ও মর্যাদা আর ফিরিয়া আসিল
না । অবস্থার সোসাদৃশ্য বশতঃ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত
হইল ; এবং তাঁহারা দক্ষিণাপথে পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া নির্বাপিত
দীপের দশাবৎ অসহ দুঃখে ধূমিত হইতে লাগিলেন ।

মহাবত খাঁ ও শাহজাহানের সম্মিলনের পর জাহাঙ্গীর অল্প
দিন জীবিত ছিলেন । রাজত্বের ষোড়শতম বর্ষে তিনি স্বাস্থ্যকালে
প্রবল ভাবে আক্রান্ত হন । তিনি এই ব্যাধির দারুণ যন্ত্রণা নিবারণ
জন্ত অনবরত মন্ত্রপান করিতে আরম্ভ করেন ; কিন্তু নূরজাহান অচিরে

তাহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়া চিকিৎসার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন। পাদশাহ লিখিয়াছেন যে, তিনি (বেগম) বুদ্ধিমত্তা ও বহুদর্শিতায় চিকিৎসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সত্রেম সেবায় চিকিৎসা-বিনোদন করিয়া সুরার মাত্রা হাস ও ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে যত্নবতী হন। রাজমহিষীর অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষায় তাহার পীড়া উপশান্ত হয়, কিন্তু তিনি কখনও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে খল পীড়া ছয় বৎসর পরে পুনর্বার প্রবলাকারে দেখা দিল। এই বৎসরের মার্চ মাসের একাদশ দিবসে পাদশাহ কাশ্মীর যাত্রাকালে পথিমধ্যে চিনাবের তটদেশে স্বীয় রাজত্বের দাবিংশ-তিতম বার্ষিকোৎসব সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু এই প্রমোদ উৎসবে রোগ-ক্লিষ্ট সম্রাটের হৃদয়তলে আনন্দ উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উঠিল না; ব্রহ্ম-ক্ষেত্রের মোহনদৃশ্য, মণিমুক্তার ঔজ্জ্বল্য ও সজ্জাপাটের কারুকার্য তাহার তেজোহীন নয়নে সৌন্দর্যের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিল না। নর্তকীর নূপুর নিকণ ও কামিনীর কমণীয় কণ্ঠের কাকলী তাহার শিথিল কর্ণ বিবরে সুধাধারা ঢালিল না। অহিফেণ তাহার যন্ত্রণা উপশমে শক্তিহীন হইয়া পড়িল, এবং সুরার প্রভাবে তাহার ইন্দ্রিয় আর উত্তেজিত হইত না। তিনি ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের স্বাস্থ্যপ্রদ জল বায়ুতে আরোগ্য-লাভের কামনায় শীঘ্রগামী হইলেন; কিন্তু পার্শ্বত্যা জলবায়ু তাহার ভগ্নদেহে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে পারিল না। শীত-সমাগমে সম্রাট লাহোর অভিমুখে পুনঃ যাত্রা করিলেন। বৈরামকিনা নামক স্থানে উপনীত হইয়া পাদশাহ যুগয়ার নিমিত্ত কৃষ্ণ হরিণ তাড়না করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং বন্দুক হস্তে অত্যাচ-পর্বতশৃঙ্গের পাদদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একজন তাড়না-

কারী দৈবাৎ পদস্থানিত হইয়া পৰ্ব্বতশৃঙ্গের উপরিভাগ হইতে নিরে পতিত হইল, এবং পাদশাহের সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। দুৰ্ব্বল-দেহ জাহাঙ্গীর এই ভীষণদৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না ; তিনি অবিলম্বে শিবিরে প্রতিগমন করিয়া এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির মাতাকে অর্থ প্রদান পূৰ্ব্বক তাঁহার শোকদগ্ধ ও নিজেৰ অনুতাপদগ্ধ হৃদয় শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পাদশাহ আর মনের শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, মৃত ব্যক্তির বিকটদৃশ্য তাঁহার নয়ন সমক্ষে সৰ্ব্বদা ভাসমান হইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য দ্রুতগতিতে নষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। তিনি বৈরামকিলা পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সুরাপানের জন্য অধীর হইয়া পানপাত্র হস্তে তুলিয়া লইলেন ; কিন্তু উহা অধরস্পৃষ্ট হইবার পূৰ্বেই বিরক্তি সহকারে ঘূরে নিক্ষেপ করিলেন। তার পর দিন, ঊনষষ্টিতম বর্ষ বয়ঃক্রমে বিলাসী পাদশাহ কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

জাহাঙ্গীরের সম্মুখে সুরাপাত্র সংস্থাপিত না করিলে, তাঁহার চিত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, “আমি চতুর্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই তিনবার ব্যতীত আর কখনও মদ স্পর্শ করি নাই। তাহাও আমার মাতা অথবা ধাত্রী শৈশবসুন্দর রোগ নিবারণের জন্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। একবার আমার পিতাও এক তোলা পরিমাণ আরক (Spirit) গোলাপজলে মিশ্রিত করিয়া কানি নিবারণ জন্য আমাকে সেবন করাইয়াছিলেন। • • • একদিন আমি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম ; মৃগয়াক্ষেত্রে নানা দুর্ব্বটনা ঘটিয়াছিল ; এবং আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। একজন অনুচর আমাকে বলিল যে, এক পেয়লা সুরাপান করিলে আমার সমস্ত শাস্তি ও ক্লেশদূর হইবে। সে সময়ে আমি নবীন যুবক, এবং আমার

চিত্ত বিলাসোন্মুখ, সুতরাং আমি শ্রান্তিনাশক পানীয় আনিবার জন্য হাকিম আলীর গৃহে জনৈক ভৃত্যকে প্রেরণ করিলাম । এই ভৃত্য একটি ক্ষুদ্র বোতলে দেড় পেয়ালার পরিমিত পীতবর্ণ সুস্বাদু সুরা লইয়া আসিয়াছিল, আমি উহা পান করিলাম । ইহার ফল আনন্দ-প্রদ হইয়াছিল, তদবধি আমি সুরাপানে অভ্যস্ত হইলাম । আমি প্রত্যহই মাত্রাবৃদ্ধি করিতাম । ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করাতে দ্রাক্ষারসের আর আমাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিবার শক্তি রহিল না । ইহার পর হইতেই আমি আরক পান করিতে আরম্ভ করিয়াছি । (ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া করিয়া) নয় বৎসর মধ্যে দুইবার চূরান আরক বিশ পেয়ালার নিঃশেষ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, ইহার চৌদ্দ পেয়ালার দিবাভাগে ও অবশিষ্ট ছয় পেয়ালার রাত্রিকালে পান করিতাম । এই বিশ পেয়ালার সুরার হিন্দুস্থানী ওজন ছয় সের । * * * এই সময় আমার আহারের পরিমাণ একটা মুরগী ও কিঞ্চিৎ রুটী ছিল । কেহই আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে সাহসী হইত না ; এবং অবশেষে এমন হইয়াছিল যে, সুরাপানকালে আমি হস্তকম্পন নিবন্ধন পানপাত্র ধারণ করিতে পারিতাম না । আমি চুমুক দিতাম, কিন্তু অগ্রে পাত্র ধারণ করিয়া থাকিত । অবশেষে হাকিম হুমামকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট আমার সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলাম । তিনি দয়া ও যত্নপূর্বক কিছুমাত্র গোপন না করিয়া আমাকে বলিলেন যে, যদি আমি একরূপ ভাবে আর ছয় মাস সুরাপান করি, তবে আমার অবস্থা সংশোধনের অতীত হইবে । তাঁহার পরামর্শ উত্তম এবং জীবন মূল্যবান্ । তাঁহার বাক্যে আমার অনেক উপকার হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আমি সুরার পরিমাণ হ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ; কিন্তু আমি ফুলহা (ভাঙ্গ) সেবন

করিতে আরম্ভ করি। সুরার মাত্রা হ্রাস করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভাস্কের মাত্রা বদ্ধিত করিয়াছি, এবং দুই ভাগ ড্রাকারস এবং এক ভাগ আরক মিশ্রিত করিয়া আমার পানীয় সুরা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়াছি। প্রত্যাহ মাত্রার পরিমাণ হ্রাস করিয়া সাত বৎসর মধ্যে ছয় পেরালায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছিলাম; ইহার প্রত্যেক পেয়ালা সুরার পরিমাণ সোয়া আঠার মিস্কাল। বিগত পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ আমি এই পরিমাণ পান করিতেছি, ইহা অপেক্ষা কম বা বেশী পান করি না।”

জাহাঙ্গীরের যত দোষই থাকুক না কেন, তাঁহার স্বভাব মধুর ও অমায়িক, এবং হৃদয় স্নেহপ্রবণ ও সরল ছিল। আমরা এখানে তাঁহার স্নেহশীল হৃদয়ের একটি উদাহরণ প্রদান করিতেছি। শাহজাদা খুসরু-মাতা পাদশাহের প্রধানা মহিষী ছিলেন। খুসরু বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলে তিনি মনোকষ্টে আত্মহত্যা করেন। এই উপলক্ষে পাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, “কিরূপে আমি তাঁহার সদ্গুণরাজি ও অমায়িক স্বভাবের বর্ণনা করিব? তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, এবং আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা একরূপ ছিল যে, তিনি আমার একগাছি কেশ রক্ষার জন্য সহস্র পুত্র অথবা ভ্রাতাকে উৎসর্গ করিতে পারিতেন। * * * তিনি আমার প্রথম মহিষী, আমি তাঁহার সঙ্গে বাল্যকালে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। খুসরুর জন্মের পরে আমি তাঁহাকে শাহ বেগম উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যু আমাকে এতদূর অভিভূত করিয়াছিল যে, আমি জীবনে বরুহীন এবং আনন্দ অহ্লাদে বীতস্পৃহ হইয়াছিলাম। ক্রমাগত চারি অহোরাত্র আমি গভীর শোকে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া পানাহারেও যত্ন করি নাই।”

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরাজগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন । তদানীন্তন ইংলণ্ডপতি এই বণিকদলকে কোন কোন স্বত্ব প্রদান জন্তু পাদশাহকে অমুরোধ করিতে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই দূত সুপ্রসিদ্ধ সার্ টমাস রো । তিনি আপনার দৌত্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও জাহাঙ্গীরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি ।

সার্ টমাস রো লিখিয়াছেন, “সিংহদ্বার সংলগ্ন প্রাক্‌গাভিযুখী গবাঙ্কপথে পাদশাহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে উপনীত হইয়া জনসাধারণকে দর্শন দেন । তাহার নিম্নে রেলের ভিতরে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন । * * * তিনি সাক্ষ্য ভোজনের পর রাত্রি আট ঘটিকার সময় গোসলখানায় উপস্থিত হইয়া মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করেন । এখানে শুণী ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই ; এবং ইহাদের মধ্যেও প্রায় কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে পারেন না । এই স্থানে তিনি সকল বিষয়ে • • আলোচন করেন । পীড়া অথবা পান নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিলে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না । কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে তাহা অবশ্যই বিজ্ঞাপিত হয় । কারণ, সমস্ত প্রজা তাঁহার ক্রীতদাস-তুল্য । এজন্য তিনিও তাহাদের নিকট পারম্পরিক ভাবে এক প্রকার দাসত্বে আবদ্ধ ; কারণ, এই সময় ওষীতি তিনি এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিপালন করেন যে, পাদশাহকে একদিন দেখিতে না পাইলে, এবং তাঁহার অনুপস্থিতির উপযুক্ত হেতু প্রদর্শিত না হইলে, প্রজাবর্গ বিদ্রোহ অবলম্বন করিতে পারে । মঙ্গলবারে তিনি বিচারকার্য্য নিরূপিত করিয়া থাকেন । পাদশাহ দীনতম প্রজার অভিযোগও অগ্রাহ্য করেন না ; এবং বিচারকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করাই তাঁহার নিয়ম ।”

সার টমাস রোর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই পাদশাহ তাঁহার প্রার্থনা-
বৃত্ত বণিকদলকে অভ্যস্তিত স্বত্ব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু
রাজমহিষী নূরজাহান, মন্ত্রী আসফ খাঁ ও শাহজাদা প্রবেজ বিক্রদ্ধাচরণ
করাতে সার টমাসকে তিন বৎসর মোগল দরবারে অবস্থিতি করিতে
হইয়াছিল। পাদশাহের দরবারে তিনি কি ভাবে গৃহীত হইতেন,
তাঁহার একদিনের বিবরণ আমরা এখানে প্রদান করিতেছি। রো
অভিযোগ করিতেছিলেন, এবং আসফ খাঁ বিভাষীকে নিরস্ত করিবার
চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বিভাষী রো সাহেবের বাধ্য ; সুতরাং
আসফ খাঁর চক্ষু সঞ্চালন ও ইঙ্গিত নিফল হইতেছিল। পাদশাহ তাহা
বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ কোপান্বিত হইয়া উঠেন, এবং কে ইংরাজদূতের কি
অন্তায় করিয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।
পাদশাহ স্বীয় পুত্রের নাম শ্রবণ করিয়া অসুমান করেন যে, রো সাহেব
তাঁহার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করিতেছেন। আসফ খাঁ কম্পিত হইতে-
ছিলেন, এবং তাঁহাদের সকলেই হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। পাদশাহ
রাজকুমারকে গুরুতর ভৎসনা করিয়া নিজে ক্রটি স্বীকার করেন।
এই বাকবিতণ্ডার পরে তিনি গাত্রোত্থান করেন, এবং সেই সময়
রো সাহেবকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে বলেন।

আমরা এখানে আর এক দিনের ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করি-
তেছি। একদিন রাত্তিকালে রাজদূত শয়ন করিয়াছেন, এমন সময়
পাদশাহ তাঁহাকে আহ্বান করেন। টমাস রোর নিকট একখানি চিত্র
ছিল, তিনি তাহা পাদশাহকে দেখান নাই। পাদশাহ এবিষয়
অবগত হইয়াই তাঁহাকে হঠাৎ আহ্বান করিয়া পাঠান। ইহা তাঁহার
পরলোকগত প্রণয়িনীর চিত্র ; তিনি ছবিখানি লইয়া তাড়াতাড়ি পাদ-
শাহের সন্নিধানে গমন করেন। রো সাহেব যে সময় পাদশাহের কক্ষ

প্রবেশ করেন, তখন তিনি পার্শ্বদ্বর্গের সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপানে নিরত ছিলেন । চিত্রখানি প্রদর্শিত হইলে পাদশাহ তাহা নিজে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । রো প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষে ছবিখানি পাদশাহকে উপঢোকন দিলেন । সম্রাট তাঁহাকে প্রশংসমান চক্ষে জিজ্ঞাসা করেন, “ঈদৃশ লোকললামভূতা অপরূপ সুন্দরী কি কখনও বর্ত্তমান ছিলেন ?” রো প্রত্যুত্তরে বলেন, “হাঁ, কিন্তু এই চিত্রে সে মহীয়সী মহিলার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ পরিস্কৃত হইয়া উঠে নাই ।” পাদশাহ বলেন, “তুমি ইহা আমাকে অকুণ্ঠিত চিত্রে দান করিয়াছ, আমি পুরাঙ্গনাদের দ্বারা ইহার প্রতি-কৃতি প্রস্তুত করাইব । তার পর তোমার নিকট আসন ও নকল উভয়ই উপস্থিত করিব । যদি তুমি আসলখানি বাহির করিতে পার, তবে তুমি ইহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে ।” রো প্রত্যুত্তরে বলেন, “যখনই আমি চিত্রখানি আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্রে দান করিয়াছি, এবং আশা করি, ইহা আর প্রত্যাগীত হইবে না ।” ইহাতে পাদশাহ বলেন, “প্রেমাস্পদের প্রতি তোমার অবিচলিত ভাল বাসার জন্য তুমি পূর্বা-পেক্ষা আমার অধিক প্রীতিভাজন হইলে ।”

ইংলণ্ডের অধিপতি পাদশাহকে একখানি বিলাতী শকট প্রদান করেন । পাদশাহ এই অভিনব সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া একান্ত প্রীত হন, এবং ওমরাহবর্গের প্রত্যেককে এক এক খানা করিয়া তদনুরূপ শকট প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন । অশ্বচতুষ্টয়ের সাহায্যে এই শকট চালিত হইত । এই সকল অশ্বের সাজ সজ্জা স্বর্ণ মণ্ডিত ছিল । পাদশাহ শকটে আরোহণকালে অত্যন্ত চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন । রো সাহেব বিলাতী অভিনেতার পরিচ্ছদের সঙ্গে পাদশাহের এই বেশের তুলনা করিয়াছেন ।

জাহাঙ্গীর প্রবেশের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগের বিষয় পরিশ্রুত হইয়া ক্রটি স্বীকার করিবার জন্য আর একবার রাজদূতকে আহ্বান করেন । তদনুসারে তিনি উপনীত হইলে, জাহাঙ্গীর মুসা, বিণ্ড ও মোহাম্মদের অনুশাসন সম্বন্ধে বিচার বিতর্কে প্রবৃত্ত হন । ইহার পর তিনি সুরাপানে সরলচিত্ত হইয়া হইয়া রোকে বলেন, “আমি একজন পাদশাহ, তুমি মাদরে গৃহীত হইবে ।” জাহাঙ্গীর খৃষ্টান, মুর, ইহুদি কাহারও ধর্ম-বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিতেন না । তিনি সমভাবে সকলের সমাদর করিতেন । তিনি তাহাদিগকে অন্ত্রায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদাই যত্নশীল ছিলেন । সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া তিনি নানারূপ রিপূর বশীভূত হইয়া পড়িতেন, এবং তদবস্থায় দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত অতিবাহিত করিতেন । কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই তাঁহার প্রমত্ত অবস্থা তিরোহিত হইত । প্রাতঃকালে তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিত, এবং তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি পুনর্বার নিজের আয়ত্ত হইত ।

বস্তুতঃ, সার টমাস রোর অঙ্কিত চিত্রে জাহাঙ্গীরের মাধুর্য্যপূর্ণ বিলাসপটু মদিরাশক্ত প্রকৃতি বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ।

জাহাঙ্গীর পাদশাহ মোগল সাম্রাজ্যের শাসন জন্য কতিপয় অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন ; তজ্জন্ম তিনি তৎকালীন মোসলমান সমাজে একজন বিচক্ষণ রাজনীতি বিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন । আমরা তাঁহার অনুশাসনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি ।

প্রথম অনুশাসন ।

“আমি তম্বা ও মিরবারি নামক শুষ্ক গ্রহণের প্রথা রহিত করিয়াছি । সুবা ও সরকারের জামগীরদারগণ আপনাদের স্বার্থের জন্য

নানারূপ কর সংগ্রহ করিতেন, আমি তাহাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছি ।”

বাবর ও আকবর উভয়েই তমঘা ও মিরবারি নামক শুক গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া অশুভ প্রচার করিয়াছিলেন । পাদশাহগণ পুনঃ পুনঃ একই প্রকার অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন ; ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, প্রথমে যিনি ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি স্ব-প্রণীত নিয়ম কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, অথবা তাঁহার পরবর্তী পাদশাহগণ পূর্বপুরুষের যশঃপ্রভা স্মান করিয়া আত্মগৌরব বর্দ্ধন করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন । বাবর ও আকবরের ভ্রাতৃ প্রবল প্রতাপাবিত শাসনকর্তার সময়েই যদি তাঁহাদের কৃত অনুশাসন প্রতিপালিত না হইয়া থাকে, তবে দুর্বলচিত্ত জাহাঙ্গীর যে সিদ্ধকাষ হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে ।

দ্বিতীয় অনুশাসন ।

“দস্যুসঙ্কুল পথপার্শ্বের নির্জনাংশে সরাই ও মসজিদ জাহাঙ্গীরদারের ব্যয়ে নিৰ্ম্মাণ করিতে ও খালেসা ভূমির সরাই ও মসজিদ নিৰ্ম্মাণের ব্যয়-তার রাজকোষ হইতে প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছি ।”

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের বহু পূর্ব হইতেই রাজপথ পার্শ্বে সরাই ও মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । সেরশাহ ও তদীয় পুত্র সেলিমশাহের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক সরাই ও মসজিদ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব, জাহাঙ্গীর যতদূরে সরাই ও মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অল্প ছিল বলিয়াই অনুমিত হয় । (১)

(১) Salim Shah in the beginning of his reign issued orders that as the Sarais of Sher Shah were two miles distant from one another,

এই সময় রাজপথ সর্বদা দম্মা সম্ভ্রম্য কর্তৃক পরিবৃত থাকিত । পুরচক্রে ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, দম্মাভয়ে কেহ রক্ষকশূন্য হইয়া ঘরের বাহির হইতে পারিত না । সার টমাস রো আপন ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, নিরাপদে ভ্রমণের বন্দোবস্ত করার জন্য তাহাকে সময় সময় কালবিলম্ব করিতে হইয়াছে । বোম্বাই হইতে শ্রুটি ত্রিশকোশ পথ ; এই পথে সর্বদা লোক যাতায়াত করিত ; এ পথেও পথিকগণ সর্বদা দম্মা কর্তৃক আক্রান্ত ও সর্বস্বহত হইত । এমন কি, আগ্রা লাহোরের প্রসিদ্ধ পথেও দম্মার অভাব ছিল না । জন ব্রোথার ও রিচার্ড ষ্টিল নামক পরিব্রাজকদ্বয় লিখিয়াছেন যে, এই পথ রাত্রিকালে দম্মা সমাগমে পূর্ণ হইত, কিন্তু দিবাভাগে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইত না । সেকালে রাজপথ পার্শ্বে সরাই না থাকিলে পর্যটন অথবা বাণিজ্য অচল হইয়া পড়িত । টেরী নামক একজন বৈদেশিক পর্যটক নির্দেশ করিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে ভ্রমণকারিগণের বাস জন্য পান্থশালার একান্ত অভাব ছিল ; কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ নগরে সরাই নামক সুদৃশ্য অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইত । ধনশালী হিন্দুগণ আপনাদের ধনের কিয়দংশ রাজপথ পার্শ্বে সরাই নির্মাণ ও কূপ ধননে ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন । অতএব ভ্রমণকারিগণের আশ্রয় জন্য যে সকল সরাই নির্মিত হইয়াছিল, তাহাতে রাজকোষের অর্থ কতদূর কার্যকর ছিল, তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে ।

one of similar form should be built between them for the convenience of the public ; and that mosque and reservior should be attached to them, and that vessels of water and of victuals, cooked and uncooked should be always kept in readiness for Hindu as well as Mahomedan Travellers.—*Tarikh-i-Baudini*.

তৃতীয় অনুশাসন ।

“মালিকের বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তিই পথ পার্শ্বস্থ পণ্যদ্রব্যের ভার খুলিতে পারিবেক না । কোন রাজপুরুষ মৃত মোসলমান অথবা হিন্দুর সম্পত্তি দাবী করিতে পারিবেক না । তাহার উত্তরাধিকারাই পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে । যদি কাহারও উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকে, তবে নির্দিষ্ট রাজকর্মচারিগণ তাহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবে, এবং তাহার আয় সরাই নির্মাণ, সেতু সংস্কার ও পুষ্করিণী খননে ব্যয়িত হইবে ।”

উত্তরাধিকারিগণের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার আদেশ তৈমুরলঙ্গের অনুশাসনের পুনরুক্তি মাত্র । আকবর শাহ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়মের প্রচার করিয়াছিলেন ।

“Let him look after the effects of deceased persons, and give them up to the relations or heirs or such, but if there be none to claim the property, let him place it in security, sending at the same time an account of such to Court, so that when the true heir appears he may obtain the same. In fine, let him act conscientiously and virtuously in this matter, lest it should be the same here as in the kingdom of Constantinople.”
Gladwin's Ain-Akbari.

কিন্তু আমীরগণ পরলোকগমন করিলে, তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাজকোষে গ্রহণ করাই মোগল পাদশাহগণের সাধারণ নিয়ম ছিল; মৃত ব্যক্তির সন্তানগণ পাদশাহের ইচ্ছামত পৈতৃক ধনের কিয়দংশ মাত্র প্রাপ্ত হইতেন, পাদশাহগণ সচরাচর তাহাদের সঙ্গে সদ্যবহার করিতেন ।

জাহাঙ্গীর পাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আকবরের খোজা প্রধান দৌলত খাঁ অসত্বপায়ে অতুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন ; তাঁহার মৃত্যুর পর আকবর তৎসমুদয় বাজে-রাপ্ত করিয়া রাজকোষ ক্ষৌত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন । কিন্তু তৎকিরত-উল-উমরা নামক ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, এই ব্যক্তি জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের সপ্তম বর্ষে কালগ্রাসে পতিত হন । অতএব তাঁহার বিপুল ধনরাশি পিতার পরিবর্তে পুত্রের হস্তগত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে । সার্ব টমাস রো লিখিয়াছেন যে, কোন প্রজাই উত্তরাধিকারস্থত্রে ভূমি অধিকার করিতে পারিত না ; রাজার ইচ্ছার উপরেই সমস্ত নির্ভর করিত ; এজন্য বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যত্র আয় তত্র ব্যয় করিতেন । বণিকগণ মযত্রে আপনাদের ধন সংগোপন করিয়া রাখিতেন । পাদশাহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মানবর্ণের ভরণপোষণ অল্প সামান্য ভাবে বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন ; রাজানুগ্রহ লাভ করিতে না পারিলে তাঁহাদের অবস্থা উন্নত করিবার কোন উপায় থাকিত না । বন্দর সমূহে যথেষ্টাচার পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান ছিল । এমন কি, যদিও সার্ব টমাস রো পরম সাদরে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বন্দররক্ষক বলপূর্বক তাঁহার দ্রব্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্বক তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতে বিরত হয় নাই ।

চতুর্থ অনুশাসন ।

“কেহ মদ অথবা অল্প কোন প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে না ।”

জাহাঙ্গীর স্বয়ং আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া মত্তপান করিতেন, সমস্ত সভ্যদের সম্মুখেও মত্তপান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না । জাহাঙ্গীর

পাদশাহ খৃষ্টধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিহাসবেত্তা কার্জ নির্দেশ করিয়াছেন যে, মদ্যপান ও সর্বপ্রকার মাংস আহার সম্বন্ধে খৃষ্ট শাস্ত্রে কোন প্রতিবেধ বিধি না থাকাতেই পাদশাহ তাদৃশ পক্ষপাতী হইয়া ছিলেন। জাহাঙ্গীর কখন কখন মদের আড্ডায় গমন করিয়া ইতর জাতীয় লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমোদপ্রমোদে মত্ত হইতেন। সার টমাস রো লিখিয়াছেন যে, চেপ্‌ছাইডের সমস্ত মণি অপেক্ষা ৪৫ বাহুল্য লাল মদ জাহাঙ্গীর অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অনুশাসনকর্তা নিজেই স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গে অগ্রগণ্য ছিলেন, এ অবস্থায় প্রকৃতিপুঞ্জ যে তাঁহার প্রবর্তিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছে, তাহা কখনও সম্ভব নহে।

পঞ্চম অনুশাসন ।

“আমি আদেশ করিয়াছি যে, কেহ বলপূর্ব্বক অন্তের গৃহে বাস করিতে পারিবে না। আমি বিচারকদিগকে আদেশ করিয়াছি যে, অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন, অপরাধীর নাসা কণ ছেদন করিয়া শাস্তিবিধান করা হইবে না। আমি নিজেও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া এ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।”

এই নিয়মও জাহাঙ্গীরের নিজের উদ্ভাবিত নহে। ইহার পূর্বে আকবর শাহ এইরূপ অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

যুদ্ধোপলক্ষে মহাবত খাঁ দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন ; এই সময় পাদশাহ শাহজাদা প্রবেজের বাস জন্ত অনুপস্থিত সেনাপতির পরিবার-বর্গকে স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ, জাহাঙ্গীর নিজেই স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ করেন। সার টমাস রো স্বরচিত বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, পাদশাহ একবার কোন কারণে আজমীর সহরের সমগ্র লঙ্করে অগ্নি প্রদান করিতে

তিনি বাসভবন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন । সমস্ত লব্ধ ভস্মীভূত ও উচ্ছিন্ন হইয়াছিল ; এবং তাহাতে বহুসংখ্যক নিরপরাধ দরিদ্র প্রজা গৃহহীন হয় । জাহাঙ্গীর একবার কোন কারণে রাজকীয় খোষণা দ্বারা মান্দু নগরের অনেক প্রজাকে স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন ।

জাহাঙ্গীর নাসা কর্ণচ্ছেদন করিয়া কাহাকেও শাস্তি দেন নাই । কিন্তু তদপেক্ষা কঠোর শাস্তি দিয়া তিনি ক্রুরতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ ইলিয়ট সাহেব তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । আমরা বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না । কাহাকেও শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হইত, কেহ বা সর্পদংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিত, কাহাকেও বা জীবিত অবস্থাতেই ভূপ্রোথিত করা হইত । অপরাধীর প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য নানাবিধ নিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছিল । হস্তীর পদতলে মর্দিত করিয়া প্রাণ-সংহার করার নিয়মই অধিকাংশস্থলে অনুষ্ঠিত হইত । জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি খান-ই দৌওরনের পুত্রের অসম্মান-সূচক বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া জীবিত অবস্থাতেই তাহার চর্ম ভুলিয়া লইয়াছিলেন, এবং নগরবাসীদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য সেই মৃতদেহ নগরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন । হাসনবেগ ও আবদুল রহিম নামক দুইজন রাজদ্রোহীকে বধ করিবার জন্য যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করা হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ।

ষষ্ঠ অনুশাসন ।

“আমি আদেশ করিয়াছি যে, রাজপুরুষ অথবা জাহাঙ্গীরদারগণ আমার প্রজাবর্গের ভূমি হরণ করিতে, অথবা আব্রাহামের জন্য উহা আবাদ করিতে পারিবে না ।”

সপ্তম অনুশাসন ।

“আমি রাজ্য সংস্কে আমিন ও জায়গীরদারগণকে আমার অনুমতি ব্যতীত আপন আপন শাসিত প্রদেশের প্রজাগণের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়াছি ।”

অষ্টম অনুশাসন ।

“আমি রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছি । পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত রাখিতে এবং তাহার সমগ্র ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদান করিতে আদেশ করা হইয়াছে ।”

নবম অনুশাসন ।

“আমি পিতার অনুকরণে আমার জন্মদিনে জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছি । এতদ্ব্যতীত আমার সিংহাসন আরোহণের দিন বৃহস্পতিবার এবং পিতার জন্মদিন রবিবারেও জীবহত্যা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে । পিতা এই দিনকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেন । এই দিন সূর্যের নামে উৎসৃষ্ট, কেবলমাত্র এই জন্যই যে, তিনি তাদৃশ ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে ; রবিবার সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াও তিনি এই দিন অত্যন্ত পবিত্র মনে করিতেন । এক্ষণে তিনি রবিবারে জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ।”

জাহাঙ্গীর এসলাম ধর্মের বিশ্বাসী ছিলেন না । সমস্ত মোসলমান জাতি রমজান মাসের উপবাসকে একান্ত পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে করে ; কিন্তু তিনি উহা লইয়া বিদ্রূপ করিতেন । যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ মোসলমান এসলাম ধর্মের অনুশাসন পালন করিতে একান্ত তৎপর ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্বক নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানে সহকারী করিয়া তুলিতেন, এবং তাহাতে অপরিসীম কোতুক লাভ

করিতেন । ধর্মশাস্ত্রবেত্তাগণ তাঁহাকে সর্বদা ভাষ্যভক্ষ্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন ; তাঁহাদের উপদেশবাক্যে বিরক্ত হইয়া তিনি একদা ক্রিচ্ছাসা করেন যে, কোন্ ধর্ম্মে মত্তপান ও বিনা বিচারে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে । প্রত্যুত্তরে একমাত্র খৃষ্টান ধর্ম্মে মত্তপান ও বিনা বিচারে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে, অবগত হইয়া তিনি বলেন, “তাহা হইলে আমরা খৃষ্টান ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইব । দর্জি আনয়ন করিয়া আমাদের আচকান খাট কোটে ও পাগড়ী টুপিতে পরিবর্তিত করা হউক ।” এই বাক্যে ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণ মোসলমানের অদৃষ্টে কি লিখিত আছে, তাহা তাবিয়া কম্পিত হন ; এবং সকলেই একবাক্যে বলেন যে, পাদশাহ কখনও কোরাণের অনুশাসনে বাধ্য নহেন, এবং তিনি যথেষ্টভাবে মত্তপান ও বিনা বিচারে মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন ।

দশম অনুশাসন ।

“পিতা যে সকল জাহঙ্গীর ও মনসব প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা স্থির রাখিবার জন্য আমি আদেশ প্রদান করিয়াছি । কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে আমি মর্যাদানুসারে প্রত্যেকের মনসব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি । অহিদৌ এবং পিতার ভৃত্যবর্গের বেতনও দশ হইতে বারতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । রাজাস্তঃপুরে মহিলাদের বৃত্তিও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।”

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বহুসংখ্যক সুবাদারকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন ; আপনার প্রিয়পাত্র ও সাহায্যকারীদিগকে নিয়োজিত করিবার জন্য কাহাকে কাহাকেও পদচ্যুত করিয়াছিলেন । পদচ্যুত রাজপুরুষগণ রাজধানীতে আগমন পূর্বক উৎকোচ প্রদান করিয়া এবং যত্নবশে লিপ্ত হইয়া পূর্ব মর্যাদা লাভ কল্পিত যত্নশীল হইয়াছিলেন । যাহারা সিদ্ধকাম হইতে

পারেন নাই, তাঁহারা রাজদ্রোহাচরণ করিয়াও আপন আপন লুপ্ত ক্রমতা ও প্রতিপত্তি উদ্ধারের জন্য প্রয়াসী হন ।

একজন বিদেশীয় পর্য্যটক রাজ্যস্বঃপুরের মহিলাদের বৃত্তি নির্দ্ধারিত অর্থ দিবার প্রণালীকে দরিদ্রকে ভিক্ষাদানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন ।

একাদশ অনুশাসন ।

“আয়মাভোগী ও মদ-আশগণ (ইহাদের দ্বারা আশীর্বাদপ্রার্থী সৈন্যদল পূর্ণ ছিল) স্ব স্ব কারমানের সৰ্ত্ত অনুসারে আপনাদের ভূমিতে স্থির থাকিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন । হিন্দুস্থানের বিস্তৃত সৈয়দ বংশোদ্ভব মির সদর জাহান পিতার অধীনে রাজধানীতে কিয়ৎকাল উচ্চ রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন । ইনি প্রত্যহ দরিদ্রদিগের অভাব ঘোচন করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন ।”

দ্বাদশ অনুশাসন ।

“রাজ্যের যাবতীয় কারাগার ও দুর্গের বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে আদেশ করিয়াছি ।”

উইলিয়ম ফিল্ড নামক একজন পরিব্রাজক জাহাঙ্গীরের মৃগয়া সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা এই প্রসঙ্গে তাহার সারমর্ম প্রদান করিতেছি । জাহাঙ্গীর মৃগয়া উপলক্ষে নবেম্বর মাসের প্রথমে রাজধানী হইতে বহির্গত হইতেন, এবং দেশাভ্যন্তরে ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ ব্যাপী স্থানে শিকার করিয়া মার্চ মাসের শেষে গ্রীষ্মাধিক্য নিবন্ধন প্রত্যাবর্তন করিতেন । জাহাঙ্গীর শিকারের উপযোগী বন্যস্থান পরিবেষ্টিত করিয়া লইতেন । এই পরিবেষ্টিত স্থান মধ্যে মানুষই হউক, পশুই হউক, যাহা কিছু ধৃত হইত, তাহাই রাজকীয় শিকার বলিয়া গণ্য করিবার নিয়ম ছিল । ধৃত পশুর মধ্যে মনুষ্যের যাহা ভক্ষ্য থাকিত,

তাহা বিক্রয় করিয়া পাদশাহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন । পাদশাহ শিকারলব্ধ মাণুষ্যগুলিকে ক্রীতদাসরূপে গণ্য করিয়া প্রতিবৎসর তাহাদিগকে কাবুলে প্রেরণপূর্বক তাহাদের বিনিময়ে কুকুর ও বিড়াল গ্রহণ করিতেন । এই সকল লোক আচার ব্যবহারে পশুবৎ ছিল, এবং চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ভাহ করিত ; এই হেতুতে জাহাঙ্গীর তাদৃশ কঠোর ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না । কিন্তু বাহার করেনিদির কষ্টেই মহানুভূতি ছিল, তিনি বিরূপে এই সকল লোকের সহিত কখন কঠোর ব্যবহার করিতেন, তাহা বিশ্বাসের বিষয় মনেহ নাই ।



শাহজাহান ।



জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর প্রাকালে শাহজাহান দক্ষিণাপথে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং রাজমহিষী নূরজাহান শাহজাহানের পরিবর্তে আপনার হস্তকৌড়নক শাহরিয়ারকে সিংহাসন প্রদানের উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্ন শারদীয় প্রভাতের মেঘগর্জনের স্তায় নিষ্ফল হইল । তদীয় ভ্রাতা আসফ খাঁ জাহাঙ্গীরের জীবদশার উত্তরাধিকারী নির্বাচনে তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন । কিন্তু পাদশাহের মৃত্যুর পর তিনি নূরজাহানকে অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিয়া শাহজাহানকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য রাজধানীতে আহ্বান করিলেন । শাহজাহানের দক্ষিণাপথ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে উপনীত হইতে কতিপয় সপ্তাহ অতিবাহিত হইবে, এই সময়ে রাজসিংহাসনশূন্য থাকিলে অন্তর্কিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, আসফ খাঁ মৃত খুসরুর পুত্র দাওয়ার বন্ধকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন । তাহার পর শাহজাহান আগ্রার নিকটবর্তী হইলে দাওয়ার বন্ধ নিহত হইলেন ; এবং শাহজাহান সর্ববাদী সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন । (১)

(১) শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের পূর্বেই নূরজাহান আসফ খাঁর হস্তে বন্দি হইয়াছিলেন । ইহার পর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ কিরূপভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি । ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে নূরজাহান পরলোক গমন করেন । শাহজাহান তাঁহার ভরণপোষণের জন্য রাজকোষ হইতে বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করিতেন । জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় অকলম্পিত সমস্ত ক্রমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল । এই মহীয়সী মহিলা অত্যন্ত

আসফ খাঁ আপনার সমস্ত ঐহিক উন্নতির মূল কারণ নূরজাহানকে কেন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? শাহজাহান আসফ খাঁর পরম লাভণ্য-বতী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এই কন্যারত্নের নাম আরজমন্দ বাবু । ইহাদের পরিণয়কাহিনী বিচিত্র রসে ও প্রেমসৌরভে পরিপূর্ণ । আরজমন্দ বাবু শাহজাহানের সহিত পরিণয়স্থলে আবদ্ধ হইবার পূর্বে একজন বিশিষ্ট আমীরের ধর্মপত্নী ছিলেন । মোগল আমলে নওরোজ উপলক্ষে বিশাল রাজপুরীতে সৌন্দর্যলীলাময়ী ললনাদিগের বাজার বসিত । ইহার নাম খোসরোজ, অর্থাৎ আনন্দের দিন । একবার এই রূপের হাটে রূপসীকুলরাজ্ঞী আরজমন্দ বাবু উপস্থিত হইয়াছিলেন । শাহজাহান এখানেই আরজমন্দ বাবুর প্রথম সন্দর্শন লাভ করেন । তখন রূপের হাটের ভগ্নদশা । রূপযুক্ত শাহজাহান কিছু কিনিবার ছলে তাঁহার বিপণীর নিকট উপনীত হন । একখণ্ড মিছরী ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না । রাজকুমার বহু অর্থের বিনিময়ে এই মিছরীখণ্ড ক্রয় করেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্থ অপেক্ষাও মহা হ্রাস আপনার হৃদয় সেই অনিন্দ্যকান্তি কামিনীর চরণতলে সমর্পণ করেন । ইহার পর শাহজাহানের প্রগাঢ় অনুরাগের কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িলে বাবুর স্বামী রাজকুমারের অভীষ্টসিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক না

তেজস্বিনী ও গর্ভিতা ছিলেন বলিয়া ইহার পর আর কখনও রাজনৈতিক বিষয়ে বাক্যব্যয় করেন নাই । অধ্যয়ন, নির্জনবাস ও আরামেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত । এই নির্জনবাসকালে তাঁহার চরিত্র নির্মল ছিল, তাহাতে কলঙ্কের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই । এই সময় ধন্যবলই তাঁহার একমাত্র সখল ছিল । বৈধব্যাদশা উপস্থিত হইবার পর তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও রত্নভরণাদির পরিবর্তে শুভ্র বস্ত্র পরিধান এবং মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু বিধবার স্তায় জীবনযাপন করেন । তাঁহার নির্দেশমত তদীয় মৃতদেহ জাহাঙ্গীর পাদশাহের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত হইয়াছিল ।

হইয়া, পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর শাহজাহান তাঁহাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। বাবু বেগম কমলীয় গুণরাজিতেও গরী-য়সী ছিলেন। বাবু কেবলমাত্র প্রেমসম্পাদেই শাহজাহানকে ভাগ্যবান করেন নাই, তিনিই তাঁহার ললাটে রাজটীকা দীপ্ত করিবার মুখ্য কারণ। শাহজাহান রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া তাঁহাকে মমতায় জেমানী, অর্থাৎ ‘তৎকালের গোরব’ এই উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁহার অদৃষ্টে এই সুখভোগ ঘটে নাই। শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বর্ষে বাবু ইহলোক হইতে অপমৃত হন।

প্রিয়তমা মহিষীর অকালমৃত্যুতে শাহজাহান অতিশয় শোকাবল হইয়াছিলেন, এবং যাবজ্জীবন তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়াবিরহবিধুর শাহজাহান কখনও রাজকাব্য-উদাসীন, বিলাস-বিমুখ, অথবা আড়ম্বরবিতৃষ্ণ হন নাই।

মোগল পাদশাহগণ রাজ্যাভিষেকোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। উৎসব-কালে পাদশাহগণের মহাধর্ম দ্রব্যভাণ্ডের সহিত ‘তোল’ হইবার নিয়ম ছিল; ‘তোল’ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সেই দ্রব্যরাশি আমীর ও মরহগণের মধ্যে বিতরিত হইত। শাহজাহান সমারোহের নানাবিধ অভিনব উপায় উদ্ভাবিত করিয়া পূর্ববর্তী পাদশাহগণের উৎসবক্রিয়া নিশ্চিন্ত করিয়া-ছিলেন। তিনি পূর্বপ্রণামত মহাধর্ম দ্রব্যভাণ্ডের সহিত ‘তোল’ হন, তদ্ব্যতীত মণিমুক্তাপূর্ণ ভাণ্ড মস্তকোপরি সঞ্চালন করিয়া সম্মুখবর্তী দর্শকগণকে প্রদান করেন। ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ নির্দেশ করিয়া-ছেন যে, এই উৎসব উপলক্ষে মণিমুক্তা, অশ্ব, হস্তী, অশ্রু ও বস্ত্র ক্রয় করিতে শাহজাহানের এক কোটি-ষাট লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

শাহজাহানের জন্মোৎসবও মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত। মণি-

রক নামক এক জন উদাসীন শাহজাহানের জন্মোৎসবের যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—উদাসমাগমে দুর্গপ্রাকার হইতে শত কামান যুগপৎ গর্জন করিয়া পাদশাহের জন্মদিনের ঘোষণা করিত। তাহার পর হইতেই সমারোহের আরম্ভ। গৃহে গৃহে আনন্দকোলাহল, স্তূর্ণিমিত্ত প্রশস্ত রাজপথে নাগরিকগণের স্ফূর্ত বসনভূষণের শোভা, নগরের সর্বত্র প্রমোদতরঙ্গ। কমলীরকাস্তি নর্তকীর লাস্যলীলা ও বিচিত্র কোতুকরঙ্গে শীত ঋতুর (শাহজাহান ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন,) স্বল্পদিবার অবসান হইত। অপরাহ্নে পাদশাহ রাজকুমার ও আমীর ওমরাহগণে পরিবৃত হইয়া মাতৃদর্শনে গমন করিতেন। তথা হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শাহজাহান সমস্ত সভাসদকে মহাসমারোহে ভোজসভায় সম্মিলিত করিতেন। তাহার পর তিনি শোভা ও সম্পদের আধার একটি সূক্ষ্মজিত কক্ষে গমন করিয়া রৌপ্য, মণি-মুক্তা-সংবলিত স্বর্ণ, মহার্ঘ ওষধি, হস্তাপ্য মশলা, স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত বসন ও সুবাহু মিষ্টান্ন দ্বারা ক্রমান্বয়ে চারি বার ‘তোল’ হইতেন। ‘তোল’ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পাদশাহ সমবেত দরিদ্রগণকে সেই দ্রব্যরাশি দান করিতেন।

কেবলমাত্র শূণ্যগর্ভ বাহ্যভঙ্গরেই শাহজাহানের শাসনকাল অতিবাহিত হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সময়েই মোগলসাম্রাজ্য উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। আকবর শাহ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকৃত করিয়া সাম্রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করেন। তিনি রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থা ও প্রজাহিতকর বিধানসমূহ প্রবর্তিত করিয়া সুশাসনের সূত্রপাত করেন। শাহজাহানের অধ্যবসারে আকবরের প্রবর্তিত ব্যবস্থা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। অন্তর্বিগ্রহ শাহজাহানের রাজত্বকালে

ছিল না ; সমগ্র সাম্রাজ্যে অথও শাস্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল ; তাহাতে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হয় ; দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে ।

পাদশাহ বিলাসপটু ও আরামপ্রিয় ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কখনও রাজকার্যের পর্যালোচনায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই, শাসন কার্যের শৃঙ্খলাবিধানে সর্বদা অবহিত থাকিতেন । তিনি রাজকর্মচারী নিয়োগকালে প্রতিভাশালী কার্যদক্ষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিতেন । একত্র তাঁহার রাজত্বকালে শাসনবন্ধন কখনও শিথিল হয় নাই । পরন্তু তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় অভিনব সুবন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল । দৃষ্টান্তস্বরূপ, দক্ষিণাপথের জরিপের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে । মোগল রাজত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক থাকি যা নির্দেশ করিয়াছেন, আকবর দেশ-বিজয়ে ও সুব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন ; কিন্তু শাসনকার্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে, আর-ব্যয়ের সামঞ্জস্য-বিধানে ও রাজকার্যের সুচারু পরিচালনে ভারতবর্ষের কোনও নর-পতিই শাহজাহানের সমকক্ষ ছিলেন না ।

সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ট্যাভার্নিয়ার শাহজাহানের শাসনাধীন ভারত-বর্ষের সমস্ত তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন । তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, শাহজাহান অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন । এই বিদেশী ভ্রমণকারীও পাদশাহের শাসনসম্বন্ধীয় দৃঢ়তার ভূরঙ্গী প্রশংসা করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে, শাহজাহানের সুশাসনে চোর-দস্যুর ভয় ও রাজপুরুষগণের অত্যাচার বহুল পরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল, এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ ও সমৃদ্ধির অবধি ছিল না ।

এই সুশাসনের ফলে রাজস্ব প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত ও রাজকোষ পূর্ণ হইয়াছিল । পরিপূর্ণ রাজকোষই রাজ্যের প্রধান শক্তি । শাহজাহান এইরূপ শক্তিশালী ছিলেন । তাঁহার সময়ে রাজকোষে

বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইরাছিল । একারণ পাদশাহ মুক্তহস্তে অজস্র ব্যয় করিতেন । দেশে অর্থও শান্তি বিরাজিত ছিল । সেই সময়ে বলদৃষ্ট স্বাতন্ত্র্যকামী নরপতিগণ অকারণে দিল্লীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন না ; এবং বিদ্রোহ অশান্তিও রাজ্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে দক্ষিণাপথে যুদ্ধ হইরাছিল । শাহজাহান ভারতের সীমান্তেও দীর্ঘকালব্যাপী সময়ে লিপ্ত ছিলেন । আড়ম্বরপ্রিয় পাদশাহ রাজধানীর সৌন্দর্য্যবর্ধন ও শিল্পের উৎকর্ষসাধনে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন । শাহজাহান প্রজাপুঞ্জের হিতসাধন জন্য পূর্ত্কার্য্যেও বিপুল অর্থব্যয় করেন । ফলতঃ, তাঁহার সময়ে রাশি রাশি অর্থ নানা পথে জলের মত ব্যয়িত হয় ।

শাহজাহানের রাজত্বকালে দক্ষিণাপথে তিনটি স্বাধীন মোসলেম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল ;—আমেদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা । আকবরশাহ দক্ষিণাপথবিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আমেদনগর রাজ্য ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করেন । আমেদনগরের অধীশ্বরী চাঁদ মুলতানার লোকাতীত শৌর্য্যবীৰ্য্যে মোগল সৈন্য পরাভূত হইয়া রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হয় । আকবর শাহের পর জাহাঙ্গীর আমেদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন । কিন্তু শত্রুসেনাপতি মালিক আদারের প্রতিকূলাচরণে তাঁহাকে বিফলপ্রযত্ন হইতে হয় । শাহজাহানের রাজত্বের আরম্ভে মালিক আদার কালগ্রাসে পতিত হন । তাঁহার মৃত্যুকালে রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ ও দুই লক্ষ পরাক্রমশালী সৈন্য সজ্জিত ছিল । বিজাপুরাধিপতি এব্রাহিম আদিল শাহ প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন । তিনি সুদৃশ্য প্রাসাদাবলীর নির্মাণ করিয়া রাজধানী সুশোভিত করিয়াছিলেন । সুদৃশ্য প্রাসাদমালার নির্মাতা বলিয়া তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র বিখ্যাত

ছিলেন। এই সময় গোলকুণ্ডা রাজ্যের উন্নতির মধ্যাহ্ন। গোলকুণ্ডা-
ধিপতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বলবৃদ্ধি ও প্রকৃতিপুঞ্জের অমিত সমৃদ্ধি লই-
য়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহেও আপনার বিজয়-বৈজয়ন্ত্রী
উজ্জ্বল করিবার অভিলাষী ছিলেন।

যুক্রানুরাগী শাহজাহান সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই এই সমৃদ্ধি-
শালী রাজ্যত্রয় জয় করিবার কর্ণনার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই
সময়ে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হইল, এবং তাহার ফলে শাহ-
জাহান অচিরে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম
বর্ষেই শাহজাহান লোদী নামক একজন বিশিষ্ট সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া
আমেদনগরের অধিপতির সহিত মিলিত হন। এই কারণে আমেদ-
নগরের সহিত মোগলের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাদশাহ স্বয়ং সৈন্যপরি-
চালনের ভার গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন, এবং তাঁহার
সাহস ও বীরত্বে আট বৎসরের সাধনার পর আমেদনগররাজ্য মোগল
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আমেদনগর বিধ্বস্ত হইলে বিজাপুর ও
গোলকুণ্ডার অধিপতিদ্বয়ও ভীত হইয়া বশুতাস্বীকার ও রাজকর প্রদান
করিতে স্বীকৃত হইলেন। বাহমনীরাজ্যের ভগ্নাবশেষ হুর্ভেদ উপরাজ্য-
গুলি আংশিক বা পূর্ণভাবে বশুতাস্বীকার করায় মোগলের ভারতবিজয়
সম্পূর্ণ হইল। কাবুল হইতে উড়িষ্যা এবং হিমালয় হইতে বেরার ও
আমেদনগর পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মোগলের সিংহাসনতলে নুতিত
হইল।

আভ্যন্তরীণ বিগ্রহ নিবারিত হইবার অব্যবহিত পরেই সীমান্ত-
প্রদেশে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বাবর পাদশাহ কাবুল
রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তদীয় বংশধর দিল্লীর সম্রাটগণের আধি-
পত্য ও উত্তরাধিকারক্রমে তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। “কিন্তু কাবুলের

উত্তরে বাক ও বাদক্ষণ এবং পশ্চিমে কান্দাহার দিল্লীশ্বরদিগের হস্তে হইতে স্থলিত হইল । বিশেষতঃ, বাক বহুকাল হইতে মোগল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল । শাহজাহান বাক বিজয়ের জন্য রাজপুত-রাজ জগৎসিংহকে প্রেরণ করিলেন । এই অভিযানে রাজপুতগণ অসাধারণ সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । রাজপুতগণ হিন্দুকুল গর্ভত অতিক্রম করিয়া তুমারপূর্ণ দেশে অমিত্রবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল । জগৎসিংহ সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য আবশ্যকমত বহুস্তে কোদালি ধরিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে কুষ্ঠিত হন নাই । অবশেষে সম্রাট স্বয়ং কাবুলে আসিলেন, এবং তাঁহার সন্তান মুরাদ বাক জয় করিলেন । কিন্তু অচিরে উজবেগগণ পুনরায় বাক আক্রমণ করিল । মুরাদ সম্রাটের আর এক পুত্র যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত হইয়া বাক রক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু যুদ্ধের গতি দেখিয়া, এবং সেই প্রদেশ অধিকদিন অধীনে রাখা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, অবশেষে শাহজাহান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন ; বাক ও বাদক্ষণ বিজিত হইল না ।

“জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কান্দাহার প্রদেশ পারস্ত-রাজের হস্তে পতিত হইয়াছিল, এখন শাহজাহানের রাজত্বকালে দিল্লীশ্বরের হস্তে পুনঃপতিত হইল । কিন্তু পারস্ত-রাজ অচিরে আবার এই স্থান জয় করিলেন । তাহার পর আওরঙ্গজেব দুইবার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা একবার এই স্থান উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই । কান্দাহার দিল্লীশ্বরগণের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য স্থলিত হইল ।” (১)

এই দীর্ঘকালব্যাপী সমরান্বিত ইকনসংগ্রহ করিতে মোগল রাজ-ভাণ্ডারের অসংখ্য অর্থের অপচয় হয় । কিন্তু এতদপেক্ষাও বিপুল অর্থ

(১) ঈশ্বর রমেশচন্দ্রের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত ।

বিচিত্র হস্ত্যরাজির গঠনে, কৃষিকার্যের সুবিধার্থ খাল-খমনে ও রাজোপ-
করণ-নির্মাণে ব্যয়িত হইয়াছিল ।

শাহজাহান পাদশাহের আমলে ভারতবর্ষে স্থাপত্যকার্য উৎকর্ষের
চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছিল বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । শাহজাহা-
নের প্রিয়তমা মহিষী আরজুমন্দ বাহু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে,
তাহার স্মৃতিচিহ্নরূপ অলোকসামাগ্র্য তাজমহল নির্মিত হয় । প্রিয়-
তমা মহিষীর স্মরণচিহ্ন জগতে অতুল্য শিল্পসৌন্দর্য্যময় করিবার জন্য তিনি
চেষ্টার ক্রটি করেন নাই । বস্তুতঃ, তাজমহল নির্মাণকালে পাদশাহের
চক্ষে স্বর্ণমুষ্টি ও ধূলিমুষ্টিতে কোনও প্রভেদ ছিল না । তাজমহল রত্নাদিতে
ভূষিত করিবার অভিপ্রায়ে শাহজাহান বিপুল অর্থব্যয় করিয়া, বোগ-
দাদ, আরব, সিংহল ও মিশর প্রভৃতি দূরদেশ হইতে মহাৰ্থ প্রস্তররাশি
আনয়ন করিয়াছিলেন । তাছের নির্মাণকার্যে প্রত্যহ বাইশ সহস্র শ্রম-
জীবী নিরত থাকিত । দশ বৎসরে (১৬২৮—৩৮) তাজ সম্পূর্ণ হয় ।
শাহজাহান প্রিয়তমা মহিষীর এই অপূৰ্ব সমাধিমন্দিরের নির্মাণে কিঞ্চি-
দধিক চারি কোটি মুদ্রা ব্যয় করেন । শ্রীমেন সাহেব সত্বীক তাজ দর্শন
করিয়া তৎসম্বন্ধে পত্নীর মত জিজ্ঞাসা করেন । তত্বত্তরে তিনি বলেন,
“তাজের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা অসাধ্য ব্যাপার । এরূপ একটা সমাধি
মন্দিরলাভের আশায় আমি অগ্নানবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে
পারি ।”

আকবর শাহ আগ্রাতে দুর্গ ও রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।
আগ্রা নগরী অত্যধিক উষ্ণ বোধ হওয়াতে শাহজাহান পুনরায় দিল্লীতে
রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নূতন দুর্গ ও প্রাসাদ প্রস্তুত করেন ।
ইহার পূর্বে পাদশাহগণ দিল্লীতে আগমন করিলে ইন্দ্রপ্রস্থের ‘দীনপাল’
নামক প্রাসাদে বাস করিতেন । কিন্তু সে প্রাসাদ অঁকজমকপ্রিয়

শাহজাহানের মনঃপুত হইল না । ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে অভিনব প্রাসাদের ভিত্তিপত্তন হয়, এবং ইহার দশ বৎসর পরে পাদশাহ নবনির্মিত রাজ-প্রাসাদের বিখ্যাত দেওয়ান-খাসে প্রথম দরবার করেন । এই নূতন রাজপ্রাসাদ শোভা ও সম্পদের আধার ও বিচিত্র স্থাপত্যসৌন্দর্য্যে সমু-
 দ্বাসিত । শাহজাহানের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা এনায়েত খাঁ লিখি-
 য়াছেন, “সর্ব্বজ্ঞ পাদশাহের মনে আপনার মহান হৃদয়ের লালসাতৃষ্টির
 উপযোগী * * * সুদৃশ্য দুর্গ ও মনোরম হর্ম্যরাজি নির্মাণের জন্ত
 যমুনা নদীর কূলে স্বাস্থ্যকর স্থান-নির্বাচনের কল্পনা উদ্ভূত হয় । (বহু
 অমুসন্ধানের পর পাদশাহ দিল্লীর উপকণ্ঠে ও সেলিমগড়ের মধ্যপথে
 স্থান নির্বাচন করেন ।) * * * পরিশ্রমপটু শ্রমজীবীগণ ভিত্তি খনন
 করিতে আরম্ভ করে, এবং ১০৪৯ হিজরী অব্দের মহরম চাঁদের নবম
 দিনে রজনীযোগে এই সুন্দর হর্ম্যরাজির প্রথম প্রস্তরস্তম্ভ প্রোথিত
 হয় । সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের শিল্পীগণ, কারুনিপুণ ভাস্কর, রাজ-
 যন্ত্রী ও সূত্রধর, সকলেই অবশুপ্রতিপাল্য রাজ্যদেশে সম্মিলিত হয় ।
 এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক শ্রমজীবী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল । ষাট লক্ষ টাকা
 ব্যয়ে, পাদশাহের সিংহাসনারোহণের দ্বাবিংশতম বর্ষে রবিউলআওয়াল
 চাঁদের ২৪শে তারিখে, এই হর্ম্যরাজির নির্মাণ সমাপ্ত হয় ।”

সৌন্দর্য্যপিপাসু শাহজাহান দিল্লী ও আগ্রার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্ত
 তিনটি সুদৃশ্য ও সুশোভন মসজিদ নির্মাণ করেন । আগ্রার জুম্মা-
 মসজিদের নির্মাণকার্য্য ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় । তাহার পর আগ-
 রার মতি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল । উভয় উপাসনা গৃহই বিচিত্র
 কারুকার্য্যে খচিত । মসজিদনির্মাণে রাজকোষের বিপুল অর্থ ব্যয়িত
 হইয়াছিল । এতদ্ব্যতীত দিল্লীনগরী শোভিত করিবার জন্ত পাদশাহ
 জুম্মামসজিদ নির্মাণ করেন । এই সুরম্য অট্টালিকা সম্বন্ধে সৌন্দর্য্যগ্রাহী

কার্ভাসন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম ;—“অট্টালিকাটি সমুচ্চ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ; ইহার তোরণদ্বয়, সম্মুখভাগ ও গম্বুজ-সমূহের একরূপ মনোরম সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গঠন কার্য সম্পাদিত হইয়াছে যে, সমস্ত অট্টালিকা বৈচিত্র্য ও পারিপাট্যে পরিপূর্ণ ।”

শাহজাহান প্রজাহিতৈশী নরপতি ছিলেন । তিনি প্রজার হিত-করে বিবিধ সংকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য খাল খনন এবং দিল্লীবাসিগণকে নির্মল পানীয় জল প্রদান, এই দুই অনুষ্ঠানই শাহজাহানের কীর্তি । রাবি নদ হইতে সুবৃহৎ খাল খনিত হইয়াছিল । পাদশাহ-নামা নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, শাহজান স্বয়ং এই কার্যের তদ্বাবধান করিবার জন্য লাহোরে গমন করিয়াছিলেন । খিন্ডরাবাদ হইতে দিল্লী পর্যন্ত আর একটি খাল খনিত হয় । এই খালের জলে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । শাহজাহানের যত্নে ও চেষ্টায় হিমালয়ের পাদদেশ হইতে এক দিকে হিসার ও অত্রদিকে দোব্রাবের মধ্যস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূমি সজলা হইয়াছিল ; ইহাতে বিশাল ভূখণ্ড ফলশস্যে পূর্ণ হয়, লক্ষ লক্ষ নর নারী দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে ।

ভারতীয় মোসলমান রাজত্বকালে শাহজাহানের স্ত্রায় আর কোনও নরপতিই ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না । তাঁহার সহচরবৃন্দের, তাঁহার কর্মচারিবর্গের, তাঁহার দরবারের ব্যয় অত্যন্ত বর্ধিত হইয়াছিল । তিনি দরবার কক্ষের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য মহার্ষি মণিমুক্তায় বিভূষিত মস্তুর-সিংহাসন নির্মাণ করেন । শাহজাহানের সমসাময়িক আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিয়াছেন,—“কালক্রমে বহুসংখ্যক মহার্ষি রত্ন রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছিল ; ইহার প্রত্যেকখানি সূর্য্যদেবের কটিবন্ধনী মূশো-

স্তিত করিবার, অথবা তিনস দেবীর কর্ণভরণের উপযুক্ত । সম্রাটের সিংহাসনারোহণের পরে তাহার মনে উদ্ভিত হয় যে, এই সকল ছত্ৰাপ্য যদি মুক্তার কেবলমাত্র একটি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে ; সে কার্য্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনের সৌন্দর্য্যবর্ধন ! * * * এই জন্ত রাজ-ভাণ্ডারে যে সকল যদি মুক্তা সঞ্চিত ছিল, তদ্ব্যতীত আরও দুই কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্নশ্রেণীর রত্ন সংগ্রহ করিবার জন্ত পাদশাহ আদেশ করেন । (তাহার পর) পাঁচ হাজার মিস্কল ওজনের ও আটঘটি হাজার টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট যদি মুক্তা সহ এই সকল রত্ন স্বর্ণকার বিভাগের অধ্যক্ষ বিবাদল খাঁকে প্রদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হয় । এতদ্ব্যতীত তাহাকে চৌদ্দ লক্ষ টাকা মূল্যের এক লক্ষ তোলা (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মিস্কল) বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রদান করা হয় । সিংহাসন-খানি দৈর্ঘ্যে তিন গজ, প্রস্থে আড়াই গজ ও উচ্চতায় পাঁচ গজ । চক্রাতপের বহির্ভাগে মীনাহ (enamel) কাজ করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে রত্ন বিস্তৃত করিয়া ও অন্তর্ভাগ পদ্মরাগ যদি প্রভৃতি মহার্ঘ রত্ন দ্বারা ঘনভাবে অলঙ্কৃত করিয়া, সিংহাসন খানি মরকতবিনির্মিত দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল । প্রত্যেক স্তম্ভের উপর দুইটি করিয়া রত্নবিভূষিত ময়ূর, এবং দুইটি ময়ূরের মধ্যস্থলে পদ্মরাগমণি, হীরা, মরকত ও মুক্তার পরিশোভিত এক একটি বৃক্ষ বিরাজিত । সিংহাসনে আরোহণের জন্ত যদি মুক্তাখচিত তিনটি সোপান । এই সিংহাসনের নির্মাণকার্য্যে সাত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, এবং এক কোটি মুদ্রা ব্যয়িত (মজুরী ?) হইয়াছিল । সিংহাসনের গদী নির্মাণ করিবার জন্ত যদি মুক্তার অলঙ্কৃত এগারখানি তক্তা ব্যবহৃত হইয়াছিল ; তাহার মধ্যস্থানীয় তক্তাখানি পাদশাহের উপবেশনের নিষিদ্ধ স্থাপিত । উহার গঠনে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল ।

ইরানের অধিপতি শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরকে এক লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একখানি পদ্মরাগ মণি উপহার দিয়াছিলেন; তাহাও এই মধ্যস্থলীর তক্তায় বিলুপ্ত হইয়াছে। শাহজাহান দক্ষিণাপথ-বিজয় সম্পন্ন করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে এই মণি প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করেন। ইহার পৃষ্ঠে তৈমুর, মীর শাহরুখ ও মীরজা উলুগ বেগের নাম খোদিত আছে। কালক্রমে ইহা শাহ আব্বাসের হস্তগত হইলে, তিনিও তাহাতে আপনার নাম অঙ্কিত করেন। জাহাঙ্গীর এই মণিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পূর্বোক্ত নামসমূহের নিম্নে স্বীয় পিতার ও নিজের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে বর্তমান পাদশাহের নামও ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।”

এত অপরিমিত ব্যয় সত্ত্বেও শাহজাহান কখনও অর্থের জন্ত প্রজা-পীড়ন করেন নাই, অথবা রাজকোষের দৈন্যদশা উপস্থিত হয় নাই। এই জন্তই পাদশাহের কার্যের সমর্থন করা যাইতে পারে। শাহজাহান বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্যসমূহ এক্রপ শৃঙ্খলাসহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, আমেদনগর-বিজয়ের, কান্দাহার অভিযানের, বাব্ব যুদ্ধের, অটোলিকারাজি-নির্মাণের, রাজকার্যের ও দুই লক্ষ নিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্তের ব্যয় নির্বাহ করিয়াও, তিনি মৃত্যুর পূর্বে কিঞ্চিৎ নগদ ছয় কোটি টাকা রাজকোষে সঞ্চিত রাখিয়া যান। (১) এতদ্ব্যতীত

(১) মোগল পাদশাহগণ অর্থ সঞ্চিত করিবার জন্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেন, তন্মধ্যে অন্ততঃ একটি স্মারানুমোদিত ছিল না। আমরা সে বিবরণটির উল্লেখ করিতেছি। মৃত আমীর ওমরাহগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা মোগল পাদশাহগণের চিরন্তন প্রথা। আকবর শাহ আমীর ওমরাহগণের সম্পত্তি গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু শাহজাহানের তাহাতে অস্বাভাবিক ছিল না। এ সম্বন্ধে দুইটি কৌতুকাবহ ঘটনার বিবরণ আমরা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। লেইকনাম খাঁ নামক একজন বিশিষ্ট রাজপুরুষ অগাধ ধনের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু আল্প হইলে তিনি গোপনে এই ধনরাশি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন, এবং তাহার পর বহুসংখ্যক ছিন্ন পাছুকা, পুরাতন লোহ, হাড় ও শততালিবিশিষ্ট বস্ত্র দ্বারা ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখেন।

রাশি রাশি মণি মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল । বর্ণি-
য়ার সঞ্চিত মণি মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যরাশির মূল্যের পরিমাণ ছয় কোটি
মুদ্রা বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু খাফি খাঁর মতে, সঞ্চিত
সম্পত্তির পরিমাণ চব্বিশ কোটি মুদ্রার ন্যূন ছিল না । খাফি খাঁর
নির্দেশ অতিরঞ্জিত নহে, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ
বিদ্যমান ।

শাহজাহানের রাজত্বকালে কেবল যে রাজভাণ্ডার স্ফীত, আগ্রা
দিল্লী বিচিত্র সৌধমালায় সুশোভিত ও দরবারের জাঁকজমক বর্ধিত
হইয়াছিল, তাহা নহে । প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধিও বহুলপরিমাণে
বর্ধিত হইয়াছিল । ম্যাণ্ডিসো আগ্রা নগরীকে আরতনে ইম্পাহানের
দ্বিগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । তিনি আগ্রা নগরীর সুপ্রশস্ত
রাজপথ, সুদৃশ্য পণ্যবীথিকা, অসংখ্য স্নানাগার ও পাঠশালার প্রভূত
প্রশংসার আপনার গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন । মোগল শাসনকালে বহু-

ঠাহার মৃত্যুর পর পাদশাহ অর্থলাভাশায় ঔৎসুক্য সহকারে এই ধনভাণ্ডার উদঘাটন
করিয়া একান্ত অপ্রতিভ হন । একজন ধনাঢ্য হিন্দু বণিকের মৃত্যুর পর তদীয়
বিলাসপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল পুত্র পিতার ধনরাশি হস্তগত করিতে প্রবৃত্ত হয় । এই বিলাস-
পরায়ণ অপরিপক্ববুদ্ধি যুবক সমস্ত সম্পত্তি অচিরে নষ্ট করিবে আশঙ্কা করিয়া
তদীয় মাতা তাহাতে বাধা দিয়া নিজে সমস্ত ধন গ্রহণ করেন । বণিকপুত্র
মাতার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করে । পরলোকগত বণিক অনেক
সময় রাজকার্যে নিরত থাকিতেন । শাহজাহান এই ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া
বিধবা বণিকপত্নীকে রাজদরবারে আহ্বান করিয়া সঞ্চিত ধনের একাংশ রাজকোষে
অর্পণ করিতে আদেশ দেন । তদুত্তরে বিধবা বলেন, “আমার পুত্র তাহার পিতার
ধনের দাবী করিতে পারে ; অভিযোগকারী আমাদের পুত্র, কাজেই উত্তরাধিকারী ।
আমি দীনভাবে জিজ্ঞাসা করি, আমার পরলোকগত স্বামীর সহিত জাহাপনার কি
সম্পর্ক ছিল যে, জাহাপনা ঠাহার পরিত্যক্ত ধনের অর্দ্ধাংশ দাবী করিতেছেন ?”
পাদশাহ ঠাহার এই রহস্যপূর্ণ সরল বাক্যে প্রীতিলাভ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন
এবং ঠাহার ধনরাশির একাংশ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রত্যাহার করেন ।

সংখ্যক বিদেশী ভ্রমণকারী এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরমালার ও অমিতফলশস্যপূর্ণ দেশের বর্ণনা করিয়াছেন । ম্যাণ্ডেসৌর বিবরণ হইতে শুভরাত্রের সমৃদ্ধির বিবরণ, গারক ও ক্রটনের প্রবন্ধ হইতে বঙ্গ-বিহারের ধন ধাত্তের কথা ও ট্যামারনিয়ারের ভ্রমণকাহিনী হইতে সমগ্র দেশের ঐশ্বর্য্যের বিষয় জানা যাইতে পারে ।

বর্তমান ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পূর্ববর্তী লেখকগণের বর্ণিত সমৃদ্ধির বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে । কিন্তু পরিত্যক্ত নগরমালার ভগ্নাবশেষ, হর্ম্যরাজির ও জলপ্রণালীর চিহ্ন আজ পর্য্যন্তও নানা স্থানের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায় । এতদ্ব্যতীত আধুনিক রাজপথের পার্শ্বে প্রাচীন পথের অবশেষ, কূপ ও পাহাশালার চিহ্ন পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে । এই সকল ভগ্নাবশেষ মোগল শাসনকালের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই । (১)

স্বচ্ছল রাজকোষ, শান্তিপূর্ণ দেশ, সমৃদ্ধ প্রজা লইয়াও শাহজাহান পূর্ণ সুখশান্তি উপভোগ করিতে পারেন নাই । তদীয় পুত্রগণের

(১) আমরা শাহজাহান পাদশাহের রাজত্বের যে বর্ণনা করিলাম, তাহাতে পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, তাঁহার আমলে প্রকৃতিপুঞ্জের সুখশান্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছিল । তখনও রাজস্ব কর্ত্তাচারিগণের অত্যাচার একেবারে লুপ্ত হয় নাই, এবং কখন কখন কাজিগণের অর্থলোলুপতা নিবন্ধন বিচার-ব্যভিচারও সংঘটিত হইত । ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের সাক্ষ্য জানা যায় যে, শুকগ্রাহী কর্ত্তাচারিগণ অত্যাচার করিয়া অর্থশোষণ করিত । ইহারা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের খামখেয়ালির বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । ভারতবর্ষের অনেক স্থান জঙ্গলে আবৃত ছিল । এই সকল স্থানে চোর ডাকাত নির্বিঘ্নে অবস্থান করিত । কখন কখন রাজপুরুষ অথবা সামন্তগণ বিজোহী হওয়ার দেশমধ্যে অশান্তি বিস্তৃত হইয়া পড়িত । কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও শাহজাহানের শাসনসময়ে দেশ শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, এবং তাঁহার রাজত্বকালেই মোগল গৌরব-রবি মধ্যাহ্ন আকাশে উপনীত হইয়াছিল ।

পরস্পরের মধ্যে অসন্তোষই ইহার কারণ ছিল । পাদশাহের চারি পুত্র ও দুই কন্যা ছিল । পুত্র,—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ ; কন্যা,—জাহানারা ও রোশেনারা । ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে রাজকুমারগণ রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ।

কিশোরবয়স্ক আওরঙ্গজেব আপনার বয়সের তুলনায় প্রথম বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়া পাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র হন । দেহশীল পাদশাহ কখনও কোন রাজকুমারকে উপেক্ষা করেন নাই । তথাপি অপর রাজকুমারের আওরঙ্গজেবের প্রতিপত্তিদর্শনে ঈর্ষাবিত হন । বিশেষতঃ, মদগর্ভিত উচ্ছৃঙ্খল সুজার পক্ষে পিতার এই পক্ষপাত অসহ্য হইয়াছিল । একান্ত তিনি রাজদরবার হইতে দূরে থাকিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন । তদনুসারে পাদশাহ তাঁহাকে পাঁচহাজারী মনসব প্রদান করিয়া দক্ষিণাপথের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করেন । দ্বিতীয় রাজকুমার সুজা রাজসম্মান লাভ করাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা আপনাকে অপমানিত মনে করেন । পাদশাহ তাঁহার ক্ষুদ্রচিত্ত শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলেন, “দারা, রাজকুমারগণের মধ্যে তুমিই সর্বাপেক্ষা আমার হৃদয়ের অধিক নিকটবর্তী ; একান্ত তোমাকে সম্মিথানে রাখিয়াছি ।” কিন্তু দারা তাঁহার বাক্যে শাস্ত না হওয়াতে তিনি তাঁহাকে ছয়হাজারী মনসব প্রদান করেন । সৌভ্রাতৃ বহুকাল পূর্বেই তৈয়ুবংশীয় রাজকুমারগণের হৃদয় হইতে অস্তহিত হইয়াছিল । শাহজাহানের পুত্রগণও পরস্পরকে ঘৃণা করিতেন । রাজকুমারগণের মনোমালিন্য নিবন্ধন রাজসংসারে অশান্তির অবধি ছিল না । পাদশাহ ভ্রাতৃবর্গের মনোমালিন্যের মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে কাণ্যভার প্রদান করিয়া দূরদেশে প্রেরণ করেন । সুজা বঙ্গদেশের, আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথের

ও মুরাদ গুজরাটের শাসন-কর্তার পদলাভ করেন । দারা সর্বজ্যেষ্ঠ ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজসম্মিধানৈই থাকেন ।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় সফল ফলিল না । রাজকুমারগণ সকলেই কার্যপটু ও শৌর্যবীৰ্য্যশালী ছিলেন । তাঁহারা ধনধান্তপূর্ণ প্রদেশ-সমূহের শাসনকর্তার পদে অভিষিক্ত হইয়া ধনবলে ও জনবলে পরাক্রম-শালী হইয়া উঠিলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন অধিকার করিবার উপায়-উদ্ভাবনে নিরত হইলেন । তাঁহাদের অবিশ্রাস্ত চক্রান্তের ফলে রাজপুরুষগণ পাদশাহের জীবদ্দশাতেই এক এক পক্ষ অবলম্বন করেন । তাঁহার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনাভিলাষী রাজকুমারগণের সংঘর্ষ আরম্ভ হইবে, এবং তাহার ফলে মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় পাদশাহের হৃদয়ে অশান্তির সীমা ছিল না ।

এই প্রকার মানসিক অশান্তির সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পাদশাহ মহম্মদ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন । শাহজাহানের বার্ষিক্যকালে জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শেকোর হস্তে অধিকাংশ রাজকার্যের ভার পতিত হইয়াছিল । বের্ণিয়ার লিখিয়াছেন, “শাহজাহান দারাকে আদেশ প্রচার করিবার ও রাজসিংহাসনের নিম্নে ওমরাহ শ্রেণীর মধ্যে সিংহাসন পাতিয়া উপবিষ্ট হইবার অমুমতি প্রদান করিয়াছিলেন ; অতএব বোধ হইত, যেন প্রায় সমানকমতাপন্ন দুই জন রাজা শাসনকার্য্য নির্বাহিত করিতেছেন ।” কাক্স লিখিয়াছেন,—“তাঁহার (শাহজাহানের) জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যশাসন বিষয়ে অপ্রতিহত কমতা ছিল । তিনি যদৃচ্ছাক্রমে হস্তীর ক্রীড়ার জন্য আদেশ প্রচার করিতে পারিতেন ; এ কমতাপরিচালনের অধিকার কেবলমাত্র পাদশাহগণেরই ছিল ।” শাহজাহান রোগাক্রান্ত হইলে দারা প্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্যনির্বাহ করিতে লাগিলেন । এই সময় জনরব প্রচারিত হইল যে, শাহজাহান

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । দারা শেকো পিতার ছোটপুত্র ও একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন । এই জন্ত প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকেই মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিত, এবং তিনি নিজেও মনে মনে আপনাকে ভাবী সম্রাট জ্ঞান করিতেন । কিন্তু অপর রাজ-কুমারগণও তক্ত-তাউসে অধিরোহণ করিবার আশার জ্বালাঞ্জলি দেন নাই । শাহজাহান পীড়িত হইবার পূর্ব হইতেই তাঁহার তত্পরযোগী আরোজনে প্রবৃত্ত ছিলেন । পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে রাজ-কুমারত্রয় স্ব স্ব শাসিত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া শোণিতলোলুপ ক্রুদ্ধিত ব্যাঘ্রের স্থায় রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন । তাঁহার পশ্চিমধ্যে অবগত হইলেন যে, পাদশাহ জীবিত আছেন । তথাপি তাঁহার রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।

রাজকুমারত্রয়ের মধ্যে সুজাই সর্বাধিক অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন । এ জন্ত দারা শেকো সর্বাগ্রে তাঁহার গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন । বারাণসীর সন্নিকটে উভয় সৈন্তে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । সুজা রাজসৈন্তের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ।

সুজা পরাস্ত হইলে রাজসৈন্ত আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বক্সকে শিক্ষা দিবার জন্ত ধাবিত হইল । আওরঙ্গজেব দেখিলেন যে, রাজসৈন্ত পরাজিত করিতে পারিলেও তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক হইবে না । মুরাদ বক্স তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দী, এবং সুজা রাজসৈন্তের পরাক্রমে নিস্তেজ ও হীনবল হইলেও, পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিয়া ভাগ্যপরীক্ষায় সচেষ্ট । এই জন্ত আওরঙ্গজেব নিজের প্রকৃত মনোভাব গুপ্ত রাখিয়া কৌশলে মুরাদকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সাহায্যে রাজসিংহাসন অধিকার করিবার মানস করিলেন । এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত তিনি মুরাদকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি রাজত্বের প্রমাসী নহি । বিক্রমী দারা ও ব্যসনরত সুজা সিংহাসনে

আরোহণ করিতে না পারিলেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় । একমাত্র তুমিই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য । আমার ইচ্ছা, তোমাকে সাহায্য করি । তুমি সিংহাসনে আরোহণ করিলেই আমি ককিরী গ্রহণ করিব । ভাই ! তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার অনুমতি দাও ।” মুরাদ বক্স আওরঙ্গজেবের ছলনায় প্রতারিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, এবং উভয় ভ্রাতা একত্র আশ্রয় সন্নিধানে উপনীত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত (১) ও বৃদ্ধ পিতাকে অবরুদ্ধ করিয়া, রাজধানী অধিকার করিলেন । দারা শেকে ক্ষত্রহন্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার আশায় সিন্ধুপ্রদেশে পলায়ন করিলেন ।

আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বক্স দ্বারার অনুসরণ করিয়া মথুরায় উপনীত হইলেন । সরলহৃদয় মুরাদ শৌর্যবীৰ্য্যে অলঙ্কৃত ছিলেন । তিনি আন্তরিক সাধুতা ও সত্যানুরাগ নিবন্ধন মহাত্মা সাদির উপদেশবাক্যে

(১) ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের জুনমাসের প্রথম ভাগে চাঞ্চল নদীর তীরে সামগড় (যুদ্ধের পর এইস্থানে কতেবাদ নামপ্রাপ্ত হয়, কতেবাদ শব্দের অর্থ,—বিজয় স্থান) নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় । এই যুদ্ধে বিজয়শ্রী প্রথমে দারার দিকে হেলিয়া পড়েন । আওরঙ্গজেবের সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, কেবল মাত্র এক সহস্র সৈন্য তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে । এই দারুণ সঙ্কটকালেও আওরঙ্গজেবের স্থিরবুদ্ধি ও অসম নাহস তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল না । তিনি পরাজয় আসন্ন দেখিয়াও পর্বতের স্তায় অটল ছিলেন । তিনি পার্শ্ববর্তী সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে বকুগণ ! নিরুৎসাহ হইও না, ঈশ্বর আছেন ; পলায়ন করিলে কোন ফললাভ হইবে না, আমাদের আশ্রয়স্থল দক্ষিণাপথ এখান হইতে কত দূর, তাহা অরণ্য করিও । ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন ।” এই উৎসাহবাক্য শেষ হইলে তিনি নিজের যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগের উপায় তিরোহিত করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় হস্তীর পশ্চয় শিকল দ্বারা বন্ধন করিতে আদেশ করেন । এই আদেশে সৈন্যবৃন্দের অবসন্ন প্রাণে চাঞ্চিত সঞ্চারিত হয়, তাহারা প্রভুর কাষে আত্মবিসর্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়া অবল বেগে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে । অতঃপর বিজয়লক্ষ্যে আওরঙ্গজেবের অকণায়িনী হন । এই যুদ্ধে মুরাদ বক্সও অবল পরাক্রম ও বিপুল সাহস প্রদর্শন করিয়া অসংখ্য শত্রুসৈন্য নাশ করেন ।

অবহেলা করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের তোষামোদবাক্যে ও মহাশয় উপচোকনে প্রলুব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মধুরায় উপনীত হইয়া তিনি এই সরল ব্যবহারের পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ প্রদর্শন পূর্বক মুরাদকে বন্দী করিয়া স্বয়ং রাজমুকুট ধারণ করিলেন। রাজকুমারের পদদ্বয় রৌপ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হস্তিপৃষ্ঠে সেলিমগড়ের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সেলিমগড়ের পথে প্রেরিত হস্তী ব্যতীত আর তিনটি সুসজ্জিত হস্তী অন্য তিন দিকে প্রেরিত হইল। রাজকুমারের পক্ষপাতী সৈন্যগণ পথিমধ্যে আওরঙ্গজেবের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিতে পারে, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব এইরূপ সতর্ক হইয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই সূজা পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়া রাজধানীর সমীপবর্তী হইলেন। আওরঙ্গজেব দারার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া সূজাকে বিদূরিত করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণব্যাপী অবিভ্রান্ত যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্যে সূজার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। আওরঙ্গজেব যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য দেখিয়া, বঙ্কনাবলে জয়লাভ করিবার কল্পনা করিলেন। তাঁহার কোশলে সূজার দক্ষিণবাহুস্বরূপ আলীবর্দী খাঁ প্রলুব্ধ হইয়া সূজাকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিবার পরামর্শ দিলেন। সূজা আলীবর্দীর মন্ত্রণাক্রমে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। আওরঙ্গজেব এই সংবাদ অবগত হইয়া জয়বাদ্যবাদনের আদেশ দিলেন। সূজার সৈন্যগণ শত্রুসৈন্যের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ও সূজাকে হস্তিপৃষ্ঠে না দেখিয়া মনে

করিল যে, তাহাদের প্রভু সূজা মিহর্ত হইয়াছেন, এবং আওরঙ্গজেব জয়লাভ করিয়াছেন । তখন তাহারা রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া, যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল । সূজার পরাজয় একপ গুরুতর হইল যে, তাহার পুনরুত্থানের কমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল । (১) তদবধি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, “সূজা জিৎ বাকী আপনা হাতে হারা ।”

সূজা সমূলে বিনষ্ট, দারা সিদ্ধু প্রদেশে নির্বাসিতপ্রায়, মুরাদ গোয়ালিয়ারের অন্ধকার কারাগারে বন্দী, তথাপি আওরঙ্গজেব আপনাকে নিরাপদ মনে না করিয়া পুনর্বার দারার অহুসরণ করিলেন । দারাও শক্তিসঞ্চয় করিয়া আওরঙ্গজেবের সম্মুখীন হইলেন । কিন্তু তিনি পুনর্বার পরাজিত হইয়া বেগম, শাহজাদী ও কতিপয় অমুচরের সহিত আমেদাবাদের অভিমুখে পলায়ন করিলেন ।

এই সময় দারার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল । পশ্চিমঘো কৃতর অমুচরগণ তাহার ধনসামগ্রী লুণ্ঠন ও শাহজাদীগণের গাত্ৰাভরণ অপহরণ করিল । মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী দারা নিরাপদ হইবার আশায় দুর্কিষহ পথকষ্ট ভুঞ্জ করিয়া আমেদাবাদে উপনীত হইলেন । কিন্তু তত্রত্য মোসলমান শাসনকর্তা আওরঙ্গজেবের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে আশ্রয়প্রদান করিলেন না । এই সংবাদ দারার নিকট পৌঁছছিলে মহিলাগণের আর্তনাদে পাষাণও বিগলিত হইল । দারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । তিনি পরিজ্ঞানের আশায় “সামান্য পদস্থ সৈনিকের সহিতও পরামর্শ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেহই

(১) সূজা আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হন । তথায় তিনি পুনরায় বলসংগ্রহের চেষ্টা করেন ; তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া আরাকান রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন ; কিন্তু নিষ্ঠুর আরাকান-রাজ্যের আদেশে সপরিবারে বৃশসভাবে নিহত হন ।

কোন সহপায়ে উদ্ধাবন করিতে পারিল না। দারা নিরুপায় হইয়া তৎক্ষণীয় দস্যুদলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহাদের যত্নে তিনি শুষ্করাটে উত্তীর্ণ হইয়া কচ্ছদেশের প্রান্তভাগে উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে স্থানীয় জমীদারের আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু কচ্ছের জমীদার পূর্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এই স্থান হইতে দারা বাম্পাকুললোচনে বিদায়গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি নানা স্থানে ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে তিনি ধান্ডরের অধিপতি মালিক জিওয়ানের (১) নিকট উপনীত হইলেন। মালিক জিওয়ান তাঁহাকে সাদরে ও সসন্মানে আশ্রয়প্রদান করিল; কিন্তু গোপনে তাঁহাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজাহুগ্রহলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। মালিকের আশ্রয়গ্রহণ করিবার কয়েক দিন পরেই দারার মহিষী অনাহার ও পথের কষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দারা মহিষীকে লাহোরে সমাহিত করিবার জন্য অধিকাংশ অমুচরবর্গকে মৃতদেহ সহ তথায় প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং মালিকের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সুযোগে মালিক তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার যত্ন করিল। দারা নিদ্রিত ছিলেন। এমন সময় মালিক তাঁহাকে ও তদীয় কনিষ্ঠকুমার সেপের শেকোকে বন্দী করিবার জন্য অমুচরগণ সহ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মালিক সেপের শেকোকে ধৃত করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, তিনি বিপুল সাহসে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁর ও ধনু গ্রহণ করিয়া তিন জন অমুচরকে ভূশায়ী করিলেন। সেপের

(১) ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এই ব্যক্তিকে জুনের অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা খাফিখান ইতিহাসের অনুসরণ করিলাম।

শেকা একে বালক, তাহাতে শত্রুগণ সংখ্যায় অধিক ; সুতরাং তিনি অচিরে পরিত্যক্ত হইয়া পড়িলেন ; মালিক তাঁহাকে ‘পিছমোড়া’ করিয়া বন্ধন করিল । এই গোলযোগে দারা জাগ্রত হইয়া উঠিলেন ; দেখিলেন, যে আশ্রয়দাতা, সেই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত ! তিনি মর্মান্তিক ক্ষোভে ও হুঃখে অভিভূত হইয়া বলিলেন, “কৃতঘ্ন ! শীঘ্র তোমার আরক কার্য সম্পন্ন কর । আমরা আওরঙ্গজেবের দুরকাজ-পরিভূষণি জন্ত প্রাণবিসর্জন করিতেছি ; কিন্তু মনে রাখিও, তোমার জীবনদান ব্যতীত (১) আর কোনও পাপে আমি ইহলোক হইতে অপমৃত হইবার যোগ্য নহি । আরও মনে রাখিও, কেহ কখনও কোন রাজকুমারকে ‘পিছমোড়া’ করিয়া বাধে নাই ।” মালিক দারার বাক্য বিচলিত হইয়া সেপের শেকার বন্ধনমোচন করিয়া দিল, এবং তাঁহাদের পাহারার জন্ত অশুচরবর্গকে নিযুক্ত রাখিল । ইহার পর মালিক তাঁহাদের ধনরত্ন অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল ।

মোগল সাম্রাজ্যের ভারী অধিকারী বন্দিবেশে দিল্লীতে আনীত হইলেন ; অতি সামান্ত জীর্ণবস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে প্রকাশ্ত রাজপথে পরিভ্রমণ করান হইল । নগরবাসিগণ দারার দুর্দশা দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল । স্ত্রীপুরুষনির্মিশেষে সকলে শোকাকুল হইল । তাহাদের কাতরধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত হইতে লাগিল । আওরঙ্গজেবের ইচ্ছিতে মৌলবীগণ গুপ্তসভায় সমবেত হইয়া দারাকে বিষমী স্থির করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন ।

দারা কারাগারে রাজকুমার সেপের শেকার সহিত অবস্থান করিতে-

(১) একবার শাহজাহান কোনও দুর্কার্যের প্রতিকলমরূপ মালিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু দারার অনুরোধে তাহাকে মার্জনা করিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন ।

ছিলেন । তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইবার পর আওরঙ্গ-জেবের অনুচরগণ তাঁহার নিকট হইতে রাজকুমারকে বলপূর্বক লইয়া গেল । তিনি এই ঘটনার মৃত্যু আসন্ন বৃত্তিতে পারিয়া, শেষ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন । খৃষ্টধর্মযাজকগণ তাঁহাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন । মৃত্যুর প্রাকালে খৃষ্টধর্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল । তিনি এক জন খৃষ্টধর্মযাজককে কারাকক্ষে আনয়ন করিবার অনুমতি চাহিলেন । কিন্তু এ অনুমতি পাইলেন না । এই দুর্দশার সময় তিনি ঈশ্বরের করুণালাভের প্রয়াসী হইলেন । দারা একাধিকবার বলিয়া-ছিলেন, “মোহাম্মদ আমাকে বিনাশ করিয়াছেন, যীশু আমাকে রক্ষা করিবেন ।” এই সময়ে নাজির নামক এক ছুরাখা দারাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কারাকক্ষে প্রবেশ করিল । মুহূর্তমধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল । দারার ছিন্ন মস্তক আওরঙ্গজেবের নিকট নীত হইল । আওরঙ্গজেব, যথার্থই দারার মস্তক কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং তাহার পর সেই শির কারাক্ষ পিতার নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিলেন । (১)

আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃগণের মধ্যে একমাত্র মুরাদ বাক্স অবশিষ্ট রহিলেন । তিনিও গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ছিলেন । এই স্থানে সরস্বন বাই নাম্নী প্রিয়তমা উপপত্নী তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল । প্রস্তরময় কঠিন কারাগারে তাঁহার দিন দীর্ঘনিশ্বাসে ও অশ্রুজলে অতিবাহিত হইতেছিল । কতিপয় অনুরক্ত মোগলের উদ্যোগে মুরাদ রজ্জুনির্মিত সোপানের সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন করিবার বন্দোবস্ত

(১) বের্নার লিখিয়াছেন,—আওরঙ্গজেব ছিন্নমস্তক-পরীক্ষাশ্বে বলেন,—“Ah (Ai) Bedbakt ! A wretched one ! let this shocking sight no more offend my eyes, but take away the head, and let it be buried in Humayon's tomb.” আমরা এ স্থলে কাকুর (যেশুসীর) অনুসরণ করিয়াছি ।

করিলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা উপপত্নী একাকিনী কারাগার মধ্যে অবস্থান করিতে অস্বীকৃত হইয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিল । তাঁহার চীৎকারে প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া উঠিল ; মুরাদ আর পলায়ন করিতে পারিলেন না । এই ঘটনা আওরঙ্গজেবের প্রতিগোচর হইলে তিনি মুরাদকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক হইবার সঙ্কল্প করিলেন । রাজবিপ্লবের সূত্রপাতকালে মুরাদ গুজরাটের শাসন-কর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তৎকালে তিনি একজন রাজপুরুষকে বধ করিয়াছিলেন । আওরঙ্গজেবের জনৈক প্রসাদাকাজ্ঞা অনুচর তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল । বিচারাতিনয়ের পর মুরাদের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন ।

শাহজাহান অপরূপাবস্থায় মাত্ত বৎসর জীবিত ছিলেন । এই সময় ফরাসী পরিব্রাজক বের্নিয়ার মোগল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন । তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতী ছিলেন না । তিনিও বলেন যে, আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে অপরূপ পিতার পবিচর্যা করিতেন, তাঁহার তৎকালীন ব্যবহার যথার্থই সম্মানবাজক ও প্রীতিপূর্ণ বোধ হইত । তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পিতার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । এক স্বাধীনতা ব্যতীত আওরঙ্গজেবের পক্ষে পিতাকে অদেয় আর কিছুই ছিল না । তাঁহারা ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং পিতা পুত্রের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । এই অবস্থাতেও শাহজাহানের ভোগলালসার হ্রাস হয় নাই । তিনি সর্বদা বিলাসভরজে আনন্দোন্মিত হইতেন । আবার কখনও কখনও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা উপস্থিত হইত,—তখন তিনি মোল্লাগণকে কোরাণপাঠ করিবার আদেশ দিতেন ।

শাহজাহানের বন্দীদশায় তদীয় প্রিয়তমা কন্যা জাহানারাই তাঁহার জীবনের আলোকস্বরূপিণী ছিলেন । ভক্তিমতী কন্যার প্রীতিপূর্ণ সেবা শুক্রমাই তাঁহার সাধনার হেতু হইয়াছিল । বেগিমার জাহানারাকে অনিন্দ্যসুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও পিতৃস্নেহপরায়ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । শাহজাহান তাঁহাকে আদর করিয়া “পাদশাহ বেগম” উপাধি প্রদান করেন । কি গৃহস্থলীর তত্ত্বাবধান, কি রাজনৈতিক মন্ত্রণা, সকল বিষয়েই শাহজাহান তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন । জাহানারাও পিতার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন । আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে শাহজাহান কারাগারে নিষ্কিণ হইলে তিনিও স্বেচ্ছায় কারাবাসিনী হইয়াছিলেন । তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠ সেবাশুক্রমার শাহজাহানের কারাক্লেশ যে বহুলপরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । (১)



(১) “জাহানারা পিতার মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন । জাহানারার শেষজীবন সম্ভবতঃ দিল্লীতে অতিবাহিত হইয়াছিল । পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে পথে একটি প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায় । • • • তাঁহারই পার্শ্বে মরি ! মরি ! কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য ! যখন মোগলকূলের কংস আওরঙ্গজেব আপন পিতা শাহজাহানকে বন্দী করিলেন, তাঁহার কন্যা জাহানারা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া পিতার সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গে কারাবাসিনী হন । তাঁহার একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মরকবর, মধ্যস্থান শ্যামল দুর্বাদলে শোভিত । কবরের শীর্ষদেশে একটি স্বৈত মর্ম্মরফলকে তাঁহার নিজের রচিত একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে :—

বহুমূল্য আভরণে

করিও না হুমসজ্জিত

কবর আমার ।

তুণশ্রেষ্ঠ আবরণ

দীলাআম্মা জাহানারা

সম্রাট কন্যার ।”

কবিবর শ্রীধর নবীনচন্দ্র সেন ।

আলমগীর । (১)

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া ও ভ্রাতৃরক্তে স্নাত হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। যে সাম্রাজ্য করতলগত করিবার জন্য তিনি পাপে দ্বিধাশূন্য হইয়াছিলেন, এবং যাহার গৌরববৃদ্ধি ও স্বাধিত্বের কামনায় অজীবন অক্লান্তভাবে সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগেই সেই সাম্রাজ্য অবনত হয়।

আকবরের অনন্ত সাধারণ উদারতাগুণে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া ছিল। তিনি হিন্দু মোসলমানকে প্রীতিসূত্রে গ্রথিত করিয়া যোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব পূর্বপুরুষের অমুদৃত উদারনীতি পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ণ নীতির অনুবর্তী হন ; ইহার ফলে আকবর গ্রথিত প্রীতিসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, এবং যোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসবীজ উগ্ধ হয়।

আওরঙ্গজেব আকবরের উদারনীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে নীতির সমীচীনতা সত্ত্বেও তাঁহার কোন প্রকার দ্বিধা ছিল না। আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্য লাভের অব্যবহিত পরেই কারারুদ্ধ পিতাকে লিখিয়াছিলেন, “* * * শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞেতাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নরপতি নহেন। পৃথিবীর বহুজাতি অনেকবার অসভ্য বর্বর কর্তৃক পরাভূত হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত রাজ্য সকল কতিপয় বৎসর মধ্যেই শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যিনি অপক্ষপাতে প্রজাপালন

(১) আওরঙ্গজেব সিংহাসনে অধিরোধন করিয়া আলমগীর (জগৎজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ইতিহাসে আওরঙ্গজেব নামেই সমধিক পরিচিত।

জীবনের সার ত্রুত করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ শ্রেষ্ঠ নরপতি ।” একপ বিশ্বাস সঙ্গেও আওরঙ্গজেব কি জন্তু আকবর শাহের উদারনীতি পরিত্যাগ পূর্বক বিপথাবলম্বী হইয়া সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি ।

সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক বের্ণিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন, মোগল রাজ-কুমারবৃন্দের শৈশবশিক্ষার বন্দোবস্ত অতি কদর্য্য ছিল । খোজা প্রভৃতি নিকট শ্রেণীর জীবের হস্তে তাঁহাদের লালনপালনের ভার অপিত হইত । আওরঙ্গজেবের শৈশবকালও এই সকল জীবের কুসংসর্গেই অতিবাহিত হয় ।

আওরঙ্গজেব ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার জন্মের দুই বৎসর পরে নূরজাহানের কুটিল চক্রে জাহাঙ্গীর পাদশাহের সঙ্গে শাহজাহানের মনোবাদ উপস্থিত হয় । শাহজাহান পিতার কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই পরাজিত হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন । এই ভাবে তিন চারি বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি অনন্তোপায় হইয়া ক্রমাগত পূর্বক পিতার ক্রোধশাস্তি করেন, এবং দক্ষিণাপথে নিরাপদে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন । এই সময় শাহজাহান স্বীয় সচিবহারের প্রতিভূস্বরূপ পুত্র দারা ও আওরঙ্গজেবকে পিতার নিকট প্রেরণ করেন । একারণ আওরঙ্গজেব বাল্যকালেই পিতামাতার মেহ-ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন । বালক আওরঙ্গজেব পিতামহের নিকট কিরূপ শিক্ষালাভ করেন, তাহিবয় আমরা কিছুই অবগত নহি । সম্ভবতঃ নূরজাহানের বিদেষকলুষিত তত্ত্বাবধানেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল ।

আওরঙ্গজেবের বয়স যখন ন্যূনাধিক নয় বৎসর, তখন জাহাঙ্গীর

কালগ্রাসে পতিত হন, এবং শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোধন করেন । শাহজাহান রাজপদ লাভ করিয়া আওরঙ্গজেবের শিক্ষার জন্য মোল্যা শালে নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন । সমুচিত শিক্ষা দ্বারা বালকের চিত্ত ও চরিত্র গঠনের ক্ষমতা শালের ছিল না । তিনি কতিপয় বৎসর আওরঙ্গজেবকে আরবি ব্যাকরণ, নিরর্থক শব্দতত্ত্ব এবং নীরস দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া তাঁহার স্মৃতিশক্তি ভারগ্রস্ত করেন । শালে পৃথিবীস্থ বিভিন্ন জাতির বিবরণ,—তাহাদের সামরিক বল, তাহাদের শাসনপ্রণালী, তাহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার এবং তাহাদের ধর্ম-নীতি সম্বন্ধে কোন উপদেশই আওরঙ্গজেবকে প্রদান করেন নাই । বিশ্রুতনামা সাম্রাজ্য সকলের অভ্যুদয় ও পতনের কারণ অথবা মানব-জাতির সুখ দুঃখের গূঢ় রহস্য,—আওরঙ্গজেব গুরুর নিকট ইহার কোন তত্ত্বই শিক্ষালাভ করেন নাই । রাজ্য প্রজার কি সম্পর্ক, এবং সে সম্পর্ক কি প্রকার পবিত্র, আওরঙ্গজেব যাহাতে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্ম শালে এক দিনের নিমিত্তও যত্ন করেন নাই । সংক্ষেপে বলিতে হইলে, যে শিক্ষা মনুষ্যের সমুখে জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে “মহত্ত্ব ও মাধুরী এবং প্রীতি ও নীতির ভিন্ন ভিন্ন পটলে” অভ্যস্ত করে, তাহা আওরঙ্গজেবের ভাগ্যে ঘটিয়া ছিল না ।

ফলতঃ, আওরঙ্গজেব কি শৈশবে, কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কোন কালেই সুশিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই । তাঁহার শিক্ষা যে সম্পূর্ণ নিফল হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেও সম্যক অবগত ছিলেন । আওরঙ্গজেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তদীয় শিক্ষাগুরু শালে পুরস্কার-লোভে তাঁহার নিকট উপনীত হন । এই সময় পাদশাহ তাঁহার শিক্ষাদানের বহু ক্রটি প্রদর্শন করিয়া বলেন, “হে মোল্লাজি, আপনি যথাস্থানে

প্রস্থান করুন ; আপনি কে, এবং আপনার কি ঘটনাছে, তাহা যেন অতঃপর কেহ জানিতে না পারে ।”

মোস্তাজির নীরস শিক্ষার আওরঙ্গজেবের হৃদয় ও মন শুষ্ক হইয়া উঠে । এই শুষ্কতা নিবন্ধন তাঁহার হৃদয় প্রীতির অভিসিঞ্জন দিক্ হইতে পারে নাই । হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন,—ইহাই মনুষ্যের প্রবল কামনা ; একামনা প্রীতির আকর্ষণ জাত । এই যে পৃথিবীব্যাপী বিশ্বাস,—এই যে একহৃদয় অত্র হৃদয়ে নির্ভর করিয়া সংসারের জটিল-বস্ত্রে নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করিতেছে, ইহার মূল প্রীতির মোহন মন্ত্র । প্রীতিলেশহীন আওরঙ্গজেব পরের অনুরাগ লাভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না । তিনি অন্তের প্রতি নির্ভর করিবার পূর্বে বহুবার অগ্রে ও পশ্চাতে দৃষ্টি করিতেন । বস্তুতঃ আওরঙ্গজেব অতিশয় সন্দেহমণ্ডিত ছিলেন, লোকের সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের অস্তিত্বে সহসা বিশ্বাস করিতেন না । প্রীতিতত্ত্ব অতি গভীর । প্রীতি “হৃদয়ের একটি স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম” ; কিন্তু শিক্ষার দোষে অথবা অত্র কোন কারণে মনুষ্যপ্রীতিলেশহীন হইলে মন অশান্ত হইয়া উঠে, এবং জীবন মরীচিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয় । “তখন সুখের সঙ্গীতের মধ্যে বিবাদের সংকীর্ণন আরম্ভ হয় ।”

একারণ, আওরঙ্গজেব আজন্ম বিলাসে পরিবর্তিত হইয়াও যৌবনের প্রারম্ভে সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন । আওরঙ্গজেব যখন সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক তরুণ যুবক, তখন শাহজাহান তাঁহাকে শাসনকর্তার পদে বরণ করিয়া দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন । কিন্তু তিনি শাসনকার্যে মনোনিবেশ না করিয়া সর্বদা ধর্ম্মালোচনায় মগ্ন থাকিতেন । এবং বহুমূল্য রাজোচিত বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া সর্বদাই পবিত্রতার আচ্ছাদনস্বরূপ শুভ্রবেশ পরিধান করিতেন । তিনি

চব্বিশ বৎসর বয়সে সংসারাত্মক পরিত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করি-
বার বাসনা প্রকাশ করেন । তাহার পর আওরঙ্গজেব পশ্চিমঘাট
পর্বতমালার বিজন প্রদেশে কুটীর নির্মাণ করিয়া সংসারত্যাগী ফকী-
রের জায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । শাহজাহান আও-
রঙ্গজেবের সংসারবিতৃষ্ণার বিষয় অবগত হইয়া এতদূর বিরক্ত হইয়া-
ছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার বৃত্তি রহিত করেন,
এবং তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া
তাঁহার পদমর্যাদার লাঘব করেন । আওরঙ্গজেব বিলাসে বিতৃষ্ণ হইয়া
বৈরাগ্যের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন ; বৈরাগ্যও মোহন দৃশ্য উন্মুক্ত
করিয়া তাঁহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়াছিল । কিন্তু অনাসক্ত ত্যাগী ফকী-
রের জায় জীবনযাপন করিতে করিতে বৈরাগ্যের শান্তি ও মাধুর্য্য অন্ব-
হিত হইয়া গেল । আওরঙ্গজেব এক বৎসর নির্জন কুটীরে বাস করিয়া
পুনর্বার সংসারে ফিরিয়া আসিলেন ; তাঁহার বৈরাগ্যের স্বপ্ন ভাঙিয়া
গেল ; সন্ন্যাসী যুবক রাজনীতিক্ষেত্রে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া সৈন্ত পরিচাল-
নের ভারগ্রহণ করিলেন । বিলাস-বিরক্ত বীতম্পৃহ পুত্রকে পুনর্বার
সংসারে ফিরিতে দেখিয়া শাহজাহান প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে বাল্ব দেশের
শাসনার্থ প্রেরণ করিলেন । এখানে তিনি অসাধারণ মনোবীরাগ, অতুল-
কার্য্যকুশলতা এবং অসম সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া সর্বসাধ-
রণের বরেণ্য হইলেন । এই সময় হইতে আওরঙ্গজেব পুনঃ পুনঃ
দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ত নিযুক্ত হইতেন । ইহার পর হইতে
আওরঙ্গজেব কার্য্যের আবর্তে বারংবার ঘূর্ণ্যমান হন । শাসনক্ষমতার
আনন্দ পাইয়া তিনি ক্ষমতালোলুপ হইলেন, এবং দিল্লীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া
তাঁহার হৃদয়ে দুঃস্বাদ জাগিয়া উঠিল ।

অবশেষে আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির যত্নরূপে

পরিণত হইল । যখন আওরঙ্গজেবের চরিত্র এই ভাবে গঠিত হইল, তখন শাহজাহান তাঁহাকে পুনর্বার দক্ষিণাপথের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন । এই সময়েই তিনি একজন কূটবুদ্ধি রাজনীতি-বিশারদ বলিয়া সর্বত্র খ্যাতিলাভ করেন । ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আত্ম-গোপন করিয়া তিনি গোপনে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য যত্নবশ্রে লিপ্ত হইলেন । ইহার পর হইতে তিনি প্রত্যেক অসদমুঠানেই ধর্ম্মবিশ্বাসের আবরণ দিতেন । শাহজাহান রোগশয্যায় শয়ান হইলে তিনি পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য দক্ষিণাপথ হইতে বাত্মা করিবার সময় সমবেত সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “ঈশ্বর সাক্ষী, আমি ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি ।” আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার জন্য যখন লাঠুরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তখনও তিনি ধর্ম্মের ভান পরি-
ত্যাগ করেন নাই । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার পর আওরঙ্গজেব তদীয় বিধবা মহিষীর অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা মহিষীকে বিবাহ না করিলে প্রত্যাবায়ভাগী হইতে হয় । এই প্রকারে প্রত্যেক অসদমুঠানেই তিনি নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস যত্নরূপে ব্যবহার করিতেন ।

আওরঙ্গজেব তক্ততাউসে অধিরোহণ করিবার জন্য কোনরূপ পাপা-
মুঠানেই কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না । একারণ তিনি বিশিষ্ট মোসলমান
সমাজের বিরাগভাজন হন । তিনি মোসলমান সমাজের প্রীতি ও
শ্রদ্ধালাভ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন । আওরঙ্গজেব পরধর্ম্মে বিদ্রোহ
প্রকাশই মোসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া অব-
ধারণ করেন ! ভারতবর্ষের অধিকাংশ মোসলমানই সুন্নি মতাবলম্বী
ছিলেন । আওরঙ্গজেব নিজেও সুন্নি ছিলেন । সুন্নিগণ মোহাম্মদের

বিরোধী হিন্দু ও মোহাম্মদের ভক্ত শিরা উভয়কেই তুল্যরূপ বিদ্বেষ করিতেন । একারণ আওরঙ্গজেব তাঁহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইবার আশায় রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই হিন্দু ও শিরাদিগের দলনে প্রবৃত্ত হন । তাঁহার ব্যবহারে বোধ হইত, যেন তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের অশ্রদ্ধাশীল স্বীয় কলঙ্ককালিমা বিধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পরধর্ম নির্ঘাতনে প্রবৃত্ত হন । সুতরাং তাঁহার পরধর্ম বিদ্বেষের মূল প্রথমে প্রকৃতিগত ছিল না । কিন্তু কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ লিপ্ত হইলে তাহা অবশেষে প্রকৃতিগত হইয়া উঠে । এজন্ত পাদশাহের পরধর্মবিদ্বেষও শেষে আন্তরিক ও অকৃত্রিম হইয়া পড়ে । তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগেই এই বিদ্বেষ পূর্ণমাত্রায় একটু হয় নাই ; ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মানুসারে পর্যায় মত পূর্ণতান্নত করে ।

মোগল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ মোসলমান রাজকর্মচারী শিরা-মতাবলম্বী ছিলেন । এই সকল রাজকর্মচারী মোগল-সাম্রাজ্যের মঙ্গল-কামনায় প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, সর্বাস্বঃকরণে সাম্রাজ্যের উন্নতি-কামনায় নিরত থাকিতেন, প্রভুর কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেই চরিতার্থ হইতেন, আপনাদের উন্নতি মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির সহিত অচ্ছেদ্য যন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন । আওরঙ্গজেব এই স্বজাতীয় বিশ্বস্ত কর্মচারীগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, বরং তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিশ্বাসী বলিয়া হিন্দুর ভ্রায় ঘৃণা করিতেন । তাঁহার ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহারে বিশ্বস্ত মোসলমান রাজপুরুষগণও বিরক্ত হইয়াছিলেন । এই সকল কারণে তাঁহারা আর মোগলসাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না । কিন্তু আওরঙ্গজেবের অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতাপে সকলেই সন্ত্রস্ত ছিলেন, সুতরাং কোন রাজপুরুষই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হন

নাই। এই জন্যই তাঁহাদের মনোভাব পাদশাহের জীবদ্দশায় একাধিত্ব হয় নাই। কিন্তু ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। কারণ, অসংখ্য কর্মচারীকে কোন কার্যে নিযুক্ত করিলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

আওরঙ্গজেব শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে আকবরের প্রবর্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্মবিদ্বেষবশে তিনি একটি গুরুতর পরিবর্তন করেন। আওরঙ্গজেবের রাজ্যাভ্যাসের পূর্বে মোগল সাম্রাজ্যে হিন্দু সেনাপতিগণ সৈন্যপরিচালন করিতেন; হিন্দু শাসনকর্তৃগণ দেশশাসন করিতেন; যে সকল সেরেস্তার কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে হইলে শিক্ষিত লোকের আবশ্যক হইত, তাহা একমাত্র হিন্দুরই একচেটিয়া ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে সময়ে রাজপুত সেনাই মোগলবাহিনীর প্রাণ ছিল। কিন্তু পরধর্মবিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া আওরঙ্গজেব হিন্দুদিগকে পদচ্যুত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। (১) কার্যপটু হিন্দু কর্মচারিগণ পদচ্যুত হইলেন, তাঁহাদের পরিবর্তে অধ্ব-শিক্ষিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মোসলমানগণ উচ্চপদে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। ইহার ফল বিষময় হইল। আওরঙ্গজেব নিজে এসলাম ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনমতে স্থায়বিচার ও প্রজাপালনে পরাশ্রয় ছিলেন না। কিন্তু নব-নিযুক্ত অকর্মণ্য ও অশিক্ষিত মোসলমান কর্মচারিগণের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁহাদের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে অচিরে হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এখানেই উৎপীড়নের অবসান হইয়াছিল না। আওরঙ্গজেব হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিবার নিত্য নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করি-

(১) "The Hindu writers have been entirely excluded from holding public offices"—*Mir-at-i-Alam*.

তেন । (১) তিনি মোসলমানদিগকে শুক হইতে অব্যাহতি দিলেন । এইরূপে হিন্দু মোসলমানের মধ্যে বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হইল । ইহাতে মোসলমানগণ হুঁষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু পাদশাহের রাজস্ব অনেক কমিয়া গেল । বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কৰ্ম্মচারীদিগের পরামর্শে পাদশাহ নিয়ম করিলেন,—হিন্দুদিগকে শতকরা পাঁচ টাকা ও মোসলমানদিগকে শতকরা আড়াই টাকা শুক দিতে হইবে ।

আওরঙ্গজেব ঘণ্য জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তিত করিয়া হিন্দু প্রজাদিগকে অত্যন্ত উত্থিত করিলেন । ধর্মবিদ্বেষের ফলেই জিজিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল । মোসলমান শাসনের অধীনে যত প্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইত, তন্মধ্যে হিন্দুগণ জিজিয়াকেই সর্বাপেক্ষা তীব্র ও অসহ্য মনে করিতেন । জিজিয়া প্রবর্তিত হইবার পর একদিন আওরঙ্গজেব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উপাসনার্থ মসজিদে গমন করিতেছিলেন । এমন সময় পঞ্চাশ সহস্র হিন্দু অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরকণ্ঠে জিজিয়া কর রহিত করিবার জন্য পাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিল ; পাদশাহ তাহাদের কাতর প্রার্থনার কর্ণপাতও করিলেন না । তাহার সঙ্গী হস্তী ও অশ্ব কর্তৃক বিমর্দিত হইয়া বহুসংখ্যক হিন্দু প্রাণত্যাগ করিল । তাহার হিন্দুবিদ্বেষ জিজিয়ার পুনঃপ্রবর্তনেই পর্যাবসিত হয় নাই । তিনি অসংখ্য দেবালয় মসজিদে পরিণত করিলেন ; দেবদেবীর মূর্তি চূর্ণ করিয়া মসজিদের সোপানাবলী প্রস্তুত করিলেন । হিন্দুর পুণ্য ক্ষেত্র বারাণসীর দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণেশ্বরের মন্দির ভুলুষ্ঠিত হইল, এবং তাহার

(১) আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ কিরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা আর একটি আদেশের উল্লেখ করিতেছি । সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা পাকি খাঁ লিখিয়াছেন যে, পাদশাহের আদেশে হিন্দুদিগের ভুলিতে অথবা আরব অথবা আরোহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল ।

স্থলে মোসলমানের মসজিদ বিরাজ করিতে লাগিল । (১) মোসলমান মোলবীগণ হিন্দুদিগকে এসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া হিন্দুরক্তে পৃথিবী অনুরঞ্জিত করিতে লাগিল ।

কেহ কেহ রাজানুগ্রহলাভের প্রলোভনে এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ; কিন্তু হিন্দু জনসাধারণ স্বধর্মবিসর্জনে স্বীকৃত হয় নাই । তাহারা এসলাম ধর্মের বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার জন্য ধর্মপ্রচারকদিগকে নিহত করিতে লাগিল । ধর্মার্থ জীবন বিসর্জন করিয়া ইহকালে প্রতিষ্ঠা ও পরকালে স্বর্গলাভ করিবার কামনা জনসাধারণের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল । এমন কি, এক বৃদ্ধা রমণীর নেতৃত্বে বহুসংখ্যক হিন্দু সশস্ত্র হইয়া আগ্রা হইতে দিল্লীর অভিমুখে অস্তি-যান করিয়াছিল । ইহাদিগকে দলন করিবার জন্য শয়ঃ আওরঙ্গজেব রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । হায় ! হিন্দুর সে দিন কোথায় গেল ! সে শৌর্য্য-বীর্য্যের উজ্জলরবি কোন্ অন্ধ-তমসময়-সাগর-নীরে অন্তর্মিত

(১) আওরঙ্গজেব কেন দেবদেবীর মূর্তি চূর্ণ ও দেবালয় ভগ্ন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, একজন ঐতিহাসিক তাহার কৌতুকাবহ কারণ উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, এই সময়ে হিন্দুগণ মোসলমানদিগকে হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । আওরঙ্গজেব ইহাতেই উত্তেজিত হইয়া এই আদেশ প্রদান করেন । আওরঙ্গজেবের আদেশে দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দিরসমূহের কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একজন মোসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“All the worshipping places of the infidels and the great temples of these infamous people have been thrown down and destroyed in a manner which excites astonishment at the successful completion of so difficult a task. His Majesty personally teaches the Sacred Kalima to many infidels with success and invests them with Khelats and other favours.” *Mr-at-i-Alum*

হইল ! হিন্দু সাধারণকে এসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অত্যাচারের বিরাম ছিল না । এই অত্যাচারে পিষ্ট হইয়া কৃষক শ্রেণী শস্যক্ষেত্র হইতে বিদায়গ্রহণ করিল ; শিল্পিগণ স্ব স্ব ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল । এ কারণে প্রাদেশিক রাজস্বের হ্রাস হইল ।

আর এক কারণেও অত্যাচারের যাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল । আওরঙ্গজেব অত্যন্ত কপট ও সন্ধিগ্ধচিত্ত ছিলেন,—কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না । এ কারণ তিনি একজন কর্মচারীকে কোন বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারিতেন না । সন্ধিগ্ধচিত্ত গাদশাহ একজন রাজপুরুষকে কোনও কার্যের ভার দিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহকারী স্বরূপ আর একজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিতেন । ইহাতে রাজপুরুষগণের দায়িত্ব দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িত, কেহই কর্তব্যপালনে তাদৃশ মনোযোগী হইতেন না । একজন্ম আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বিবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল । (১) রাজপুরুষগণ দীর্ঘকাল এক

(১) গাদশাহ সন্ধিগ্ধতা নিবন্ধন রাজপুরুষগণের সঙ্গে কিরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করিতেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা মির জুন্না বিবরণ উল্লেখ করিতেছি । শাহজাহানের রাজত্বকালে আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথের শাসনকর্তা ছিলেন । তৎকালে মির জুন্না নামক একজন কোটীপতি ও প্রতিপত্তিশালী সেনাপতি তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করেন । মির জুন্না ক্রমশঃ আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ বাহিন্যরূপ হইয়া উঠেন । আওরঙ্গজেবের কুটবুদ্ধির সহিত যদি মির জুন্নার ধনবল ও বাহুবল সম্মিলিত না হইত, তাহা হইলে তিনি দিল্লীর রাজসিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না । আওরঙ্গজেব সিংহাসনে অধিরোধ করিয়া মির জুন্না কে বাহিন্যের স্ববাসীর পক্ষে নিযুক্ত করেন । মির জুন্না বঙ্গদেশে রোগাক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইল । আওরঙ্গজেব তাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী বীর পুরুষের মৃত্যুতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হন নাই, বরং একজন ক্ষমতাশালী উচ্চাভিলাষী বীর পুরুষের তিরোস্তাৰ দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন । আওরঙ্গজেব রাজপুরুষগণের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করেন, এই ঘটনা হইতেই তাহা অনুমিত হইতে পারে । সন্ধিগ্ধচিত্ত গাদশাহ অধিকাংশ রাজপুরুষের সঙ্গেই প্রীতিপূত্রে সংবন্ধ হইতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কোন কোন ব্যবহারে রাজপুরুষগণের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় । ইহার প্রমাণ স্বরূপ

স্থানে অবস্থান করিলে তাঁহারা অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিবেন আশঙ্কা করিয়া পাদশাহ তাঁহাদিগকে অধিক দিন এক প্রদেশে থাকিতে দিতেন না । এ কারণ রাজপুরুষগণ যেখানে গমন করিতেন, সেখানে তাঁহারা প্রবাসীর স্থায় বাস করিতেন ; আপনাদের শাসনাধীন প্রদেশের প্রকৃত হিতকামনার বশবর্তী হইয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না । শাসনাধীন প্রদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে কোনও প্রকারে অর্থসঞ্চয় করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইত । সুতরাং অত্যাচারের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল । দূরবর্তী প্রদেশসমূহের শাসকবর্গের বখেচ্ছার দমনের কোনও উপায় ছিল না । প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে স্বয়ং আওরঙ্গজেব তাহার বিচার করিতেন । কিন্তু পাদশাহের দরবারে উপস্থিত হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না । প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও যাহাতে আপনাদের অত্যাচার-কাহিনী পাদশাহের কর্ণগোচর না হয়, সে বিষয়ে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন । সুতরাং অত্যাচারের একশেষ হইতে লাগিল । আকবর শাহের সুশাসনগুণে জনসাধারণ মোগল-শাসনের অনুরক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু আওরঙ্গজেব পাদশাহের শাসনচক্রে পিষ্ট হইয়া তাহারা আর মোগল-শাসনের পক্ষপাতী রহিল না ।

আওরঙ্গজেবের লিখিত একখানি পত্র হইতে কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—“আমি হৃদয়ভাবে প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক মৃত কর্মচারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করি, ইহা আপনার ইচ্ছা । কোন ওমরাহ বা খনাচা বণিকের শেষ নিবাস পতিত হইবা মাত্র, কোন কোন স্থলে বা জীবন-দীপ নিকাশিত হইবার পূর্বেই তদীয় কোবাগার মোহর বন্ধ করিয়া সমস্ত সম্পত্তির, এমন কি সামান্য জহরতের বিবরণ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত গৃহস্থিত চাকর বা কর্মচারীকে অবরুদ্ধ রাখিতে অথবা প্রহার করিতে আমরা অভ্যস্ত । এ প্রথা বেশ সুবিধাজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহা যে অন্তর ও নিষ্ঠুর, তাহা কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে ?” কিন্তু আওরঙ্গজেব কার্যকালে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ।

পক্ষান্তরে পাদশাহের সংকীর্ণ নীতির কলে অন্ধতাধীবাণী যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহার ইন্ধনসংগ্রহ করিতেই রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল। আওরঙ্গজেবের বীরত্ব, রণকৌশল, শ্রমণীলতা, কার্যদক্ষতা, সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও যুবার জ্ঞান পরিশ্রম করিতেন ; স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্য পরিচালন করিতেন ; রাজ্যশাসনসম্পর্কীয় প্রত্যেক কার্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেন ; এমন কি, তাঁহার অসুস্থতি ব্যতীত কাবুলের জায় দূরবর্তী স্থানেও একজন সামান্য কর্মচারী নিযুক্ত করিবার কাহারও অধিকার ছিল না। কিন্তু তাঁহার আদৌ দূরদর্শিতা ছিল না ; তিনি যে সংকীর্ণ নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন, অচিরেই তাহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তথাপি তিনি স্ব-প্রবর্তিত কু-নীতি পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার অব্যবহিক মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল বিচলিত হইয়া উঠিল। আওরঙ্গজেব প্রতিভাশালী বিচক্ষণ শাসনকর্তা বলিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র খ্যাত ছিলেন ; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহার নামে কম্পিত হইত। কেবল এই কারণেই তাঁহার শাসনকালে মোগল-সাম্রাজ্য ভুলুঠিত হয় নাই। কিন্তু পাদশাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতাপ, প্রভাব ও প্রতিভা অস্তমিত হয়, এবং একজন দুর্বলচিত্ত অকর্মণ্য সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন শিখিলমূল মহৌরুহের জ্ঞান বলহীন মোগল-সাম্রাজ্য সামান্য ঝুঞ্জানু চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, দক্ষিণা-পথের পার্বত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রতিলক (১) শিবাজী ধীরে ধীরে শক্তি-

(১) দক্ষিণা-পথের যে অংশ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত, তাহার উত্তরে হুন্ডা ও সাতপুরা পর্বত, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ, পূর্বে বরদা নদী। এই

সম্রাট ও স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আওরঙ্গজেব প্রথমে তাঁহাকে ‘পার্বত্য মুখিক’ বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু যখন শিবাজী ক্রমশঃ প্রবল হইয়া মোঘল-সাম্রাজ্যের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিলেন, তখন আওরঙ্গজেব তাঁহাকে অঙ্গুরেই বিনাশ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধ সূচিত হইল।

শিবাজী শায়েস্তা খাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিবার জন্য আয়োজন করিলেন। তিনি একদিন গভীর রজনীতে কেবল মাত্র ২৫ জন ভীষণযোদ্ধা মাওয়ালী সৈন্যসহ বরঘাতীর দলে মিশিয়া অন্তের অলক্ষ্যে শায়েস্তা খাঁর বাসভবনের নিকট উপনীত হইলেন, এবং তারপর সে প্রাসাদের অভ্যন্তরে সুকোশলে প্রবেশ করিয়া শত্রুদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। এই আকস্মিক আক্রমণে স্তম্ভো-খিত মোসলমানগণ অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের মধ্যে বে বে দিকে সুবিধা দেখিল, সে সেই দিকেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। শত্রুর অজ্ঞাঘাতে শায়েস্তা খাঁর একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইল, তিনি আরঙ্গাবাদের অভিমুখে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। আওরঙ্গজেব এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া “মহাবল পরাক্রান্ত অম্বরাধি-পতি জয়সিংহকে দিলাওয়ার খাঁর সহিত শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব দেখিয়া শিবাজী বিনাযুদ্ধেই পরাজয়স্বীকার ও সন্ধিস্থাপন করিলেন। তদ্বারা তিনি তাঁহার বত্রিশটি দুর্গের মধ্যে কুড়িটি সম্রাটকে প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং অব-

শিষ্ট ভূমির পরিমাণ ১০,২০০০ বর্গমাইল। এই দেশের একাংশ বিজাপুরের অধীন, এবং অপরাংশ আমেদনগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু শাহজাহান শাদশাহ আমেদনগর রাজ্যের ধ্বংস করেন। শিবাজীর অত্যাচারকালে মহারাষ্ট্র ভূমির একাংশ বিজাপুর রাজ্যের অধীন, এবং অপরাংশ মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিষ্ট বারটি ছুর্গ সম্রাটের অধীনে ভোগ করিবেন, স্বীকার করিলেন। ইহার কিছু পরই জয়সিংহের পরামর্শে শিবাজী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লীযাত্রা করেন। সম্রাট এই সময় শিবাজীর প্রতি সদ্যবহার করিলে তাঁহাকে চিরবিষমৃত ভূত্যা করিতে পারিতেন, কিন্তু আপন ক্রুরতা ও ধূর্তবুদ্ধি নিবন্ধন শিবাজীকে প্রথমে অবমাননা, পরে বাক-জীবন বন্দী করিয়া দিল্লীতে রাখিবার চেষ্টা করিলেন। শিবাজী চক্রান্ত করিয়া, দিল্লী হইতে পলায়ন পূর্বক আওরঙ্গজেবের চিরশত্রু হইয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলেন।” (১) পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কখনও শিবাজী যুদ্ধে জয়লাভ করিতেন, কখনও বা বিজয়লী মোগলের অঙ্কশায়িনী হইতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব কখনও শিবাজীকে দমন করিতে পারেন নাই। এই ভাবে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। এই অন্ধে পাদশাহ মহাবত ঠাঁকে সৈন্যপত্যে বরণ করিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে চল্লিশ সহস্র মোগলসৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার পূর্বে শিবাজী কখনও সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হন নাই। এইবার তিনি প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আত্মবল পরীক্ষার সঙ্কল্প করি-

(১) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত :—শিবাজী দিল্লীতে নজরবন্দী হইয়া যে কোতুককর উপায়ে মুক্তিলাভ করেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। শিবাজী পাদশাহকে বলিয়া পাঠান, “আমার সব লোকজন দিল্লীর জল বায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া অস্থস্থ হইয়া পড়িতেছে। অতএব তাহাদিগকে স্বদেশে কিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করুন।” আওরঙ্গজেব শিবাজীর চাতুরীর মন্বৈষেদ করিতে না পারিয়া এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। শিবাজীর সব লোকজন স্বদেশে প্রতি-গমন করে। অতঃপর শিবাজী একদিন পাদশাহকে জানান যে, তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার আরোগ্যলাভের সংবাদ প্রচারিত হয়। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার পর বিবিধ শ্রেণীর সাধুগণকে বুদ্ধি ভরিয়া ভরিয়া মিষ্টার প্রভৃতি উপহারদ্রব্য প্রেরিত হইতে থাকে। গ্রহরীরা প্রথমে প্রথমে বুদ্ধিগুলি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু ক্রমে অসতর্ক হইয়া পড়ে। শিবাজী সুযোগ মত একদিন সন্ধ্যাকালে পুত্রসহ বুদ্ধিতে লুকায়িত হইয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন।”

লেন। মোগল সৈন্যের সহিত শিবাজীর ভূমূল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল; বহুসংখ্যক মোগল সেনা ও বাইশ জন সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিলেন।

এই সময়ে অকস্মাৎ আফগান রাজ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অগত্যা আওরঙ্গজেব শিবাজীর সহিত যুদ্ধে বিরত হইলেন। ইউসফজাই জাতি বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া মোগল সেনাপতিকে পরাজিত ও গিরিসঙ্কটবাসী মোগল সেনাদিগকে নিহত করিল। দুই বৎসর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিগণ আংশিক বশ্তাস্বীকার করিল। আওরঙ্গজেবও প্রফুল্লচিত্তে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আফগান ভূমিতে শান্তি সংস্থাপিত হইতে না হইতেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। সত্যনামী নামক একটি অস্ত্রধারী হিন্দুধর্ম সম্প্রদায় এই সময় নারনোলে বাস করিত। একজন শান্তিরক্ষকের উৎপীড়নে এই ধর্মসম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্ববর্তী অসন্তুষ্ট জমীদারগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন; সমগ্র আগ্রা ও আজমীর প্রদেশে অশান্তির সীমা রহিল না। কিন্তু পাদশাহ অনায়াসে এই বিদ্রোহের দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত করিলেন। (১)

কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল শান্তিতে যাপন করিতে পারিলেন না। আওরঙ্গজেবের প্রবল উৎপীড়নে প্রত্যেক প্রদেশে অসন্তোষের বীজ উৎপন্ন হইতে লাগিল।

(১) ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আওরঙ্গজেব প্রথম হইতেই হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিতেছিলেন, কিন্তু সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের পর হইতেই সে নিপীড়ন অতিশয় প্রবলাকার ধারণা করে। ইতিপূর্বেই তাহার হিন্দুবিদ্বেষানল প্রধূমিত হইতেছিল, সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহপবনে সেই অগ্নি স্ফুটিত হইয়া উঠে। এই সময় হিন্দু কুলরক্ষক মহাবল পরাজিত অরসিংহ ও যশোবন্ত সিংহ পরলোকগত হওয়ায় আওরঙ্গজেব নিশ্চিন্তচিত্তে মনেরসাধমিটাইয়া হিন্দুদিগকে নিপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হন।

হইয়াছিল। কিন্তু কোন প্রদেশের অধিবাসীই সহসা অগ্রসর হইয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে উত্থিত হয় নাই। কিন্তু সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ নিবারিত হইবার অব্যবহিত পরেই আওরঙ্গজেবের অবিমুখ্যকারিতা নিবন্ধন রাজপুতনার আগুন জলিয়া উঠিল।

আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণকালে অম্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহ ও যোধপুরাধিপতি রাজা যশোবন্ত সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুর নিপীড়ন জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের এই অসন্তোষের বিষয় পাদশাহের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাদৃশ ক্ষমতামালী সেনাপতিবৃন্দের অসন্তোষ অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহার কূট কোশলে জয়সিংহ পৃথিবী হইতে অপসারিত হন। (১) সুতরাং অতঃপর রাজা যশোবন্ত সিংহ ভিন্ন হিন্দুর আর কোনও রক্ষক রহিল না। যশোবন্ত সিংহ রাজকার্য্যের অনুরোধে কাবুলে গমন করেন। হিন্দুর দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় রাজার লোকান্তর ঘটিল।

রাজা যশোবন্ত সিংহ কাবুলে লোকান্তরিত হইলে, তদীয় বিধবা মহিষী ও পুত্রদ্বয় দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মতিচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব দিল্লীতে তাঁহাদের শিবির অবরুদ্ধ করিলেন। যশোবন্ত সিংহের প্রভুভক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ দুর্গাদাসের অনন্তসাধারণ বীরত্বে যশোবন্তের মহিষী ও রাজকুমারদ্বয় পাদশাহের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। (২)

(১) "Jay Singh died at Brampore • • and seems to have been poisoned by the procurement of Aurengzeb." Orme's Historical Fragments.

(২) এই বিষয়ে আওরঙ্গজেবকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য সুবিখ্যাত ইতিহাসলেখক ষাফি খাঁ লিখিয়া গিয়াছেন :—

'Without waiting for permission from Aurengzeb, and without

রাজপুতানা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল ; তন্মধ্যে সম্মানে ও বীরত্বে মিবার ও মাড়োয়ার তখন অগ্রগণ্য । মাড়োয়ারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহ স্বাধীনতার জ্বলাজ্বলি দিয়া মোসলমান পাদশাহের দাসত্ব-স্বীকার করিয়াছিলেন । কিন্তু মিবারাধিপতি কখনও মোসলমান

even obtaining a pass from the subadar of the province they set off towards the Capital. When they reached the ferry of Attock they were unable to produce any pass, so the commander of the boats refused to let them proceed. They then attacked him, killed and wounded some of his men, and by force made good their way over the river and went onwards towards Dehli. There was an oldstanding grievance in the Emperor's heart respecting Raja Jaswant's tribute, which was aggravated by these presumptuous proceedings of the Rajputs. He ordered the Kotwal to surround the camp of the Rajputs, and keep guards over them.” এই বর্ণনা সত্য বোধ হয় না । যশোবন্তের বিধবা মহিষী তেজস্বিনী বীরনারী ছিলেন । তিনি কিরূপ শৌর্যালিনিী ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । যশোবন্ত সিংহ একবার রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন । এই ঘটনায় যশোবন্ত-মহিষী এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীকে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিতে দেন নাই ! আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দি করিলে তিনি যে কৌশলে পরিত্রাণলাভ করেন, তাহাও তাঁহার প্রথম উদ্ভাবনীশক্তির পরিচায়ক । রাণীর কতিপয় অনুচর কার্যব্যাপদেশে স্বদেশে গমন করিতে পাদশাহের অনুমতিলাভ করে । তাহাদের যাত্রার প্রাকালে রাজপুত্রদ্বয়ের সমবয়স্ক দুইজন বালক রাজ-ভূষণে ভূষিত হইল, এবং একজন সঙ্গিনী রাজপুত্র-রমণী রাণীর বেশ পরিধান করিল । উওবেশ ধারণের পর ইহাদিগকে শিবিরে রাখিয়া রাণী প্রহরীগণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া রাজপুত্রদ্বয় ও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে রাজপুতানায় পলায়ন করিলেন । তাহাদের পলায়নবার্তা প্রচারিত হইলে পাঁচ সহস্র মোগল সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল ; কিন্তু কাবাধ্যক্ষ দুর্গাদাস অমিতপরাক্রমে মোগল সৈন্যদিগকে একটি গিরি-সঙ্কটে অবরুদ্ধ করিলেন ; ইত্যবকাশে যশোবন্তের মহিষী নিরাপদস্থানে উপস্থিত হইলেন । আওরঙ্গজেব পূর্ণমাত্রায় হিন্দুদিগকে নিগৃহীত করিলে এই বীর-রমণী পাদশাহের অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে অস্ত্রায় হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাকে করায়ত্ত করিবার জন্য এইরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ।

পাদশাহের আদেশে অবনতমস্তক হন নাই ; তাঁহাদের পদগৌরব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল । (১) মিবারের অধিপতির উপাধি রাণা রাজাধি-রাজ ছিল । আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজসিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । আওরঙ্গজেব তাঁহাকে জিজিয়া-কর প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করেন । মোগলের নামে রাজমুদ্রা প্রচলিত করিলে, রাজ্যমধ্যে গো-হত্যার অনুমতি প্রদান করিলে, হিন্দুর দেবালয় ভগ্ন করিয়া তাহার স্থলে মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করিলে, মোসলমান শাস্ত্রানুসারে বিচারকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিলে, রাজসিংহ ও তদীয় প্রজাবর্গ জিজিয়া হইতে অব্যাহতিলাভ করিবেন, পাদশাহের এইরূপ আদেশ ছিল । রাণা রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের এই অনুচিত প্রস্তাবে মৰ্ম্মাহত হইয়া নির্ভীকচিত্তে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে পাদশাহকে এইরূপ অপকর্মে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন । রাণা রাজসিংহ এই অনুরোধ করিয়াই নিরস্ত রহিলেন না ; আওরঙ্গজেব কখনও আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । এই সময় যশোবন্তের বিধবা মহিষী পাদশাহের হস্তে নিগৃহীত হইলেন । রাজসিংহ অগ্রসর হইয়া রাণী ও রাজপুত্রদ্বয়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ।

মিবারাধিপতি জিজিয়া দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, এবং যশোবন্তের বিধবা মহিষীকে আশ্রয়প্রদান করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আওরঙ্গজেব ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং সমগ্র রাজপুত-ভূমি

(১) "The Mogul had often endeavoured to subject them to amenable vassalage, but had never been able to obtain their acquiescence to more than ceremonious acknowledgment, and rated subsidies of troops."—*Orme's Historical Fragments.*

বিস্তৃত করিবার সঙ্কল্প করিলেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি কাবুল, দক্ষিণা-
পথ ও বঙ্গদেশ ইহাতে শাহজাদাদিগকে সসৈন্তে আহ্বান করিলেন ।
তাহাদের আসিয়া পঁছছিবার পূর্বেই তিনি মিবারের বিরুদ্ধে অভিযান
করিলেন । তাহার অভিযানবার্তা প্রচারিত হইলে রাজসিংহ হিন্দু
রাজপুত্রবর্গকে স্বদেশের ও স্বধর্মের গৌরবরক্ষার্থ আপনার পতাকামূলে
আহ্বান করিলেন ।

আওরঙ্গজেব রাজহান আক্রমণ করিলেন । পাদশাহ-সৈন্ত রাজ-
পুতানায় প্রবেশ করিবামাত্র যুদ্ধনীতিবিশারদ রাজসিংহ সমতল ভূমি
পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বত্যাগ প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন । মোগল
সৈন্ত অমানুষিক পরিশ্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল । কিন্তু তাহারা
রাজপুতানার পথবাট চিনিত না । পথভ্রান্ত হইয়া পাদশাহ অচিরাত
সসৈন্তে একটি পর্বতের রক্তপথে প্রবেশ করিলেন । রাজপুতগণ
শত্রুসৈন্তের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া রক্তপথের সমুখভাগে
প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের নির্গমের পথরুদ্ধ
করিয়া দিলেন । তাহাদের পথ পরিকৃত করিবার সমস্ত শ্রম ও যত্ন
রাজপুতবীরগণের কোশলে ব্যর্থ হইয়া গেল ।

উদিপুরী নামী আওরঙ্গজেবের খৃষ্টধর্মাবলম্বিনী প্রিয়তমা মহিষী
তাহার সঙ্গিনী ছিলেন । তিনি শত্রুহস্তে পতিত হইয়া রাজসিংহের
নিকট আনীতা হইলেন । রাণা তাহাকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ
করিলেন । আওরঙ্গজেব পর্বতরুদ্ধ সসৈন্তে দুই দিন অবরুদ্ধ থাকিয়া
কষ্টের একশেষ ভোগ করিলেন । মোগলসৈন্ত খাণ্ডাভাবে ক্লিষ্ট হইতে
লাগিল । রাজসিংহ দয়াপরবশ হইয়া পর্বতাশ্রয়ী রাজপুত সৈন্তকে
স্বহান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন । মোগলসৈন্ত নির্গমের
পথ পরিকৃত করিয়া পর্বতরুদ্ধ হইতে বহির্গত হইল । পাদশাহ

নিরাপদ হইবামাত্র রাণা তদীয় মহিষীকে রক্ষী সৈন্তসহ প্রত্যর্পণ করিলেন ।

পাদশাহ মানবের সুকোমল বৃত্তিসমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না । স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই লোকে প্রত্যেক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল । এ কারণ তিনি বিবেচনা করিলেন, তাঁহার ক্রোধানল হইতে পরিজ্ঞানলাভ করিবার ক্ষমতা রাজসিংহ এইরূপ সদাশয়তা ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন । সুতরাং আওরঙ্গজেব যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন না । কিন্তু রাজপুতের অতুল বীরত্বে ও কৌশলে তিনি পুনর্বার পার্শ্বত্যাগে অবরুদ্ধ হইলেন । ইহার অব্যবহিত পরেই তদীয় পুত্র আজীম ও আকবর সসৈন্তে উপনীত হইলেন । আওরঙ্গজেব পুত্রদ্বয়ের হস্তে মিবর-বিজয়ের ভার সমর্পণ করিয়া রাজপুতভূমি পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু মোগলসৈন্ত দীর্ঘকালেও রাজপুতদিগকে পরাজিত করিতে পারিল না । রাজসিংহের অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশহিতৈষণায় সমগ্র ভারত মুগ্ধ হইল । রাজসিংহের অবদান মৃতপ্রায় ভারত এখনও বিস্মৃত হয় নাই ;—কখনও হইবে কি ? যাহা হউক, তাঁহার বীরত্ব ও কৌশলে মোগলসৈন্ত পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইল । কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব বাধ্য হইয়া রাজসিংহের মনোমত সন্ধি করিলেন ।

ইহার পরেই রাজকুমার আকবর অকস্মাৎ রাজপুতগণের সহিত মিলিত ও বিদ্রোহী হইয়া সত্তর সহস্র সৈন্তের সহিত পিতার মস্তক হইতে রাজ-মুকুট কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা যাত্রা করিলেন । এই সময় পাদশাহ অল্পসংখ্যক সৈন্তসহ শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন । এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন । শাহজাহানের শোচনীয় পরিণাম তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল । হুরাকাজ পুত্র রাজ্যলাভলালসা

চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাকেও শাহজাহানের দশাগ্রস্ত করিতে পারে, এই চিন্তায় পাদশাহ আকুল হইলেন । কিন্তু তিনি হতবুদ্ধি না হইয়া পুত্রের বিষদস্ত ভগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । তিনি পুত্রকে লিখিলেন, “আমি তোমার কার্য্যকৌশলে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি ; তুমি রাজপুতদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধ্বংস করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছ, তাহা উৎকৃষ্ট ।” পাদশাহের চক্রান্তে এই পত্র রাজপুত অধিনায়কগণের হস্তে পতিত হইল । সুতরাং রাজপুতগণ সন্ধিগ্ধ হইয়া আকবরকে পরিত্যাগ করিলেন । আকবর নিকরপার হইয়া পাঁচ শত সৈন্যসহ মহারাষ্ট্রদিগের শরণাপন্ন হইলেন । তথা হইতে তিনি পারস্ত দেশে গমন করেন । পারস্তেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত হয় ।

উদয়পুরাধিপতি রাণার সহিত সন্ধিস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতেই রাজপুত-যুদ্ধের অবসান হইল না । তখনও পশ্চিমফলের রাজপুত বীরগণ অন্তর্যপরিত্যাগ করেন নাই । পাদশাহ অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে দমন করিলেন । দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব রাজপুতানার শাস্তিসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সে শাস্তি ভোগ করিতে পারিলেন না । এই সময়েই রাজপুতবীরগণ মোগল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন । রাজপুত সেনাপতিগণ এক শতাব্দী ব্যাপিয়া মোগলসাম্রাজ্যের প্রধান সহায় ছিলেন । আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে তাঁহারা মোগল সাম্রাজ্যের সকল প্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন ।

যে সময় আওরঙ্গজেব আফগানভূমির বিজ্ঞোহদমন ও রাজস্থানের অধিনির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় শিবাজী ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিশালী হিন্দুসাম্রাজ্যের সংগঠনসমাপ্ত করেন । জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া

শিবাজী ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে অমরলোকে যাত্রা করিলেন । শিবাজীর তিরো-
ভাবের পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন । এই
সময় মহারাষ্ট্ররাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল ; তাহার ফলে মহারাষ্ট্র-
শক্তি কিয়ৎকালের জন্য হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল । (১)

দক্ষিণাপথের গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের নরপতিগণ শাহজাহান
পাদশাহের সময়ে আংশিকভাবে দিল্লীর বশতাস্বীকার করিয়াছিলেন ।
কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না ; এই রাজ্যদ্বয় সম্পূর্ণরূপে
বিলুপ্ত করিবার অভিলাষে তিনি কয়েকবার সৈন্তপ্রেরণ করিয়াছিলেন ;
কিন্তু এক দিকে শিবাজী ও অন্য দিকে রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধে
ব্যাপৃত থাকায় তিনি এ বিষয়ে অবহিত হইবার অবকাশ পান নাই ।
একদা শিবাজীর স্বর্গারোহণে মহারাষ্ট্র হীনবল হইল, এবং রাজস্থানের
সমরানল নির্বাপিত হইল, সুতরাং নিশ্চিত হইয়া আওরঙ্গজেব সমগ্র
শক্তি দক্ষিণাপথের রাজ্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিলেন ।

(১) শিবাজীর দেহত্যাগের পর তাঁহার শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আওরঙ্গজেব যে
অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—“শিবাজী একজন
বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন । আমি যে সময় ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যসমূহ ধ্বংস
করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, সে সময় কেবল একমাত্র শিবাজীই একটি নূতন রাজ্য-
সংগঠনের চেষ্টায় সাহসী হইয়াছিলেন । আমি তাঁহার বিরুদ্ধে উনিশ বৎসর সৈন্ত
প্রেরণ করিয়াছি ; তথাপি তাঁহার রাজ্য সর্বদাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ।” ইতিহাস-
বেত্তা থাকি ঋা শিবাজীকে ‘নরকের কুকুর’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । সেই থাকি
যদি শিবাজীর কোনও প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে তাহার প্রত্যেক বর্ণ যে সত্য,
সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না । থাকি ঋা লিখিয়াছেন :—

“Sivaji had always striven to maintain the honour of the people
in his territories. He perserved in a course of rebellion in
plundering caravans and troubling mankind, but he entirely
abstained other disgraceful acts, and was careful to maintain the
honour of women and children of Mahammadans when they fell
into his hands.”

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন । এমন যুদ্ধারোজন পূর্বে আর কেহ দেখে নাই । ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হইল ; ইহাদিগের সাহায্যের জন্য অসংখ্য সুশিক্ষিত পদাতিক সজ্জিত হইল ; বহুসংখ্যক কামান প্রস্তুত ও তোপখানার তত্ত্বাবধানের জন্য ইউরোপীয়গণ নিযুক্ত হইল । পাদশাহ আরঙ্গাবাদে উপনীত হইয়া শিবিরসংস্থাপন করিলেন ।

প্রথমতঃ, মহারাষ্ট্র রাজ্য জয় করিবার জন্য আওরঙ্গজেব চম্পা সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন । কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সেনা কখনও সম্মুখযুদ্ধ করিত না । মোগল সৈন্য মহারাষ্ট্ররাজ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা পর্বতোপরি আশ্রয়গ্রহণ করিল ; চারিদিকের পথ ঘাট বন্ধ করিয়া দিল । মোগলশিবিরে খাড়াভাব উপস্থিত হইল । মোগল সেনাপতি কতিপয় অশ্বারোহীসেনা সহ পলায়ন করিয়া আওরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

আওরঙ্গজেব আরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করিয়া সোলাপুরে গমন করিলেন । তথায় শিবিরসংস্থাপন করিয়া স্বীয় পুত্র আজীমকে বিজাপুর রাজ্য বিজয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন । বিজাপুরের অধিপতি শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন । মোগলগণ বিজাপুর-সেনার কোশলে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইল । এই সুযোগে শত্ৰুজী মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত গুজরাটপ্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন । মোগল সেনাপতিগণ বিজাপুরাধিপতিকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন । আওরঙ্গজেব বিজাপুররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র সৈন্যসহ গোলকুণ্ডরাজ্য আক্রমণ করিলেন ; শত্ৰুজী যোগলের অধিকৃত প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেও কিছু বলিলেন না । এই সময় মদন পদ্ম নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান গোলকুণ্ডার মন্দিরপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।

তিনি মোগলের গতিরোধের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন । কিন্তু গোলকুণ্ডার সেনাপতি এব্রাহিম খাঁর সহিত মদন পন্থের মনোমালিন্য ছিল । ঈর্ষায় অন্ধ হইয়া সেনাপতি এব্রাহিম খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগলের সহিত মিলিত হইলেন । গোলকুণ্ডাধিপতি অনন্তোপায় হইয়া ক্ষতিপূরণরূপ দুই কোটি মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইয়া আওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিলেন ।

অতঃপর আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন । বিজাপুর রাজ্যের রাজধানী অবরুদ্ধ হইল । এইবার বিজাপুররাজ্যাবিলুপ্ত হইল ।

বিজাপুর রাজ্যের ধ্বংস করিয়া পাদশাহ পুনর্বার গোলকুণ্ডার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন । গোলকুণ্ডাধিপতির সহিত আওরঙ্গজেব সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন । তথাপি তিনি পুনর্বার গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না । গোলকুণ্ডার অধিপতি আবুহোসেন আওরঙ্গজেবকে শাস্ত করিবার জন্য অস্তঃপুরবাসিনী পুরাকনাদের অঙ্গভরণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রদান করিলেন । কিন্তু নিশ্চয়ম আওরঙ্গজেব তাহাতেও বিচলিত হইলেন না । আবুহোসেন মোসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বিধর্মী মহারাষ্ট্রাধিপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, (১) এই অপরাধে আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন । আবুহোসেন বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না ।

এতকাল পরে পাদশাহের বহুকালের সাধ মিটিল ; ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বহুকালের আশা সফল হইল । কিন্তু এই পররাজ্যহরণের চেষ্টাতেই মোগল-সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও সমগ্র বল প্রায় নিঃশেষিত

(১) পাদশাহের গতিরোধে জন্ত সাহায্য পাইবার আশায় আবুহোসেন মহারাষ্ট্রগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলেন ।

হইয়া গেল । গোলকুণ্ডা রাজ্য বিনষ্ট হইবার পরই মোগল-সাম্রাজ্য দুর্দশাগ্রস্ত হইল । বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের সুশাসনশৃংখলা দক্ষিণাপথ শান্তিপূর্ণ ছিল । এই দুই রাজ্যের বিলোপের সহিত সে সুশাসন-শক্তিও অস্তিত্ব হইল । পক্ষান্তরে আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথের শান্তি-রক্ষার জন্য কোনও নূতন শাসনপ্রণালীও প্রবর্তিত করিলেন না । সন্ধিচিহ্ন পাদশাহ কোন সেনাপতিকে উপযুক্ত সেনা সহ দক্ষিণাপথের শাসনভার অর্পণ করিতে পারিলেন না । বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অধিপতিগণ রাজ্যরক্ষা ও শাসনসৌকার্য্যের জন্য সর্বদা দুই লক্ষ সৈন্য রক্ষা করিতেন । কিন্তু এই রাজ্যদ্বয় বিধ্বস্ত হইলে মোগলঅধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কেবলমাত্র ৩৪০০০ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল । কক্ষুচ্যুত সৈন্যগণ অসংখ্য সেনানায়কগণের অধীনে দলবদ্ধ হইল ; অনেকে মহারাষ্ট্র নায়কগণের সহিত যোগদান করিল । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণ প্রাধান্যলাভ করেন । তাঁহারা সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন । আওরঙ্গজেব সর্বদা যুদ্ধব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং তজ্জন্য হির হইয়া অধিক দিন এক স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেন না । এই কারণে তিনি দক্ষিণাপথের শাসনব্যবস্থা করিতে পারে নাই । সমগ্র দক্ষিণাপথে অরাজকতা ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিলে অত্যাধিক হইবে না । বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইলে দক্ষিণাপথের শাসনযন্ত্র বিকল হইয়াছিল ; বড়যন্ত্রের বিরাম ছিল না ; সমগ্র দেশ বিদ্রোহবহ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছিল । পাদশাহ এই বহ্নি নির্বাপিত করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু উহার সংস্পর্শে তাঁহার সমস্ত কনতা দগ্ধ হইয়া গেল ।

দক্ষিণাপথের স্বাধীন মোসলমান রাজ্যদ্বয় বিলুপ্ত করিয়াই আওরঙ্গজেব নিবৃত্ত হইলেন না । এই রাজ্যদ্বয়ের অধিকারেই তাঁহার সমস্ত

শক্তি ও বল প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল ; বাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা মহারাষ্ট্রশক্তির বিজয়ে নিয়োজিত হইল । সম্রাট মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমনের জন্য একাদিক্রমে বিংশতি বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া বৃদ্ধবয়সেও কষ্টসহিষ্ণুতা ও রণকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।

মহারাষ্ট্র দেশ ছরতিক্রম নদী ও ছরারোহ পর্বতমালায় সমাবৃত । এই সকল প্রাকৃতিক অন্তরালের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্র দেশের জায়গার সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় দেশ সম্ভবতঃ পৃথিবীর কুত্রাপি নাই । (১) জৈদুর্গ ছল্লজ্যা দেশে অভিযানকালে আওরঙ্গজেব পুনঃ পুনঃ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন । ঘটনাক্রমে তাঁহাকে কখনও কখনও এমন স্থানে শিবিরসংস্থাপন করিতে হইত যে, তিনি সসৈন্তে খাদ্যাভাবে অনাহারে কালযাপন করিতে বাধ্য হইতেন । মহারাষ্ট্রদেশে গ্রীষ্মকাল অগ্নিসদৃশ ; এই সময় জলকষ্টে মোগলসৈন্ত অত্যন্ত কাতর হইত ; তদ্ব্যতীত একাধিকবার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল । একে মোগল সৈন্তের কষ্টের অবধি ছিল না, তদুপরি শত্রুর গুপ্ত আক্রমণে তাহাদের দুর্দশা শতগুণে বর্ধিত হইয়াছিল । এত বিপদেও আওরঙ্গজেব অটল ছিলেন । কিন্তু দীর্ঘকাল যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকায় মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও বল নিঃশেষিত হইয়া গেল । আওরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্য এইরূপ বিপর্যয় করিয়াও মহারাষ্ট্রশক্তির ধ্বংস করিতে পারিলেন না । “অনেক দুর্গ আওরঙ্গজেবের হস্তগত হইল, অনেক যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাস্ত হইল । কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ হইল না, মহারাষ্ট্রীয়গণ বিজিত হইল না । মহা-

(১) “In a military point of view there is probably no stronger country in the world.”—*Grant Duff*.

রাষ্ট্রদিগের অস্বাভাবিক প্রগামী, তাহাদিগের কোন একটি রাজধানীতে সমগ্র বল স্থাপিত ছিল না ; শিবাজীর মৃত্যুর পর কোনও একজনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত ছিল না ; সুতরাং এক স্থানে পরাস্ত হইলে তাহারা অন্য স্থানে জড় হইত, একটি দুর্গ হারাইলে অন্য একটিতে ঘাইত, এক জন বন্দী হইলে আর দশ জনে মুক্ত করিত ; সম্মুখ-যুদ্ধ না করিয়া চারিদিকে মোগলদিগের দেশলুণ্ঠন ও সর্বদা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশপ্রদান করিত । বিংশতি বৎসরব্যাপী বহুসংখ্যক যুদ্ধেও এরূপ জাতির ক্ষমতা চূর্ণ করিতে না পারিয়া, শান্ত, পীড়িত, বার্কক্যক্রিষ্ট আওরঙ্গজেব (১) দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ।

অবসন্নচিত্ত আওরঙ্গজেব দেখিলেন যে, ভাভুরক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত করিয়া যে জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য পিতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হৃদশাগ্রস্ত । রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া একাদিক্রমে দীর্ঘকাল দক্ষিণাপথে অবস্থান করাতে সাম্রাজ্যের উত্তরভাগে আওরঙ্গজেবের শাসনবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল । তিনি নিজে প্রত্যেক কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন, তথাপি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল । রাজপুতগণ সম্মিলিত হইয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধাচরণ ও মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল । আগ্রার অদূরে জাঠগণ শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল । শিখ জাতি ধীরে ধীরে অভ্যুত্থিত হইতেছিল । সে সময়ে শিখগণ মূলতানে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল । সমগ্র দক্ষিণাপথ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল । মহারাষ্ট্রীয়গণ দক্ষিণাপথের অধিকাংশ নগর লুণ্ঠিত করিয়াছিল, গ্রামসমূহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছিল, তাহাদের

(১) ঐনুল রশেদুল্লাহ দস্তুর ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত ।

পদমর্দনে শস্ত্রক্ষেত্র ভূগশূণ্য হইয়া গিয়াছিল। দুর্বল ও উচ্ছৃঙ্খল মোগলসৈন্য চতুর্দিক হইতে পাদশাহকে প্রাণ্য-বেতনের জন্য উত্থাপ্ত করিতেছিল। রাজকোষ শূণ্য, অর্থাগমের পথ রুদ্ধ ; স্মৃতরাং সৈন্য-প্রণের প্রাণ্য বেতন পরিশোধের কোনও উপায় ছিল না। (১)

আওরঙ্গজেব দেখিলেন, এক দিকে বিশাল মোগল-সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে, অপর দিকে মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মৃত্যুবিভীষিকার ভয়ঙ্কর আওরঙ্গজেব ব্যাকুল হইলেন ; তিনি প্রিয়তম পুত্র কামবন্ধকে লিখিলেন, “প্রাণাধিক, আমি চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি, আমার সঙ্গে কেহ যাইবে না। তুমি নিরুপায় হইবে ভাবিয়া আমি শোকাবুল হইতেছি। কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইবে ? আমি যত যত্নগা দিয়াছি, যত পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, যত অসংকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার প্রত্যেকটির ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে। আমি পৃথিবীতে কিছু লইয়া আসি নাই, কিন্তু দুর্বল পাপের ভার মাথায় লইয়া যাইতেছি। আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই কেবলমাত্র ঈশ্বরকে বর্তমান দেখিতেছি। আমি মহা পাপিষ্ঠ, জানি না, পরলোকে আমি কত যত্নগাভোগ করিব। মোসল-

(১) সৈন্যগণ কতদূর অশিষ্ট হইয়াছিল, এবং অর্থসংগ্রহের জন্য পাদশাহ কিরূপ ব্যতিব্যস্ত ও নিয়গামী হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা নিম্নে লেনপুল সাহেবের পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

“The army was for a long time very regularly paid. —Zemilli Carreri, in 1695, says the troops were paid punctually every two months, and would not bear any irregularity. He (Aurang Zeb) says on one occasion to Zulfikar Khan, that he is stunned with clamour of these infernal foot soldiers who are croaking like crows in an invaded rookery. In another letter he reminds him of the wants of the exchequer and presses him for hidden treasures and to hunt out any that may have fallen into the hands of individual.”

মানসিককে বধ করিও না, এবং আমার মস্তকে সে কলঙ্কের ভার পতিত হইতে দিও না । আমি তোমাকে ও তোমার পুত্রগণকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলাম । যাত্রাকালে তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি । আমি এখনও বড় বেদনা পাইতেছি । তোমার পীড়িতা মাতা উদিপুরী বেগম (১) সানন্দে আমার সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন । শান্তি !” আওরঙ্গজেবকে দীর্ঘকাল এই মানসিক অশান্তি ভোগকরিতে হয় নাই । ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথের আমেদনগরে মোগল পাদশাহ প্রাণপরিত্যাগ করিলেন ।

আওরঙ্গজেব জগৎপ্রথিত সম্রাট । তিনি বুদ্ধিমান, কার্যপটু ও পরিশ্রমী ছিলেন । (২) জেমেলী কারেরী নামক একজন পরিব্রাজক যে সময় আওরঙ্গজেবের দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ । এই বিদেশীর বর্ণনায় জানা যায়, এই বৃদ্ধবয়সেও সম্রাট শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া, ওমরাহগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজকার্যের আলোচনা করিতেন । তিনি উপাধানে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বিনাচশমায় আবেদন-পত্র পাঠ করিতেন, এবং নিজ হস্তে উহাতে মন্তব্য লিখিয়া দিতেন । তৎকালে তাঁহার আনন্দ-ব্যঞ্জক সহাস্যমুখ দেখিলে বোধ হইত, যেন তিনি অক্লান্তভাবে রাজ-কার্যের পরিদর্শন করিতেছেন । নব্বই বৎসর বয়সে আওরঙ্গজেব কাল-প্রাণে পতিত হন । ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ বলেন, তখনও তাঁহার

(১) পাদশাহ জীবনে একমাত্র উদিপুরীকে ভাল বাসিয়াছিলেন । উদিপুরী জর্জিয়া নিবাসিনী ষ্ট্রটান বালিকা । দারাহেকো তাঁহাকে দাসব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছিলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব উদিপুরীকে গ্রহণ করেন ।

(২) আওরঙ্গজেব রাজকার্যনির্বাহের জন্য অবিশ্রান্তভাবে গুরুতর পরিশ্রম করিতেন । তাদৃশ গুরুতর পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে আশঙ্কা করিয়া, একবার একজন

পঞ্চেন্দ্রিয় সতেজ ছিল, কেবলমাত্র শ্রবণশক্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু অন্তে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত না ।

মোগল পাদশাহগণ সকলেই অস্বাভাবিক বিলাসপটু, মদিরাসক্ত ও বাছাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন । আকবর শাহের দুই পুত্র অতিরিক্ত মত্তপানের কলে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন । জাহাঙ্গীরও অসিদ্ধ মত্তপ ছিলেন । জাহাঙ্গীর পাদশাহের পুত্র শাহজাহান অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ ছিলেন ; তিনি বৃদ্ধবয়সে কারারুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁহার ভোগবিলাসের নিবৃত্তি হয় নাই । সুন্দরী রমণীর নৃত্যলীলায় ও সিরাজী মদিরার অত্যাগ্র সৌরভে কারাগারেও বৃদ্ধ শাহজাহান উদ্ভাস্ত হইয়া উঠিতেন । রাজসংসারের দৃষ্টান্তে মোগল আমীর ওমরাহগণও ভোগবিলাসী হইয়াছিলেন । যে সকল মোগল বীর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতবিজয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও পরাক্রমশালী ছিলেন । কিন্তু আওরঙ্গজেব যে সময় পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা মোগলদরবারের শোভাবর্ধন করিতেন, তাঁহারা ব্যসনাসক্ত পারিষদে পরিণত হইয়াছিলেন । বাবরের অভিযানকালে সম্মুখে কোনও নদী পড়িলে তিনি সম্ভরণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইতেন ।

বিশিষ্ট ওমরাহ তাঁহাকে পরিশ্রমের পরিমাণ লঘু করিবার জন্য উপদেশচ্ছলে অনুরোধ করিয়াছিলেন । তদুত্তরে আওরঙ্গজেব বলেন, “কোন বিপদ উপস্থিত হইলে প্রজার রক্ষার জন্য রাজার প্রাণ পর্যন্ত পণ করা কর্তব্য । আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি সাদী যথার্থই নির্দেশ করিয়াছেন, ‘রাজত্ব পরিত্যাগ কর, অথবা নির্দারণ কর যে, তোমরা ব্যতীত আর কেহ রাজ্যশাসন করিবে না ।’ যদি তুমি আমার প্রীতিভাজন হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাকে আপন কর্তব্যকর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে । স্বভাবতঃই আমরা আরামপ্রিয় ; আমাদের একগুণ মত্তপাদাতার আবশ্যক নাই । আমাদের মহিষিগণও আমাদেরকে বিজ্ঞান ও বিলাসের কুসুমাবৃত পথে ভ্রমণ করিবার বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে ।”

কিন্তু শাহজাহানের পারিষদগণ মহাই মখমলনির্মিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, এবং শিবিকাযোগে রণক্ষেত্রে গমন করিতেন । (১)

রাজসংসারের বিলাসে বঞ্চিত হইয়াও আওরঙ্গজেব ভোগলালসা সংযত করিয়াছিলেন । তিনি কখনও মদিরা স্পর্শ করেন নাই । তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মোগল-দরবারে বিলাস-শ্রোতের প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হন । এ জন্য তিনি ওমরাহবর্গের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন । যদিও তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হন নাই, তথাপি তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় বিলাসতরঙ্গ কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছিল । (২)

আওরঙ্গজেব বাহ্যিক আচার ব্যবহারে কখনও এসলাম ধর্মশাস্ত্রের

(১) তৈমুরলঙ্গের স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিপিবদ্ধ আছে যে, তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়প্রকাশ করিলে তদীয় সভাসদগণের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন,—“By the favour of Almighty God we may conquer India, but if we establish ourselves permanently therein, our race will degenerate, and our children will become like the nation of those regions and in a few generations their strength and valour will diminish.”

তৈমুরের সভাসদবর্গের এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছিল ।

(২) আওরঙ্গজেব ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া সুকুমার বিদ্যার চর্চা রহিত করিবার অশুভ প্রচাৰিত করিয়াছিলেন । ইহাতে গায়ক, অভিনেতা ও নর্তকী-সম্প্রদায় যে প্রণালীতে আপনাদের অতিকূল মতপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা কোতূকাবহ । মোগল পাদশাহগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে রাজপ্রাসাদের গবাক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে দর্শন দিতেন । একদা আওরঙ্গজেব তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি লোক সাড়ম্বরে সাধারণ সমাধিক্ষেত্রের অভিমুখে গমন করিতেছে । কাহার সমাধির জন্য এত সমারোহ, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য পাদশাহ দূতপ্রেরণ করিলেন । প্রেরিত দূত করিয়া আসিয়া নিবেদন করিল যে, সংগীতের মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাহাকে সমাহিত করিবার জন্য সংগীতের ভৃত্যগণ সমারোহে সমাধিক্ষেত্রে গমন করিতেছে । পাদশাহ প্রত্যুত্তরে বলেন, “ইহা সর্বতোভাবে কর্তব্য । কিন্তু তাহাকে গভীর মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে বলিরা দাও, যেন সমাধি হইতে কোনও শব্দ কখনও আমার কণে না পড়ছে ।”

অনুশাসন উন্নত করেন নাই । এসলাম ধর্মের গোড়ার যাহা কিছু করণীয়, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার প্রতিপালন করিতেন । এসলাম-শাস্ত্রানুযায়িত প্রণালীতে তিনি প্রতি বৎসর কিঞ্চিদূর সার্কি এক লক্ষ মুদ্রা দরিদ্রদিগকে দান করিতেন । শুক্রবার, অশুভ পবিত্র তিথি ও রমজানে পাদশাহ উপবাস করিতেন । রমজানে প্রত্যহ রাত্ৰিকালে কোরাণপাঠে ও সাধুপুরুষগণের সংসর্গে অর্ধরাত্রি যাপন করিবার নিয়ম ছিল । তিনি মক্কাযাত্রীগণের সুবিধার জন্য নানাবিধ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন । তিনি কখনও নিষিদ্ধ-মাংস ভক্ষণ করেন নাই । তিনি গীতবাদ্যের বিরোধী ছিলেন ; কোনও গীতবাদ্য-ব্যবসায়ী আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিতেন । পাদশাহ নির্দিষ্ট সময়ে নমাজ পড়িতেন, কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম হইত না । এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তিনি পক্ষপালের ভ্রাম্য শত্রুসৈন্যে পরিবেষ্টিত, তখনও উপাসনার সময় উপস্থিত হইবামাত্র নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া প্রশান্তচিত্তে নমাজ পড়িতেন । মোহাম্মদের অনুশাসন অনুসারে কোনও বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিবার অভি-প্রায়ে আওরঙ্গজেব স্বহস্তে টুপি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন । কথিত আছে, তিনি ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কেবলমাত্র ৪০০ টাকা ব্যয় করিয়া নিজের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন ।

আওরঙ্গজেব বিদ্রোহোন্মুখ সেনাপতি ও পুত্রগণের দমনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন । তিনি নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে শাস্ত করিতেন । আমরা উদাহরণস্বরূপ খাফি খাঁর বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । শাহজাদা আজিম স্বাধীনতাভিলাষী হইয়াছেন শুনিয়া, আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দরবারে আহ্বান করিলেন । শাহজাদা আজিম ভীতিবিহীন হইয়া রাজ্যদেশপালনে বিলম্ব করেন ।

আওরঙ্গজেব যুগরা-ব্যপদেশে কেবলমাত্র কতিপয় অনুচরসহ বহির্গত হইয়া বিদ্রোহোন্মুখ পুত্রকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তদনুসারে আজিম নির্দিষ্ট মিলনস্থানের অভিমুখে যাত্রা করেন। আওরঙ্গজেব পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া চতুর্দিক রণনিপুণ যোদ্ধা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখেন। আজিম মিলনস্থানের নিকটবর্তী হইলে, সম্রাটের কোশলে তাঁহার অনুচরসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। সম্রাটের শিবিরসম্মুখে উপনীত হইবার প্রাকালে তিন জন মাত্র অনুচর অবশিষ্ট ছিল। আজিম অধ হইতে অবতীর্ণ হইলে কেহ অশ্বরক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল না, সুতরাং তিনি দুই জন অনুচরকে তথায় নিযুক্ত রাখিয়া, এক জন মাত্র অনুচর সহ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আওরঙ্গজেবের দর্শনলাভের পূর্বেই আজিম ও তাঁহার একমাত্র অনুচর অস্থপরিভ্যাগে বাধ্য হইলেন। আজিম ভীতিবিহ্বলচিত্তে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলে পাদশাহ তাঁহাকে সম্মুখে আলিঙ্গন করিলেন। আওরঙ্গজেব শিকারে বহির্গত হইবার জন্য বন্দুক হস্তে প্রস্তুত ছিলেন; তিনি পুত্রের হস্তে বন্দুক দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় বংশপরম্পরাগত একখানি অদ্ভুত তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া পুত্রের হস্তে দিয়া গ্রীষ্মাধিক্যের ভান করিয়া গাত্ররক্ত উন্মোচন করিয়া পুত্রকে নিরস্ত্র-দেহ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পর পাদশাহ পুত্রকে মহার্ঘ উপঢৌকনরাশি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। এই ঘটনার পর হইতে আজিম পাদশাহের পত্র পাইলেই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া কম্পিতহস্তে পাঠ করিতেন, এবং যতক্ষণ পত্রপাঠ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ তিনি স্থির হইতে পারিতেন না।

আওরঙ্গজেব নানাবিধ রাজকুণে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে দিশান সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই দ্বারকালে

বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল। ইহার একমাত্র কারণ, তিনি অত্যন্ত আত্মপরায়ণ, স্বার্থীক, পরধর্মপীড়ক ও কপট শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু খাফি খাঁ আওরঙ্গজেবের সমস্ত বিফলতার অন্য কারণের নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠকগণকে উপহার দিয়া উপসংহার করিতেছি ;—“তৈমুরবংশীয় নরপতিকুলে, এমন কি, দিল্লীর সমস্ত সুলতানের মধ্যে একমাত্র সেকেন্দর লোদী ব্যতীত আর কেহই সৈব্রনিষ্ঠা, বিলাসবিমুখতা ও ন্যায়পরতার জন্য আওরঙ্গজেবের দ্বারা প্রশংসিত ছিলেন না। সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিজ্ঞতার কোন নরপতিই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন-প্রতিপালনে প্রবল অসু-রাগ নিবন্ধন তিনি শান্তি প্রদানে বিরত থাকিতেন। শান্তি না দিয়া রাজ্যশাসন করা যায় না। জৈর্য্যবশে আমীর ওমরাহগণের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহার কার্যকরনার কোনও ফলোদয় হয় নাই। তাঁহার অসুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্যের সম্পাদনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইত, এবং অসুষ্ঠিত কার্যের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া বাইত।”



মোগলের অধঃপতন ।

অবতরণিকা ।

এসিয়াখণ্ডে বিপুলবৈভবশালী বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে । এই সকল সাম্রাজ্য প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়তলে প্রতিষ্ঠিত ছিল না । ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভা ও বাহুবলই এসিয়াখণ্ডের লোক-বিশ্রুত সাম্রাজ্য সমূহের মূলধার ছিল । তাহার অভাব হইলেই রাজশক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িত । ভারতবর্ষেও এই নিয়মবশে ভূতলে অতুল মোগল-সাম্রাজ্য উত্থিত হইয়া বিলীন হইয়াছে । বাবরের অসাধারণ প্রতিভা ও অজয় বাহুবলই, ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করে । হিন্দুজাতি তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সিংহাসন তাহার হৃদয়তলে সংস্থাপিত হইতে পারে নাই । প্রজাহিতকর শাসন-প্রণালী প্রবর্তন জন্ত অবসর প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই বাবর অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হন । বাবরের উত্তরাধিকারী হুমায়ূনের তাদৃশ প্রতিভা ও বাহুবল ছিল না । এজন্য বাবরের অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নবপ্রতিষ্ঠিত মোগল-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে । হুমায়ুন শক্তিশালী শত্রুর প্রথম আক্রমণেই হিন্দুস্থান হইতে বিতাড়িত হন । তার পর সমদর্শী আকবর অপূর্ব প্রতিভাবলে বহু সাধনায় হিন্দু মোসলমান, তুর্কি, পাঠান, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি নানাজাতি,—নানা সম্প্রদায়কে একত্রে আবদ্ধ করিয়া পুনর্বার মোগল সাম্রাজ্যের সংগঠন করেন । সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ব্যাপি সাধনার পর আকবর সুগঠিত, সুশাসিত, সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তাঁহার অপ্রতিহত প্রবল

প্রতাপ ছিল। কিন্তু রাজকুমার সেলিম (জাহাঙ্গীর) তাদৃশ অতুল প্রতাপাবিত পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আকবরের পরলোক গমনের পর রাজকুমার সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সাম্রাজ্যাধিপতি হন। সেনাপতি মহাবত খাঁ ও রাজকুমার খরম (শাহজাহান) বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজকুমার খরম শাহজাহান নাম ধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার পূর্বক বিপুল বিক্রমে রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই তদীয় পুত্রগণ রাজ্য লালসায় পরস্পরের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃবন্ধ-রঞ্জিত-হস্তে পিতার মস্তক হইতে রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়া ছিলেন। পুত্রগণ পিতার অনুসরণ করিতে পারেন, এই ভয়ে আওরঙ্গজেব সর্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। ফলতঃ, মোগল-শাসন-কালে রাজকুমারগণের বিদ্রোহাচরণ সহজ সাধ্য ছিল; ইহা মোগল-শাসনের মূলগত দুর্বলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মোগল-সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে ব্যাপকতার অভাব ছিল, পাদশাহ নিজে রাজ্য শাসন জন্ত যে মন্ত্রগ্রহণ করিতেন, রাজপুরুষগণ তদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেন না। তাঁহারা সময় সময় স্বার্থপরতার একশেষ প্রদর্শন করিতেন। মোগল রাজকুমারগণের পক্ষে বিদ্রোহ অবলম্বন করা একরূপ নিয়মে পরিণত হইয়াছিল বলিলে অত্যাক্তি হইবে না। এজন্ত উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধতা থাকিত না। ইহার ফলে রাজকার্যে অনেক সময় শৃঙ্খলার অভাব ঘটিত, এবং রাজপুরুষগণ রাজাদেশ প্রতিপালনে অমনোযোগী হইতেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অধীন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ মোগল রাজ্যের অনুগত ছিলেন না; কেবল মাত্র বাহুবলের

অভাবে মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে পারিতেন না। অধিকাংশ সেনাপতিই জায়গীর ভোগী ছিলেন। দিল্লীর আদেশ প্রতিহত করিতে পারিলেই তাঁহাদের স্বার্থ নিক হইত।

এই সকল দৌর্য্যল্যের অত্যন্তরে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস বীজ নিহিত ছিল। আওরঙ্গজেবের অবিস্মৃয়াকারিতা নিবন্ধন এই ধ্বংসবীজ উগ্ৰ হয়। তাঁহার হৃদয় বেগশালী ছিল না; তিনি সন্ধিগ্ন স্বভাবের তত্ত্ব রাজপুরুষগণের অগ্রির এবং ধর্মবিদ্বেষ ও পরপীড়নের জন্য হিন্দু জাতির ঘৃণ্য ছিলেন। কস্মক্লিষ্ট পাদশাহ বৃদ্ধ বয়সে কোন বিষয়েই শাস্তি পাইতেন না। তাঁহার সঙ্গে কাহারও সহানুভূতি ছিল না। তিনি নিজেও, কি আত্মীয় স্বজন, কি রাজপুরুষ,—কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না; এবং তাঁহাদের মধ্যেও কেহ তাঁহার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। আওরঙ্গজেবের দুর্লভ নিবন্ধন সুদীর্ঘ কালব্যাপি যুদ্ধা-নল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। ইহার ইন্ধন সংগ্রহ করিতে অসংখ্য সৈন্য ধ্বংস এবং রাজকোষ শূন্য হয়। তাঁহার ধর্মবিদ্বেষ ও তনুলক অত্যাচার বশতঃ হিন্দুজাতির স্বাধীনতা-লাভ বাসনা এবং ধর্মবিদ্বেষ একসঙ্গে জাগরিত হইয়াছিল; ইহাতে তাহার নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। এই সকল কারণে, মোগল-রাজ-শক্তি ক্রমশঃ অবনত হইতে আরম্ভ করে। আওরঙ্গজেবের মনোবল, তেজস্বিতা, শাসনপটুতা যথেষ্ট ছিল। এতদুত্ত তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই নির্দেশ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, তাঁহার ইহ-লোক হইতে অপমৃত হইবার পূর্বে, মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের দিন যে ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহা চক্ষুমান ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রতিভাত হয় নাই। (১)

(১) After that (death of Aurangzeb) the Prince (Bedar Bakt,

আওরঙ্গজেবের ব্রাহ্মকালে ভারতের অক্ষরভূষণ মহাপুরুষ শিবাজি মহারাষ্ট্র জাতির হৃদয়ে অভিনব জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণগত সাধনার ফলে কৃষিজীবী মহারাষ্ট্রগণ অপূর্ব বলদৃশ্য সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এই বলদৃশ্য সৈন্তের সহায়তায় মোগল-সাম্রাজ্যের পার্শ্বেই এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে সমগ্র দক্ষিণাপথে মোগলের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। তত্ৰত্য শাসন কার্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মহারাষ্ট্র শক্তি ধ্বংস করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে পাদ-শাহ জীবনের শেষভাগ দক্ষিণাপথে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এক কাশ্মীর ব্যতীত আর কোন হিমালয় প্রদেশে মোগলের আধিপত্য বাকমূল ছিল না। একারণ মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাধিগণের পক্ষে পার্শ্বত্যাগ প্রদেশ সমূহে লোক-চক্ষুর অস্ত্রবলে বল সঞ্চার করিবার সুবিধা ছিল। পঞ্জাব প্রদেশে মহাপ্রাণ গোবিন্দসিংহের প্রতিভাবে শিখগণ জাতিভেদ ভুলিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বাবে আলিঙ্গন করিয়া যুদ্ধ-কৌশলে পটু হইয়া ধর্ম-দীপ্ত সামরিক জীবন লাভ করে, এবং মোগল-রাজ-শক্তির বিনাশসাধনপূর্বক তাহার অস্তগত গৌরব-রবির পশ্চাতে এক অভিনব রাজ্যের গঠন করিয়া শান্তি ও প্রেমের পূর্ণচন্দ্র সমুদিত করিতে বদ্ধ পরিকর হয়।

আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ দুর্বল হৃদয় শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহারা রাজপুরুষদিগকে শক্তিসহকারে পরিচালনা করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে শাসন কার্য নিরীহ জন্ত আত্মপরায়ণ ও কলহপ্রিয়

grand Son of Aurangzeb) said to Murid Khan, you all know that realm of Hindustan will now fall into anarchy. People did not know the value of the Emperor Khaf Khan.

মহিসমাজের উপর নির্ভর করিতে হইত । প্রজাবিদ্রোহ পতাকা হস্তে নওরমান, মস্ত্রী আত্ম-হিত-চিন্তায় মগ্ন, ইহাই শেষ দশায় মোগল-শাসনের অঙ্গ হইয়াছিল ।

এই সকল কারণে, আওরঙ্গজেবের পরবর্তী দিল্লীর ইতিহাস কেবল মাত্র অধঃপতনের বিবরণে পরিপূর্ণ ; কিন্তু সে বিবরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আশ্চর্য্য নানারসে আপ্ত । এক্ষণে আমরা সে কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

বাহাদুর শাহ ।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের এক বিংশ দিবসে বৃদ্ধ আওরঙ্গজেব কালগ্রাসে পতিত হন । তিনি মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারী মিয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট নির্দেশ করেন নাই । তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল । দ্ব্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন । দ্বিতীয় মোয়াজ্জিম পাদশাহের মৃত্যুকালে কাবুলের শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তৃতীয় পুত্র আজিম শাহজাদা মোয়াজ্জিমের সহোদর ভ্রাতা, এবং পাদশাহের মৃত্যুকালে দক্ষিণাপথে রাজশিবিরে উপস্থিত ছিলেন । চতুর্থ পুত্র আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া, রাজপুতগণের সঙ্গ সন্মিলিত হন, এবং তার পর স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিয়া, পলায়ন পূর্ব্বক মক্কায় গমন করেন । ইহার পর, তিনি আর কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই । পঞ্চম পুত্র কামবক্স পাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার মৃত্যুকালে বিজাপুরের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ।

পাদশাহ ইহলোক হইতে অপমৃত হইলে শাহজাদা আজিম অবিলাসে আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন, এবং সসৈন্তে আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হন । এদিকে শাহজাদা মোয়াজ্জিমও

পিতার পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া অলস রহিলেন না । তিনি কাবুল পরিত্যাগ করিয়া, সৈন্তে লাহোরে আগমন করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া, স্বীয় বিখ্যাত প্রতিনিধি সুনিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হইলেন । অতঃপর তিনি স্বীয় পুত্রকে আগ্রার দুর্গ অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্ত ও গোলন্দাজ লইয়া দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন । দিল্লীর অধিবাসীরা তাঁহাকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিল । তিনি রাজকোষের প্রচুর ধন রত্ন প্রাপ্ত হইলেন । প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার সদ্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, দলে দলে তাঁহার পতাকামূলে সমাগত হইতে লাগিল । অত্ৰদিকে আজিমের ধনলিপ্সা এবং তাঁহার পুত্র ও সেনাপতির প্রতিদ্বন্দিতা নিবন্ধন জনসাধারণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিল । মোয়াজ্জিম দিল্লীনগরী পরিত্যাগ করিয়া মথুরার আগমন করিলেন । তিনি তথায় পছছিয়া আজিমকে অর্দ্ধ সাম্রাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন । শান্তিপ্রিয় ও মৃদুস্বভাব মোয়াজিমের প্রস্তাবে তাহার ভ্রাতার অহঙ্কার বর্ধিত হইল । তিনি অবজ্ঞাতরে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ভ্রাতৃত্বকে পৃথিবী রঞ্জিত করিবার জন্য ক্ষিপ্ৰ-গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ঢোলপুর ও আগ্রার মধ্যপথে উভয় সৈন্তের ভূমূল সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল । আজিম রণক্ষেত্রে শত্রুহন্তে জীবন বিসর্জন করিলেন, বিজয়-লক্ষ্মী মোয়াজিমের অঙ্কশারিনী হইলেন । হত্যাকারী সেনা-নায়ক পুরস্কার লোভে আজিমের ছিন্নশির মোয়াজিমের নিকট আনয়ন করিলেন । তিনি ভ্রাতার ছিন্ন শির দর্শনে অধীরচিত্তে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং ভ্রাতৃহত্যাকে তিরস্কার করিয়া মৃতদেহ রাজকীয় সমারোহে সমাধিস্থ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন ।

অতঃপর শাহজাদা মোয়াজিম বাহাদুর শাহ উপাধিধারণ করিয়া

শিহসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রথমেই আপন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মুনিম খাঁকে “খান খানান” উপাধি ও প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। নূতন সম্রাট এই শঙ্কটকালেও সদাশয়, দয়াদ্রুচিত্ত, অমায়িক ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শত্রুপক্ষীয় বিশিষ্ট কর্মচারীদিগকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করেন। তিনি আজিমের পুরমহিলাগণের সঙ্গেও সদ্ব্যবহারের একশেষ করেন। বেগম খুদিসা জেব উল্লিসাকে পাদশাহবেগম উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দেন।

রাজনীতি বিশারদ মুনিম খাঁ অবিলম্বে রাজ্যের শাসন-প্রণালী সংস্কার করিতে মনোনিবেশ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ পাদশাহ পিতামহ শাহজাহানের স্তার সাড়ঘরে দরবারের কার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজ সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে তাঁহার সপ্তদশ জন পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্র আসন পরিগ্রহ করিতেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূরে বিজিত রাজ-কুমারগণ দণ্ডায়মান থাকিতেন। সভামণ্ডপ সর্বদা বিচিত্র সজ্জার ভূষিত ও আমীর ওমরাহগণে পরিশোভিত হইয়া সমুজ্জল থাকিত। পাদশাহ তাঁহাদিগকে সময় সময়, নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিয়া আপনার বৈভব ও দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেন। একজন ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন, “কেমন করিয়া আমি সেই ‘দিল্লী দরবারের সমুজ্জল দৃশ্যের বর্ণনা করিব ?”

পাদশাহ বহু রাজগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যদি সমগ্র হিন্দুজাতি আওরঙ্গজেবের অবিম্ভ্যকারিতায় মোগল-শাসনে বীতশ্রদ্ধ না হইত, তবে বাহাদুর শাহ অমায়িকতাগুণে হিন্দু বীরগণের সহায়তা লাভ করিতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের কৃতকার্য্যে হিন্দুজাতির মোসলমান-বিদ্বেষ যোলকলায় পূর্ণ হইয়াছিল। যদিচ তাঁহার শাসনকালে এই

বিদ্রোহ প্রকট হইতে পারে নাই, তথাপি ইহা প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে ধুমায়মান হইতেছিল, সুতরাং তাঁহার যত্ন পরই অবিলম্বে উহা প্রজ্জ্বল আকার ধারণ করিল। আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই রাজপুত-ও জাঠ জাতি মোগলের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করিয়াছিল। এমন পঞ্চনদ ভূমির নব প্রতিষ্ঠিত শিখ-শক্তি দিল্লীর ক্ষমতাস্পর্শী হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই সকল প্রকাশ্য শত্রু হইতে পাদশাহের প্রথম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল না। গৃহ-শত্রুই তাঁহাকে প্রথমে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সিংহাসনারোহণ কালে আওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র অস্থির-মতি কাম বক্স বিজাপুরের শাসন-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি ভ্রাতার সৌভাগ্য সন্দর্শনে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তিনি কখন কখন তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্তে যাত্রা করিয়া পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিতেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে পাদশাহের পক্ষাবলম্বী বলিয়া সন্দেহ করিতেন, তাহাদিগকে অনর্থক শাস্তি দিয়া ও ভ্রাতাকে দাস্তিক-কঁতাসূচক পত্র লিখিয়া অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন। এই ভাবে বৎসরাধিক গত হইলে, পাদশাহ তাঁহাকে শাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া (১৭০৮ খৃঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্তে যাত্রা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণা-পথে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বিনা রক্তপাতে বন্দী করিয়া আনিতে মুনিম খাঁকে আদেশ দিলেন। কামবক্স তাঁহাদের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থ রাজসৈন্তের সন্মুখীন হইলেন। এই সময়ে, আও-রঙ্গজেবের প্রাচীন সেনাপতি জুলফিকর খাঁ দক্ষিণপথে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কামবক্সের মনোমালিঙ্গ ছিল। তিনি সসৈন্তে রাজকুমারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মুনিম খাঁ তাঁহাকে বারণ করিয়া রাজাদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়, পাদশাহ আহাদাশ্চ দিবা-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। একত্ৰ রাজাদেশ পাইতে বিলম্ব হইল। জুলফিকর খাঁ রাজাভুমতি গ্রহণ না করিয়াই, কামবক্সকে সসৈন্তে আক্রমণ করিলেন। অগত্যা মুনিম খাঁও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। রাজকুমার রণক্ষেত্রে শৌর্য-বীর্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু অস্হাঘাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। তিনি অত্যধিক রক্তমোক্ষণে অচিরে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; জুলফিকর খাঁ তাঁহাকে তদবস্থায় বন্দী করিয়া রাজ-শিবিরে লইয়া গেলেন। একজন সুবিজ্ঞ ইউরোপিয়ান চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অভিমানী কামবক্স কাহারও শুশ্রূষা অথবা কোন প্রকার পথ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যাকালে পাদশাহ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, নিজের কোর্ত্তা দ্বারা তাঁহার দেহ আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। ইহার পর স্নেহশীল পাদশাহ বলিলেন, “আমার ভাতাকে যে এ অবস্থায় দেখিব, তাহা কখনও ভাবি নাই।” তদন্তরে কামবক্স অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, “তৈমুরবংশীয় রাজকুমার যে কাপুরুষতা ও ভীকৃতার অপবাদ মস্তকে লইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইবে, আমিও তাহা ভাবি নাই।” অতঃপর পাদশাহ স্বহস্তে তাহাকে মাংসের কিঞ্চিৎ তরল সার পান করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বাষ্পাকুল-লোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই রাত্রিতেই অভিমানী রাজকুমার কালগ্রাসে পতিত হন।

অতঃপর পাদশাহ জুলফিকরকে দক্ষিণাপথের সুবাদারের পদ প্রদান করিয়া, রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। জুলফিকর মহা-রাষ্ট্রদিগকে মোগলের অধুকূল করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে কামবক্সের সঙ্গে যুদ্ধকালে রাজপক্ষাবলম্বী মিনহাজ সিন্ধিয়াকে

বহু রাজসম্মানে ভূষিত করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্র-সেনাপতিদের মধ্যে কোন কারণে মতবৈধ উপস্থিত হইল, ফুলফিকর খাঁ এক পক্ষ এবং মুনিম খাঁ অপর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পাদশাহ চফুলচ্ছা বশতঃ কাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। এই দ্বন্দ্ব উপলক্ষে সামন্তবর্গ সমস্ত দক্ষিণাপথ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিকে রাজপুতগণের মোগল বিদ্বেষ ক্রমশঃ নানাতাবে প্রকাশিত হইয়া শাসনকার্যো বিবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে লাগিল; নব-প্রতিষ্ঠিত শিখজাতির অল্প সঞ্চালনে মোগলশক্তির ভিত্তিভূমি পঞ্চদ-প্রদেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

বাহাদুর শাহ রাজপুত ও শিখ উভয়শক্তির সঙ্গে এককালে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এজন্য যে কোনরূপে রাজপুত জাতির সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া সর্বাগ্রে শিখকে পর্যুদস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অম্বর ও ঘোষণপুরের অধিপতিদিগকে দরবারে আনয়ন করিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা মোগল দরবারে উপনীত হইলে পাদশাহ তাঁহাদের সমস্ত অসন্তোষের কারণ নিবারণ করিয়া রাজপুত জাতির সঙ্গে সখা সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু অধিপতি যুগল স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে উদয়পুরে গমন করিয়া রাণার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। মহাশ্वा টড নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, এই ত্রিসন্মিলনের ফলে বাবরের সিংহাসন ভুলুপ্তি হইয়াছিল, তাহার পর মহারাষ্ট্রীগণ মোগলের গৃহকলহোপলক্ষে পক্ষভুক্ত হইয়া বিবাদের মূলীভূত সাম্রাজ্যের অধিকাংশ গ্রাস করিতে সমর্থ হন।

যাহা হউক, রাজপুতগণের সঙ্গে শান্তি সংস্থাপন করিয়া বাহাদুর শাহ উদয়মান শিখ জাতিকে পর্যুদস্ত করিবার জন্য আপনাতঃ সমস্ত

শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন। প্রধান মন্ত্রী মুনিম খাঁ শিখ-দিগকে মন্থন করিতে বিপুলবাহিনীসহ গমন করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর শিখ সৈন্য সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল ; ও তাহাদের অধিনেতা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। মুনিম খাঁ বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া মগৌরবে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই মুনিম খাঁ (১) পরলোক গমন করিলেন। তাহার মৃত্যুর পর মজ্জি-নিয়োগ সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইল। শাহজাদা আজিম ওস্তান পরলোকগত উজীরের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথের সুবাদার জুলফিকর খাঁকে মন্ত্রী পদ প্রদান করিয়া উজীরের পুত্রবয়স্ক মধ্যে একজনকে সৈন্তের অধিনায়ক হু ও অপর জনকে দক্ষিণাপথের শাসন কর্তৃক দিবার প্রস্তাব করিলেন। জুলফিকর খাঁ প্রায় স্বাধীনভাবে দক্ষিণাপথের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, এজন্য তিনি শাসনকর্তৃপদ পরিত্যাগ করিয়া উজীরের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। আজিম ওস্তান অন্য কাহাকেও উজীর নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং সমস্ত কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বহুদর্শী ও কার্যপটু ছিলেন না। এজন্য রাজকার্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল। আমরা এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। মুনিম খাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পাদশাহ

(১) মুনিম খাঁ সুফিয়তাবলম্বী এবং দরিদ্র বন্ধু ছিলেন। তিনি সমস্ত জীবনে কখনও কাহাকেও কোন কারণে মনঃক্লম করেন নাই। তিনি আপনার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য প্রত্যেক সহরে একটি করিয়া মসজিদ ও মসাই নির্মাণ করিতে সঙ্কল্প করেন। এজন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণের কার্য দোষে ভূমি গ্রহণোপলক্ষে অনেক স্থানে নানা প্রকার অত্যাচার হইয়াছিল। সৎ-কার্যোপলক্ষেও যে মানুষ উৎপীড়িত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ থাকি খাঁ এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

খোতবায় আলীর নামের শেষে “ওয়ালী” শব্দ যোগ করিতে আদেশ করিলেন। “ওয়ালী” শব্দের অর্থ—উত্তরাধিকারী। পাদশাহ শিয়া সম্প্রদায়ের সন্তোষ বিধান জন্তই “ওয়ালী” শব্দ যোগ করিতে আদেশ করেন। ইহাতে ইহাই স্বীকৃত হয় যে, মহাত্মা আলী প্রেরিত মহাপুরুষ মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই রাজাদেশে সমগ্র সূন্নি সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, এবং নানা স্থানে উৎপাতের সূত্রপাত করে। আমেদাবাদের খোতবা পাঠক নৃশংসভাবে নিহত হয়। শাহজাদা আজিম ওস্তান গোপনে গোপনে বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে মিলিত ছিলেন। লাহোরেই সূন্নি-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ সর্বাপেক্ষা প্রবলীকার ধারণ করে। একজন্ত বাহাদুরশাহ হাজি ইমার মোহাম্মদ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান সূন্নিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে তাঁহারা উপস্থিত হইলে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হইল। হাজি ইমার মোহাম্মদ রাজ-সভার আদব কায়দা উল্লঙ্ঘন করিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এরূপ ভাবে কথা কহিতে ভীত হইতেছ না?” তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “আমি সৃষ্টি কর্তার নিকট চারিটি বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, (১) জ্ঞানার্জন, (২) ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন, (৩) তীর্থ পর্য্যটন, (৪) ধর্ম রক্ষার্থ জীবন বিসর্জন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁহার কৃপায় আমার তিনটি প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। গায়পরায়ণ রাজার অনুগ্রহেই শেষটিও পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। বহুবিচার বিতর্কেও কোন ফল হইল না। সূন্নি-সম্প্রদায় বলসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। আজিম ওস্তান প্রধান মন্ত্রীর কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করায়, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ঈর্ষানলে জ্বলিতেছিলেন। মহারাট্টা, রাজপুত, শিখ, সকলেই দিল্লীর রাজশক্তি ধ্বংস করিবার জন্ত উত্তত ছিলেন। বাহাদুর শাহ চারিদিকেই

এইরূপ নানাভাবে বিব্রত হইয়া সুন্নি-সম্প্রদায়কে শাস্ত করিবার জন্য দীর্ঘ আদেশ প্রত্যাহার করিলেন ।

সুন্নি-সম্প্রদায়ের গোলযোগ উপশান্ত হইতে না হইতেই পাদশাহ পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন, এবং রাজকুমারগণ চতুর্দিক হইতে হুগলুক শকুনি পালের দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিলেন । তাঁহারা সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন ; রাজপুরুষগণ স্ব স্ব পৃষ্ঠপোষকের পক্ষাশ্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন । সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । এইরূপ শব্দটকালে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মৃদুস্বভাব আড়ম্বরপ্রিয় বাহাদুর শাহ পরলোক গমন করিলেন । তাঁহার রাজত্বকালে রাজস্ব হ্রাসপ্রাপ্ত এবং অর্থাগমের অত্যন্ত পথ বহুল পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পাদশাহের দানশীলতার বিরাম ছিল না । এ কারণ রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে । পাদশাহ চকুলজ্জা বশতঃ কাহারও প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান অথবা কাহারও ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিতেন না বলিয়া রাজগৌরবও প্রতাহীন হয় । (১)

বাহাদুর শাহের পরলোক গমনের পর অরাজকতার রাজত্ব আরম্ভ হইল, চারি দিকে বিভীষিকার ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । অনেকে

(১) প্রাক্তি স্বা. তাঁহার চরিত্র বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন,—“For jenerosity, munificence, boundless good nature, extenuation of faults, and forgiveness of offences very few monarchs have been found equal to Bahadur Shah in the histories of the past times, and specially in the race of Timur. But though he had no vice in his character, such complacency and such negligence were exhibited in the protection of the state and in the government and the management of the country, that worthy sarcastic people found the date of his accession in the words Shah-i-he Khabr, "Heedless King."

ভয়ে সপরিবারে সহর পরিত্যাগ করিল। রাজপথে জনপ্রবাহাধিকা
নিবন্ধন গমনাগমন দুঃসাধ্য হইল। সৈন্তগণ বাকী বেতনের জন্য চীৎ-
কার করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া
পড়িল; কেহই কাহাকেও সহায়তা করিতে অগ্রসর হইল না। দুর্ভিক্ষ-
দের “প’বার” উপস্থিত হইল, তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে
লাগিল। এই সর্বব্যাপী অরাজকতার মধ্যে রাজকুমার

জাহান্দর শাহ

দক্ষিণাপথের প্রবল সুবাদার জুলফিকর খাঁর সহায়তায় পিতৃসিংহা-
সন অধিকার করিলেন। জুলফিকর খাঁর প্রবল প্রতাপে অচিরে সর্বত্র
শান্তি সংস্থাপিত হইল। নবাভিষিক্ত সম্রাটের ভ্রাতৃগণ ঘাতক হস্তে
জীবন বিসর্জন করিয়া তাঁহার সিংহাসন নিকটক করিয়া দিলেন। তিনি
রাজপদে আসীন হইয়া জুলফিকরকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রধান
অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণাপথের শাসন কার্যে স্বীয়
প্রতিনিধি দ্বারা নিরীহ করাইবার অনুমতি দিলেন। তদনুসারে তিনি
দায়ুদ খাঁকে দক্ষিণাপথে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রাজ-
ধানীতে অবস্থান পূর্বক স্বকার্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জুল-
ফিকরের পিতা আসদ খাঁ জীবিত ছিলেন; তিনি উকীল ই-মুংলক
(সম্রাটের প্রতিনিধি) উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া রাজপ্রসাদ লাভ করিলেন।

জাহান্দর শাহের সিংহাসনারোহণের অল্প পরেই সকলে বুঝিতে
পারিল যে, তাঁহার ভ্রাতৃবিলাসপটু, কণ্ঠবিমুখ ও আত্মপরায়ণ শাসনকর্তা
আর কখনও বাবরের রাজতত্ত্ব কলঙ্কিত করেন নাই। জাহান্দর শাহ
একজন নীচ প্রকৃতি কুলটার আয়ত্ত ছিলেন, এই রমণী তাঁহার উপ-
পত্নী,—তাঁহার নাম লাল কুমর। রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই তিনি
লালকুমর ও তাঁহার আত্মীয় অস্ত্ররক্তের হস্ত ক্রীড়নকে পরিণত হইয়া

পড়িলেন । তিনি প্রিয়তমা উপপত্নীর মনস্তৃষ্টি বিধান জন্য অর্থ ও স্বার্থে অসাধারণ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বার্ষিক দুই কোটি টাকা তাঁহার ব্যক্তি বরাদ্দ হইল । ভাষ্যভীত তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও মণিসুতার মূল্য স্বতন্ত্রভাবে রাজকোষ হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইল । পাদশাহ লাল কুয়রের ভ্রাতাকে এলাহাবাদের শাসন-কর্তৃত্বদে নিযুক্ত করিলেন । কিন্তু উজীর তাহার নিয়োগপত্র প্রদান করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন । এজন্য লাল কুয়র তাঁহার বিরুদ্ধে পাদশাহকে বলিয়া দিলেন । পাদশাহ তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি উত্তর করিলেন, “জাঁহাপনা, রাজপুরুষ-গণ উৎকোচ গ্রাহী, উৎকোচ না পাইলে তাঁহারা কোন কাজ করেন না ।” পাদশাহ ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন, “আমার উপপত্নীর নিকট আপনি কি উৎকোচ প্রত্যাশা করেন ?” জুলফিকর বলিলেন, “এক সহস্র সেতারি ও ওস্তাদ-ই-নকশি (Drawing master) আমার উৎকোচের পরিমাণ ।” পাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাদের দ্বারা আপনার কি প্রয়োজন ?” জুলফিকর খাঁ তহত্বরে বলিলেন, “আপনি আমাদের স্ত্রীর রাজপুরুষগণের প্রাপ্য পদ তাহাদিগকে প্রদান করিতে-ছেন ; অতএব আমাদের পক্ষে তাহাদের ব্যবসায় লিপ্সা করা আবশ্যিক হইয়াছে ।” পাদশাহ এই উত্তরে ঈষদ্ হাস্য করিয়া আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন । পাদশাহ নিজে বিলাসভোজে নিমগ্ন হইয়া রাজ-কার্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; এবং তদীয় মন্ত্রিগণও তাঁহার দুর্য্যব-হারে বিরক্ত হইয়া কর্তব্য সাধনে উদাসীন হইয়াছিলেন । জাহান্নর শাহের অল্প পরিসর রাজত্বকালে অত্যাচার ও ব্যতিচারের পূর্ণ প্রভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল । (১) জুলফিকর খাঁর দেওয়ান ও কর্মনাযক

(১) খাফি খাঁ তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “It was a fine time for

শত্ৰুচাঁদ এরূপ অকথা অশ্লীল বাক্য প্রয়োগে অভিযুক্ত ছিলেন, তাহার নিশ্চাস স্পর্শে নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে কলুষিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন ।

ঈদূশ রাজস্ব শীঘ্রই শেষ দশায় উপনীত হইল । জাহান্নর শাহের সিংহাসনারোহণ কালে আক্ৰিম ওস্তানের পুত্র করক শিয়র বঙ্গদেশে অবস্থান করিতেছিলেন । একারণ তাঁহাকে তৈমুর বংশীয় অস্তিত্ব রাজকুমারের জ্ঞান ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জন করিতে হয় নাই । জাহান্নর শাহের রাজত্বের তৃতীয় মাসে তিনি রাজ সিংহাসন অধিকার করে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন । এই সময় আক্ৰিম ওস্তানের প্রিয়পাত্র সৈয়দ কুলোদ্ভব হোসেন আলী খাঁ বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন ; এবং তদীয় ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ এলাহাবাদের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন । করক শিয়র বিহারে পৌঁছিয়া দীনভাবে হোসেন আলী খাঁর সহায়তা প্রার্থী হইলেন । তিনি স্বীয় প্রভু পুত্রের প্রার্থনা অগ্রাহ করিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন । ইহার পর আবদুল্লা খাঁ ও তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন । সমরানল জলিয়া উঠিল । এলাহাবাদের পার্শ্বদেশে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । সুল কিকর খাঁ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু অধিকাংশ আমীর ওমরাহই জাহান্নর শাহের দৃষ্টিভিত্তিক, কুসংসর্গ লিপ্সা ও দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁহার ধ্বংসকামী হইয়াছিলেন । একত্রে তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রসন্নচিত্তে অঙ্গধারণ করিলেন না । এ দিকে অশ্রান্ত বাণ

minstrels and singers, and all the tribes of dancers and actors There seemed to be likelihood that Kazis would turn tose pots, and Muftis become tipplers."

বর্ষণে লালকুয়র ও গাথকদের হস্তীগুলি অশান্ত হইয়া উঠিল। এই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে জাহান্নর শাহের হস্তীও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন তিনি ভয় ব্যাকুলচিত্তে লালকুয়রকে সঙ্গে লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে গোপনে পলায়ন করিলেন। ইহার পর রাজ-পক্ষাবলম্বী সেনানায়কগণ একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। এ কারণ জুলফিকর খাঁ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধভঙ্গ করিয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জাহান্নর শাহ শত্রুযুগ্ন করিয়া ছদ্মবেশে দিল্লীতে উপনীত হইলেন, কিন্তু অত্যধিক ভীকৃত। নিবন্ধন দুর্গে প্রবেশ না করিয়া আসদ খাঁর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জাহান্নর শাহের সৌভাগ্যস্বীয়া অন্তর্মিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী ভাবী সম্রাটের শুভদৃষ্টি লাভ করিবার কল্পনায় তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

ফরকশিয়র ।

রণক্ষেত্রে বিজয়শ্রী লাভ করিয়া (১) ফরকশিয়র রাজ-সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার আদেশে জাহান্নর শাহ, জুলফিকর খাঁ ও তদীয় পিতা আসদ খাঁ নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। আওরঙ্গজেবের আত্মপরায়ণতা ও পরধর্ম বিদ্বেষ নিবন্ধন অতুল মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা হয়, বাহাদুর শাহের দুর্বলতা এবং জাহান্নর শাহের ব্যতিচার সে অধঃপতনের পথ প্রসন্ন করে; তারপর ফরকশিয়রের সিংহাসনারোহণের মুহূর্ত্ত হইতে তৈমুর বংশের বিনাশের দিন দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

(১) এই বিজয়শ্রী লাভ করিতে ফরকশিয়রের পক্ষীয় বহুলোক হতাহত হইয়াছিল। এবং হোসেন আলী খাঁ আহত হইয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পতিত হন। যুদ্ধাবসানে সকলে তাঁহাকে মৃতদেহ রালির মধ্যে ধুঁজিতে আরণ্ড করে। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। ঈয়লাভের শুভ সংবাদ তাঁহার অবসন্ন দেহে সঞ্জীবনী শক্তি আনয়ন করে, তিনি অচিরে মৃত হন।

ফরক শিরর রাজপদে আসীন হইয়া হোসেন আলী খাঁকে মীর বক্সীর পদে এবং আবদুল্লা খাঁকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন । সৈয়দ যুগল তাঁহার রাজ্য লাভের মূল্যধার ছিলেন, এই হেতু তাঁহাকে নামে মাত্র সম্রাটরূপে সম্মান করিয়া আপনাই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে সক্ষম করিলেন ।

নূতন সম্রাট অপরিণত বয়স্ক, অনভিজ্ঞ, ভীকৃ স্বভাব ও দুর্বলচিত্ত ছিলেন । যিনি সর্বশেষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেন, দুর্বলচিত্ত পাদশাহ ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে অসমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহারই অনুবর্তী হইতেন । তাঁহার এই দুর্বল স্বভাব সৈয়দ যুগলের অথও প্রভুত্বের অন্তরায় স্বরূপ ছিল । তাঁহারা প্রথমতঃ পাদশাহের তাদৃশ স্বভাবের বিষয় অনুভব করিতে পারেন নাই । এ জন্য তাঁহারা মন্ত্রণাদাতা রাজপুরুষদিগকে দূরে রাখিতে যত্ন করেন নাই । মুলতান নিবাসী মীর জুমা বঙ্গদেশের কাজির পদে নিযুক্ত ছিলেন । ফরক শিররের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই এই ব্যক্তি তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন ।

নূতন রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে হোসেন আলী খাঁ বোধপুরাধিপতি অজিত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন । মহাত্মা টড লিখিয়াছেন যে, অজিত সিংহের হস্তে মোগল সৈন্য পরাজিত হয়, এবং সেনাপতি হোসেন আলী খাঁ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন । কিন্তু মোসলমান ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ অন্তরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । মীর জুমা প্রথম হইতেই সৈয়দ যুগলের ক্ষমতা ধ্বংসের অভিলাষী ছিলেন । সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই হোসেন আলী খাঁকে দরবার হইতে দূরে রাখিবার অভিপ্রায়ে মীর জুমার মন্ত্রণায় বোধপুরাধিপতির বিরুদ্ধে তাঁহার অধীনে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল । মোগল সৈন্তের

আগমনে অজিত সিংহ ভীতিবিহীন হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হন । পাদশাহ মীর জুন্নাহকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন ; তিনি প্রকাশ্যভাবেই বলিতেন যে, মীর জুন্নাহর বাক্য ও স্বাক্ষর তাঁহার নিজের বাক্য ও স্বাক্ষরের তুল্য । মীর জুন্নাহ একজন স্মারনিষ্ঠ রাজকর্মচারী ছিলেন ; তিনি পাদশাহের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিতেন । তাঁহার হস্তেই নিয়োগভার গুরু ছিল । এই বন্দোবস্ত উজীর আবদুল্লা খাঁর স্বার্থের বিরোধী ছিল বলিয়া তিনি উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন । কিন্তু অধিকাংশ আমীর ওমরাহ পাদশাহ ও তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর পক্ষাবলম্বন করেন । আবদুল্লা খাঁ দরবারের মতি গতি দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, হোসেন আলী খাঁ অচিরে রাজধানীতে প্রতিগমন না করিলে তাঁহাদের পতন অবশ্যস্তাবি । একারণে তিনি হোসেন আলী খাঁকে রাজধানীতে উপনীত হইবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন । অজিত সিংহের সন্ধিপ্রার্থী হইবার সমসময়ে পূর্বোক্ত পত্র তাঁহার হস্তগত হয় । এ জন্য তিনিও সন্ধি সংস্থাপনার্থ উদ্যোগ হন । ইহার পর উভয় পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, এবং অজিত সিংহ মীর কান্নাকে পাদশাহের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য মোগল সেনাপতির সঙ্গে রাজধানীতে প্রেরণ করেন ।

হোসেন আলী খাঁ রাজপুতনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কমতা লাভ প্রয়াসী উভয় দলমধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল, তাহাতে পাদশাহ একান্ত বিপর্যয় অবস্থায় পতিত হইলেন । তিনি এই বিবাদের মূলোচ্ছেদ উদ্দেশ্যে প্রথম দলের চালক হোসেন আলীকে ও দ্বিতীয় দলের চালক মীর জুন্নাহকে রাজদরবার হইতে দূরে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন । তদনুসারে হোসেন আলী খাঁ দক্ষিণপথের এবং মীর জুন্নাহ বিহার প্রদেশের শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন । হোসেন আলী খাঁ

দক্ষিণাপথে গমন করিবার সময় পাদশাহকে বলিলেন, “আমার অল্প-
স্থিতিতে মীর জুমা'কে দরবারে আহ্বান অথবা আমার ভ্রাতার সঙ্গে
কোন প্রকার অসহ্যবহার করিবেন না। ইহার অন্তথাচরণ হইলে
আমি তিন সপ্তাহ মধ্যে সসৈন্তে আসিয়া পহুছিব।”

জুলফিকর খাঁ পাদশাহের আদেশ নৃশংসভাবে নিহত হইলে তদীয়
প্রতিনিধি দাযুদ খাঁ দক্ষিণাপথের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন।
হোসেন আলী খাঁ তথায় গমন করিলে তিনি পাদশাহের ইচ্ছিতে তাঁহার
বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইলেন। তুমুল যুদ্ধের পর দাযুদ খাঁ নিহত হইলেন।
অন্তঃপর হোসেন আলী খাঁ শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সংবাদ রাজ-
ধানীতে পহুছিলে পাদশাহ বিষম্বচিত্তে বলেন, “এরূপ সুবিখ্যাত প্রশস্ত-
মনা বীরের মৃত্যু দুঃখজনক।” ইহাতে আবছল্যা খাঁ উত্তর করেন,
“আফগানের হস্তে আমার ভ্রাতার প্রাণনাশ হইলে জাহাপনা সুখী
হইতেন।” (১)

এই সময় শিখ জাতি পুনর্বার যত্নকোত্তলন করিয়া লাহোর হইতে
আহালা পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র প্রদেশ অধিকার করিল। পাদশাহ শিখ

(১) বাস্তবিকই দাযুদ খাঁ প্রশস্তমনা ছিলেন। একবার আহমেদাবাদে কতিপয়
মোসলমান একজন হিন্দু অধিবাসীর গৃহপার্শ্বে গো-হত্যা করার হিন্দুরা উত্তেজিত হইয়া
একজন মোসলমান বালককে হত্যা করে। ইহার কালে উত্তর পক্ষ দাঙ্গাহারার
প্রবৃত্ত হয়। দাযুদ খাঁ এই ব্যাপারে হিন্দুর পক্ষাবলম্বন করেন। আমরা এ স্থানে
তাঁহার সম্বন্ধে একটি রোমাণ্টিক গল্পের অবতারণা করিতেছি। এই গল্পে তাঁহার
হৃদয়ের প্রণয়শীলতার আভাস পাওয়া যায়। একবার তিনি উপহার স্বরূপ এক সুন্দরী
হিন্দু বালিকা প্রাপ্ত হন। দাযুদ খাঁ তাঁহাকে এসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া পরিশর
স্বয়ে আবদ্ধ করেন। হোসেন আলী খাঁর সঙ্গে যখন তাঁহার বৃদ্ধ হয়, তখন এই
রবনী অন্তর্লুপ্তী ছিলেন। তিনি পতির বুদ্ধযাত্রা কালে তাঁহার কোমর হইতে সপর্কে
তরবারি গ্রহণ করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দেন। তারপর তিনি পতির মৃত্যু
সংবাদ শুনিয়া বহুতে গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া জীবিত অবস্থায় সমাধি বাহির করেন, এবং
পতির সঙ্গে বর্গাক্রম হন। থাকি খাঁ এই গল্পে আত্ম হ্রাস করেন নাই।

জাতিকে সমূলে বিনাশ করিতে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন । শিখ-গণ আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণ করিল, ও লোকাভীত পরাক্রমে মোগল সৈন্ত বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে সম্ভ্রাসিত করিয়া তুলিল । কিন্তু অচিরে তাহাদের শিবিরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়াতে তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল । ক্রুর প্রকৃতি মোগল সেনাপতি নৃশংসচরণের একশেষ প্রদর্শন করিয়া দুই সহস্র শিখ সৈন্তের শিরচ্ছেদন পূর্বক ছিন্ন মস্তকগুলি পাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন । শিখ গুরু (অধিনেতা) বন্ধুকে সহস্রাধিক অস্ত্রচর সহ হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করা হইল । বন্দী শিখবীরগণ একে একে ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জন করিয়া বিধাতার অভিসম্পাত মোগল সাম্রাজ্যের উপর আনয়ন করিল । বন্ধু আপমার শিশু পুত্রকে বহুস্তে বধ করিতে আদিষ্ট হইলেন ; তিনি অবিচলিত চিত্তে এই আদেশ প্রতিপালন করিলেন । এই ঘোর নৃশংস কাণ্ডের পর তিনিও শত্রুহস্তে নিহত হইলেন । (১)

এই ঘটনার পরবৎসর মীরজুল্লা পাটনার শাসনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া

(১) His son was placed upon his knees,—a knife was put into his hands, and he was required to take the life of his child. He did so silent and unmoved ; his own flesh was then torn with red hot pincers, and amid those torments he expired, his dark soul, say the Mahometans winging its way to the regions of the damned Cunningham's History of the Sikhs. শিখগণ স্বদেশ প্রেমের মোহন মন্ত্রে উন্মত্ত হইয়াছিলেন । একজন শিখ রমণী মুকৌশলে পাদশাহের নিকট স্বীয় পুত্রের জীবন তিক্তা করেন । পাদশাহ তাহার কৌশলপূর্ণ বাক্যে বিচলিত হইয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন । যে সময় শিখমাতা পাদশাহের আদেশলিপিসহ পুত্রের নিকট উপনীত হন, তখন ঘাতক তাহার হত্যার জন্য তরবারি উত্তোলন করিয়াছিল । বীর-পুত্র মুক্তি পত্র দেখিয়া সপর্কে উত্তর করেন, “মা যিখ্যাবাদিনী ; আমি গুরুর সেবার জন্য মনঃপ্রাণে সমর্পিত হইয়াছি । আমাকে অবিলম্বে তাহাদের সহযাত্রী কর ।”

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । রাজদরবার হইতে দূরে অবস্থান করায় তাঁহার পূর্ব প্রতিপত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল ; হোসেন আলী খাঁ দক্ষিণপথে গমন কালে যে ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও পাদশাহ বিস্মৃত হন নাই । একারণ, তিনি এবার সাদরে পরিগৃহীত হইলেন না ; পাদশাহ তাঁহাকে রাজদরবার হইতে দূরে রাখিবার জন্য লাহোরের শাসনকার্য্যে প্রেরণ করিলেন ।

সৈয়দ যুগলের প্রভুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, এবং পাদশাহ বিলাস স্রোতে মগ্ন হইয়া রমণীর বিলোল কটাক্ষ এবং চিত্তোন্মাদকর যুগমাই জীবনের সার করিয়াছিলেন । তিনি শাসনকার্য্যে কিঞ্চিৎশ্রদ্ধাও মনোনিবেশ করিতেন না ; এমন কি, প্রধান অমাত্যের পক্ষে তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করাও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল । এই সময় ঘণ্য জিজিয়া পুনর্জীবিত হয় ; হিন্দু রাজপুত্রদিগকে পদচ্যুত করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাদের হিসাব নিকাশ তলব দেওয়া হয় । দক্ষিণপথে মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল, এবং তাহাদের যুদ্ধ প্রণালী দিন দিন নিয়মবদ্ধ হইতেছিল । পাদশাহ সৈয়দ যুগলের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প ছিলেন । কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাঙনিষ্পত্তি করিতেও পারিতেন না । তিনি হোসেন আলীর বিনাশ সাধনার্থ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে গোপনে গোপনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । এই আত্মকলহের ফল কি হইয়াছিল ? ভারতবর্ষের সর্বত্রই হিন্দুগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং মোগলের রাজশক্তি গৌরব ভ্রষ্ট হয় । হোসেন আলী খাঁ দীর্ঘকাল ব্যাপি যুদ্ধ সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র শক্তি দমন করিতে অসমর্থ হইয়া মোগলের গৌরব নাশক সন্ধি স্থাপন করিতে মনন করিলেন । (১) কিন্তু পাদশাহ

(১) এই সন্ধি অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়গণ শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশ সমূহে স্বাধীন

সৈয়দ যুগলের শত্রুপক্ষের পরামর্শে তাদৃশ অকীর্তিকর প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না, এবং যোধপুরাধিপতি রাজা অজিত সিংহ এবং কতিপয় আমীর ওমরাহের সঙ্গে মিলিত হইয়া সৈয়দগণের উচ্ছেদ সাধন জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু পাদশাহের অস্থির মতিতে ও ভীকৃতায় এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল । আবদুল্লাহ গী আব্দুরক্ষা সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হোসেন আলী খাঁকে রাজধানীতে উপস্থিত হইবার জন্ত লিখিয়া পাঠাইলেন ।

তদনুসারে তিনি দশ সহস্র মহারাষ্ট্র সৈন্য লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন । ভ্রাতৃযুগল সহজেই অরক্ষিত রাজপুরী অধিকার করিলেন । তাঁহাদের কতিপয় অনুচর প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পাদশাহকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল । বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে ছাদের এক কোণে লুকাইত অবস্থায় পাওয়া গেল । ছর্কুত্তেরা তাঁহাকে নানাক্রমে অবজ্ঞাত করিয়া টানিয়া বাহির করিল । তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিণী পুরোজনাদের করুণ ক্রন্দনে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল । তাঁহারা অনুচরদের পদধারণ করিয়া ক্রমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । ছর্কুত্তেরা তাঁহাদের তাদৃশ করুণ ক্রন্দনেও অবিচলিত রহিল ; তাহারা করক শিরকে পুরমহিলাদের পার্শ্ব হইতে বাহিরে আনয়ন করিল, তারপর তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নশ করিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল । থাকি খাঁ এই কারাগারকে তাঁহার (living tomb) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এখানে করকশিরের কণ্ঠের সীমা রহিল না । তিনি মুক্তি লাভের কল্পনার প্রহরীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন । এই ঘটনা

অধিকার লাভ করেন, এবং সমগ্র দক্ষিণাপথে চৌধ ও সরদেহ মুখি আদায় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন ; ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য এবং বার্ষিক দশ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন ।

প্রকাশিত হইয়া পড়িলে সৈয়দ যুগল আহার্য বস্তুরে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহার ইহলোকের অবসান করিলেন । (২)

রফি-উদ-দরজাত এবং রফিদৌলা ।

সৈয়দ যুগল করকশিয়রকে বন্দী করিয়া বিংশতি বর্ষ বয়স্ক তরুণ যুবক রফি-উদ-দরজাতকে (ইনি রফিউদ্-দানের কনিষ্ঠ পুত্র, রফিউদ্-দান বাহাদুর শাহেবের পুত্র), ময়ূর তরু প্রদান করেন । রাজ্য-লাভকালে রফি কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন । সৈয়দ যুগলের হস্তে করকশিয়র নিগৃহীত ও বন্দী হইলে জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, এবং রাজ-সিংহাসন শূন্য দেখিয়া নানা প্রকার অরাজকতার সূত্রপাত করে । এজ্ঞ তাঁহারা তাড়াতাড়ি রফিকে কারামুক্ত করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন । তাড়াতাড়িতে তাঁহার কারাবস্ত্র পরিবর্তনেরও অবসর ঘটে নাই । রফির রাজত্বের তৃতীয় মাসে করকশিয়র শত্রুর বিষ প্রয়োগে ইহলোক হইতে অপমৃত হন । নাম সর্বস্ব নুতন সম্রাটের কোন ক্ষমতাই ছিল না ; মাত্র যুগল স্বাধীন ভাবে সমস্ত কার্য্য নিরূপিত করিতেন । রফি-উদ-দরজাত এই অবস্থা স্পৃহ-ণীয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন না ; এজ্ঞ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফি-দৌলার

(২) করকশিয়রকে ইমামুনের সমাধি ভবনের এক পাশে সমাহিত করা হয় । তাঁহার সহস্র দোষ ছিল, কিন্তু তিনি গরীবের মা বাপ ছিলেন । তাঁহার শবাধারের সঙ্গে দুই তিন সহস্র গরীব দুঃখী এবং বহু সন্ন্যাসী ফকির গমন করিয়াছিল । তাহাদের গগনভেদী চীৎকার, গালাগালি এবং খুলি নিক্ষেপে চারিদিকে বিকট দৃষ্ট উপস্থিত হয় । সৈয়দ যুগলের বন্দী বহু সন্ন্যাস লোক সঙ্গে লইয়া সমাধি স্থানে উপস্থিত হন । ক্ষুব্ধ জন প্রবাহ তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করে । পরলোকগত আত্মার সঙ্গতির জন্য চাউল ও পরমা বিতরণ করা হয় । কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ করে নাই । তৃতীয় দিবস ইতর শ্রেণীর বহুলোক সমাধি স্থানে মিলিত হইয়া অন্ন বাগান প্রস্তুত পূর্বক গরীব দুঃখীকে বিতরণ করে, এবং সমস্ত রাত্রি সেখানেই সন্মিলিত থাকে ।

নামে শিক্কা ও খোতবা প্রচলনের প্রস্তাব করিয়া নিজে এ প্রহসন হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন । উজীর ও তদীয় ভ্রাতা এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া রুফিদোলার নামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিলেন । ইহার তিন দিন পরেই রুফি-উদ-দরজাত রাজ যক্ষ্মা রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া শাহজির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন । তাঁহার রাজত্ব সপ্তাহাধিক অর্ধ বৎসর স্থায়ী ছিল । তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও রাজ তত্ত্বে আরোহণ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না । তিনি সিংহাসনা-রোহণের তিন মাস মধ্যেই দ্রুত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন । এই দুই ভ্রাতার আমলে হিন্দুর শক্তি বর্দ্ধিত ও দিল্লীর প্রভুত্ব সঙ্কুচিত হইয়াছিল । জয় সিংহ ও অজিত সিংহ রাজপুত রাজকুলগণ মধ্যে সর্বাপেক্ষা কমতাশালী ছিলেন । জয় সিংহ সৈন্যে আগ্রার দারুদশে উপনীত হন এবং অজিত সিংহ ফরকানিররের বিধবা মহিষীকে (ইনি অজিত সিংহের কন্যা) বলপূর্ব্বক স্বদেশে লইয়া যান । সৈয়দ যুগল ইহাদিগকে প্রশমিত করিবার জন্য জয় সিংহকে সুরাটের এবং অজিত সিংহকে আজমীর ও আমেদাবাদের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন । ইহাতে তাঁহাদের আধিপত্য দিল্লীর পঞ্চাশ কোশ দূরবর্তী স্থান হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্রদেশে সংস্থাপিত হয় । ভারতপূর্ব্ববাসী জাতি সম্প্রদায়ের অধিনায়ক চূড়ামণি আগ্রা দুর্গ প্রাচীরের অদূরেই আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়া-ছিলেন । মহারাষ্ট্রীয়গণ শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশ সমূহে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব এবং সমগ্র দক্ষিণা পথে চৌথ ও সরদেশমুখিআদ্বার করিবার অমুমতি লাভ করিয়াছিলেন ।

মোহাম্মদ শাহ ।

রুফিদোলার মৃত্যুর পর সৈয়দ যুগল আহান শাহের পুত্র (আহান

শাহ জাহান্নর শাহের পুত্র) রোসন আকবরকে রাজপদ প্রদান করিলেন। নব নির্বাচিত সম্রাট রূপবান, বুদ্ধিমান ও গুণবান ছিলেন। সৈয়দ যুগল তাঁহাকেও পূর্ববর্তী পাদশাহগণের ন্যায় জীড়া পুত্তলে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদ দ্বীপ বিখ্যাত অনুচরগণ দ্বারা পরিপূর্ণ রাখিলেন। রোসন আকবর মোহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া শাসন কার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কার্য প্রণালী দেখিয়া সৈয়দ যুগল অচিরে বুঝিতে পারিলেন যে, মোহাম্মদ শাহের স্বভাব স্বাধীনতা প্রয়াসী, ও তিনি শূন্য গর্ত রাজনামের জন্য কাহারও হস্তে আত্ম বিক্রয় করিবার পাত্র নহেন। একারণ, তাঁহারা পাদশাহের গতি বিধি হুম্মানুস্মরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। এই হেতু মোহাম্মদ শাহ তাঁহাদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য সহজে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাদৃশ হুম্মানুস্ম বন্দোবস্ত দীর্ঘকাল অব্যাহত রাখা সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহাকে অধিক দিন প্রতীক্ষা করিতে হয় নাই। এই সময় চিনকিলিচ খাঁ মালব দেশের শাসন কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রণকুশল বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন। বহুসংখ্যক পদচ্যুত ও অসন্তুষ্ট সৈন্য তাঁহার দলভুক্ত ছিল। মোহাম্মদ শাহ সৈয়দ যুগলের ক্ষমতা ধ্বংস করিবার জন্য চিনকিলিচ খাঁর সঙ্গে বড়বাক্সে নিপু হইলেন। সৈয়দ যুগল এই অস্তিনব বিপদের বিষয় অনবগত ছিলেন না। তাঁহারা হিন্দু রাজকুমার বৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদের বলবৃদ্ধির প্রয়াসী হইলেন।

ভ্রাতৃ যুগল যথোপযুক্ত বল সঞ্চার করিয়া চিনকিলিচখাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে মালবপ্রদেশের পরিবর্তে তদপেক্ষা অপকৃষ্ট স্থানের শাসন ভার অর্পণের প্রস্তাব করি-

লেন । চিনকিলিচখাঁ এই প্রকারে অশ্রীকৃত হইলেন ; সৈয়দ যুগল তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া রাজস্বাক্ষর যুক্ত আদেশ পত্র প্রেরণ করিলেন । পাদশাহ তাঁহাকে এই সুযোগে সৈন্দের রাজধানীতে উপনীত হইতে গোপনে অনুরোধ করিলেন । তদনুসারে তিনি বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া রাজধানীর অভিমুখে বিপুল বাহিনী সহ ধাবিত হইলেন ।

এই সংবাদ রাজধানীতে পহঁছিলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; রাজ পক্ষের অতীষ্ট সিদ্ধির জন্য অবিরত যড়যন্ত্র চলিতে লাগিল । আবদুল্লা খাঁ ও তদীয় ভ্রাতা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইলেন, এবং আত্ম প্রাধান্য রক্ষার উপায় সহসা উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না । বহু মন্ত্রণার পর আবদুল্লা খাঁ আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে প্রৱেশ করিলেন, এবং হোসেন আলী খাঁ পাদশাহকে সঙ্গে লইয়া চিনকিলিচখাঁর গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন । হোসেন আলী খাঁ পশ্চিমধ্যে পাদশাহের যড়যন্ত্র গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন । ইহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে রাজপক্ষের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । কিন্তু শেষোক্ত দলের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন অবিলম্বে সমস্ত গোলযোগ নিরাকৃত হইল ; এবং পাদশাহ স্বাধীন ভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন । উজির আবদুল্লা খাঁকে পদচ্যুত করা হইল ; মোহাম্মদ আমীন তৎপদে নিযুক্ত হইলেন ।

আবদুল্লা খাঁ পূর্বোক্ত সংবাদ অবগত হইয়া রফি-উদ্-দৌলার পুত্র মোহাম্মদ এব্রাহিমকে রাজপদে বরণ করিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন । তারপর তিনি জাট ও অন্যান্য হিন্দু সৈন্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া মোহাম্মদ শাহ ও তদীয় পক্ষাবলম্বী সৈন্যদ্বিগকে পর্যাদস্ত করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । মোহাম্মদ শাহ রোহিলা প্রভৃতি

মোসলমান সৈন্যের সহায়তা লাভ করিয়া বলশালী হইয়া উঠিলেন । অবিলম্বে মথুরার নিকট উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । দুই দিনের যুদ্ধের পর মোহাম্মদ এব্রাহিম ও আবদুল্লা খাঁ শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন ; এবং তাঁহাদের অনুচরেরা যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল । ইহার কিয়দিবস পরেই আবদুল্লা খাঁ শত্রুর বড়যন্ত্রে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন । (১) তদার করধৃত মোহাম্মদ এব্রাহিমও সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাজিয়া পড়িলেন ।

অতঃপর মোহাম্মদ শাহ রাহ মুক্ত চঞ্জের ন্যায় প্রতীক্ষমান হইতে লাগিলেন ; এবং মোগল সাম্রাজ্যের নষ্ট গৌরবোদ্ধারের আশা সকলের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল । চিনকিলিচ খাঁ দক্ষিণাপথের নিজামের পদ প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই উজীর মোহাম্মদ আমীন পরলোক গমন করিলেন, এবং চিনকিলিচ খাঁ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন । তিনি দক্ষিণাপথে মুবারিজ খাঁকে স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োজিত করিলেন, এবং তারপর স্বয়ং রাজধানীতে আগমন করিয়া কার্য-ভার গ্রহণ করিলেন । সাদত খাঁ অযোধ্যার শাসন কর্তৃপদ লাভ করিলেন । একজন হিন্দু মালব দেশের নিজামতি কার্য নিৰ্বাহ

(১) The Mughals at length so worked upon the Emperor * * that he consented to the poisoning of the Sayed. Ibratnama. তাদৃশ প্রতিষ্ঠাপন্ন বিচক্ষণ ভ্রাতৃহরের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু ফোড়ের বিষয় সন্দেহ নাই । ষাঁকি খাঁ নির্যোজ, সদাশয়, দয়াজ্ঞেয়, গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের বিশেষতঃ হোসেন আলী খাঁর অনেক প্রশংসাবাদ করিয়াছেন এবং পরপীড়ন ও অশান্তি দোষের ভাগ রতনচাঁদ প্রভৃতি হিন্দু কৰ্মচারিগণের ক্ষেপে চাপাইয়াছেন । বাহা হউক, আমরা এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । হুয়টের একজন বণিক এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যাধিয়া পরলোক গমন করেন । হুয়টি বন্দরের রাজকৰ্মচারী এই অর্থরাশি বাজেয়াপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হন । পরলোকগত বণিকের পুত্র এই বিষয় হোসেন আলী খাঁর গোচরে আনয়ন করেন । তিনি এই বিপুল ধন ছাড়িয়া দিবার লক্ষ্য হুয়টের রাজকৰ্মচারীকে আদেশ করেন ।

প্রিয়ার জন্য প্রেরিত হইলেন । ঘৃণ্য জিজিয়া কর রহিত করিয়া হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করা হইল । বোধপুরাধিপতি অজিত সিংহ আশ্রয় সুবাদারের পদ লাভ করিলেন ।

চিনকিলিচ খাঁ শক্তি সম্পন্ন রাজনীতি বিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন । কিন্তু তিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে শিক্ষিত হইয়াছিলেন জন্য তাঁহার স্বভাব কিয়ৎপরিমাণে পরদর্শ্য বিহীন পরায়ণ ও কঠোর ছিল । তিনি জিজিয়া রহিতের বিপরীত ছিলেন । আওরঙ্গজেব দরবারের জন্য যে সকল রীতি নীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী বিলাসী পাদশাহগণের প্রীতিকর না হওয়াতে অভিন্ন রীতি নীতি অমুমত হয় । নব নিয়োজিত উজীর নবরীতি নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া পুনর্বার প্রাচীন রীতি নীতি প্রবর্তন করিতে বদ্ধ শীল হইলেন ।

কিন্তু ইহাতে তিনি নব্য পার্শ্বদগণের উপহাসাস্পদ হইলেন ; তিনি দরবারে উপনীত হইয়া প্রাচীন প্রথামত অভিবাদন করিলে তাহারা বলিত, “দেখ, দক্ষিণাপথের বানর কি ভাবে নৃত্য করে ।” উজীর তাদৃশ দুর্জাক্যের বিষয় অনবগত রহিলেন না, কিন্তু পার্শ্বদগণের সকলেই পাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে কিছু বলিতে পারিলেন না ; এতদ্ব্যতীত মর্মে মরিয়া রহিলেন । চিনকিলিচ খাঁ স্বকাৰ্য্য সাধনে তৎপর ছিলেন ; তাঁহার কার্য্যে অনেকের স্বার্থ হানি হইয়াছিল । এই স্বার্থপর দল তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিল । ইহাদের অনেকেই পাদশাহের পার্শ্বচর ছিল । সুতরাং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না । এই সব কারণে তাঁহার নিকট মন্ত্রী পদ অস্পৃহীয় হইয়া উঠিল । তিনি যুগ্ম বাপ-

দেশে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তারপর দক্ষিণাপথে গমন করিয়া স্বাধীন ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন । কমর উদ্দীন খাঁ প্রধান অমাত্যের পদে বৃত্ত হইলেন ।

এই সময় সমস্ত দক্ষিণাপথে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল । চিনকিলিচ খাঁর প্রবল প্রতাপে ও সুশাসনে দেশমধ্যে পুনর্বার শান্তি সংস্থাপিত হইল, এবং প্রকৃতিপুঞ্জ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল । তৎকালে ভারতবর্ষে দুইজন শাসনপতির প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল ; নিজাম চিনকিলিচ খাঁ এদং পেশওয়া বাজিরাও । বাজিরাওর প্রাণগত সখিনায় মহারাষ্ট্র শক্তির গৌরব রবি মধ্যাহ্নাকাশে সমুপস্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিতে হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভূতলে অতুল কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবার জন্য সংকল্প করিয়াছিলেন । তাঁহার সংকল্প সিদ্ধির পথ নিরঙ্কুশ ছিল ; একমাত্র নিজাম বাহাদুর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিদ্যমান ছিলেন । একজন মহারাষ্ট্র নায়ক বাজিরাও তাঁহাকে দগ্ধ করিবার জন্য সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিলেন । এই যুদ্ধ একাদিক্রমে সাত বৎসর পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রহিল । নিজাম বাহাদুর তরবারি হস্তে ছুটাছুটি করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন । তিনি রণক্ষেত্র হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার কল্পনায় মহারাষ্ট্র শক্তির তেজোপ্রবাহ মোগলাধীন দেশাভিমুখে সঞ্চালিত করিয়া দিলেন । ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল । পেশওয়া নিজামের শাসনাধীন দেশ আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ; এবং নিজাম মহারাষ্ট্র সৈন্যের মোগলাধীন দেশ আক্রমণে কোন বাধা দিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন ।

খাফি খাঁ নিজাম বাহাদুরের রাজভক্তির বধেই প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি কদাচ রাজভক্তির পথ হইতে এক তিলও বিচ-

লিখিত হইতেন না । নিজাম বাহাদুর গোঁড়া মোসলমান ছিলেন, হিন্দুর প্রতিপত্তি কখনও তাহার নিকট বাহুনাশ ছিল না । এরূপ অবস্থায় তিনি যে স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে সৈন্তকে উত্তেজিত করিয়া হিন্দুর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের বিস্ময় জন্মিতে পারে । কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন কালে মোসলমান রাজ-পুরুষগণের কর্মনীতি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র ছিল । এই সময় তাহাদের কর্তব্য জ্ঞান কতদূর সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে স্মরণ-নিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ নিজাম বাহাদুরের দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা অনুভব করিতে পারি ।

বাহা ইউক, পূর্বোক্ত সন্ধি অনুসারে মহারাষ্ট্রা অধিনায়কগণ প্রথমতঃ মালবদেশ আক্রমণ করিলেন । মালবের শাসনকর্তা শত্রু সৈন্তের গতিরোধ জন্য বিপুল বিক্রমে দণ্ডায়মান হইলেন ; কিন্তু রণক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিতে পারিলেন না । মালবদেশ মহারাষ্ট্রা সৈন্তের করতলগত হইল । ইহার পর তাহাদের অন্যতম অধিনায়ক মহলরাও হোলকার আশ্রয় দক্ষিণ পূর্ব প্রদেশে সসৈন্তে উপনীত হইয়া দোয়াব লুণ্ঠন করিলেন । দিল্লীর রাজপুরুষগণ মহারাষ্ট্র সৈন্তের আগমনে ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়াতে পাদশাহ নিকৃপায় হইয়া অযোধ্যার শাসন-কর্তা সাদত খাঁকে আহ্বান করিলেন । তদনুসারে তিনি সসৈন্তে আগমন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন । কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার প্রবল বস্তার দ্বারা পুনরায় মোগল শাসনাধীন দেশে পতিত হইল । পাদশাহ তাহাদের গতিরোধ জন্য নিজাম বাহাদুরকে আহ্বান করিলেন । তিনিও এখন স্বীয় অকুসৃত নীতির ভ্রম বুঝিতে পারিলেন,—তাহার নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইল যে, দিল্লীর রাজশক্তি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণই

ভারতবর্ষে সর্ব্বসর্বা হইয়া উঠিবেন, এবং তাহার কল তাঁহার নিজের অস্তিত্বের পক্ষেও উভয়কর হইবে না । এ জগৎ তিনি রাজ আফগানিস্তানে রাজধানীতে গমন করিলেন । কিন্তু এই সময় পাদশাহের ক্রমতা এতদূর সীমাবদ্ধ হইয়াছিল যে, নিজাম বাহাদুর বহু যত্নেও চতুঃত্রিংশৎ সহস্রাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না । এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াই তিনি দোয়াব প্রদেশে শান্তি সংস্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্র সৈন্যের গতিরোধ জন্য ভূপালে গমন করিলেন । দিল্লীর দরবারের অবিমুখ্য-কারিতা নিবন্ধন এই স্থানে তাঁহাকে শত্রু সৈন্য পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল । তিনি দ্বাবিংশতি অহোরাত্র অবরুদ্ধ থাকিয়া মালবদেশ এবং চাম্বল ও নর্মদার মধ্যবর্তী সমগ্র প্রদেশ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বাক্ষরিত হইয়া মুক্তিলাভ করিলেন ।

যে সময় ভারতবর্ষ এই ভাবে হিন্দু মোসলমানের সংঘর্ষে আলোড়িত হইতেছিল, তখন নাদির শাহ বিপুল বাহিনীসহ কালান্তক যমের ক্রুর পঞ্চনদ ভূমির দ্বারদেশে উপনীত হইলেন । নাদির শাহ পারস্যের অন্তর্গত খোরসান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি শৈশব কালেই পিতৃহীন হয়েন, এবং তদীয় পিতৃব্য সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন । সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি উজবেগের হস্তে বন্দী হন, এবং চারি বৎসর অবরুদ্ধাবস্থার অতিবাহিত করিয়া কৌশলক্রমে পরিভ্রাণ লাভ করেন । অতঃপর তিনি কতিপয় বৎসর দস্যুবৃত্তিতে ব্যাপন করিয়া প্রতাপশালী হইয়া উঠেন ; এই সময় পারস্যের অধিপতি শত্রু কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন । প্রথম জীবনে নাদিরের হৃদয়ে স্বদেশ প্রেমের অভাব ছিল না ; তাঁহার যত্ন ও রণকৌশলে রাজ্যভ্রষ্ট পারস্যের অধিপতি পুনর্বার পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন । এ পর্য্যন্ত নাদির শাহের কাণ্ড স্বদেশ প্রেমের

অসুগত ছিল । কিন্তু ইহার পর সৈন্য বৃন্দের গভীর অসুযোগ ও ভাগ্য-লক্ষ্যের অচিন্ত্য কৃপা তাঁহার চিত্তবিকার জন্মাইয়া দেয় ; এবং তিনি পারস্যের অধিপতিকে কারাকদ্ধ করিয়া স্বীয় মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করেন । রাজপদ গ্রহণের পর পররাজ্য লুণ্ঠন ও নরনারীর রক্তে পৃথিবী রঞ্জনে তাঁহার জীবনের সারব্রত হইয়াছিল । সিংহাসনারোহণের তৃতীয় বর্ষের প্রারম্ভে তিনি মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত কাবুল ও কান্দাহারের অভিযুখে স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন । এই সকল দেশ সহজে বিজিত হওয়াতে নাদির শাহের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল, তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে,—ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া দিল্লীর অপরিমিত ধনরত্ন অপহরণ করিবার জন্য সসৈন্তে পঞ্চনদ ভূমিতে আগমন করিলেন, এবং লাহোর বিধ্বস্ত করিয়া রাজধানীর অভিযুখে শটেনঃ শটেনঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । (১) তিনি দিল্লীর অদূরবর্তী কারনালে পহুঁছিলে পাদশাহ মোহাম্মদ শাহ সসৈন্তে আগমন করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন । উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ; মোহাম্মদ শাহ পরাজিত হইলেন । অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদত খাঁ পাদশাহের সঙ্গে বুদ্ধিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন । তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন ; প্রথম হইতেই তাঁহার সহিত নাদির শাহের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল । তিনি আপন ইচ্ছামত রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন । অতঃপর পাদশাহ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন । দিল্লীর রাজশক্তি আশ্রয় কলাহ কৃত বিকৃত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল ; এ জন্য ভারত লুণ্ঠন কালে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হইবেন বলিয়া নাদির শাহের বিশ্বাস

(১) Nadir Shah * * now marched in this direction with the design of conquering Hindustan, as some say, at the suggestion of Nizam-ul Mulk and Sadat Khan. Tarikh-i Hind.

ছিল না । বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভাবি আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতোছিল ; এমন সময় সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়াতে তিনি বধোপযুক্ত পরিমাণে অর্থ গ্রহণ করিয়াই সসৈন্তে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার মনোভিলাষ প্রকাশ করিলেন । কিন্তু কৃতঘ্ন সাদত খাঁ এ সঠক অসম্মীচীন বলিয়া অভিমত প্রকাশ পূর্বক কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতে মন্ত্ৰণা দিলেন, কিছুকাল প্রতীক্ষা করিলেই অধিকতর অনুকূল সন্তোষ সন্ধি সংস্থাপন করা যাইবে বলিয়া নিবেদন করিলেন । সন্ধির প্রস্তাবে এক মাস অতিবাহিত হইল ; তখন মোহাম্মদ শাহ বিজয়ী বীরের হস্তে আত্মসমর্পণ করাই কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন । তদনুসারে তিনি পাত্র মিত্র সহ শত্রু শিবিরে উপনীত হইলেন । নাদির শাহ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । তাঁরপর তিনি পাদশাহের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কাপুরুষতার জন্ত নিন্দা করিয়া বলিলেন, “আপনি বে কেবলমাত্র দক্ষিণাপথের বিধর্মী অসভ্য হিন্দু-দিগকে কর প্রদান করিতেছেন, তাহা নহে ; আপনার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণকারী আগমন করিলে (যেমন আমি আসিয়াছি) আপনি স্ত্রায় যুদ্ধ না করিয়াই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন । কথোপকথনান্তে নাদির শাহ পাদশাহের জন্ত জলযোগের আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া উজীরের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন সম্বন্ধে মন্ত্ৰণা করিতে কক্ষান্তরে গমন করিলেন । তিনি মন্ত্ৰণা অন্তে অভ্যর্থনা কর্ত্তে প্রতিগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পাদশাহ তদ্রূপ চিত্তে ভোজনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন । ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া জটনক অমুচরকে বলিলেন, যিনি এক্রূপ অবিচলিত চিত্তে আপনার ক্ষমতা ও স্বাধীনতার বিলোপ সহ করিতে পারেন, তাঁহার প্রকৃতি কেমন ! বিপদের সম্মুখীন হইবার দ্বিবিধ পথ রহিয়াছে ;—ঐর্ষ্য অবলম্বনে সমস্ত কষ্ট সহ করিতে হইবে

অথবা সাহস সহকারে কার্য করিতে হইবে, সংসারকে অবজ্ঞা করিতে হইবে, অথবা উহাকে বশীভূত করিবার জন্যই সমস্ত চিত্তবৃত্তির পরিচালনা করিতে হইবে । মোহাম্মদ প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমার পক্ষে শেষোক্ত পথই অবলম্বনীয় ।” বন্দী পাদশাহের ভোজন শেষ হইলে নাদির তাঁহাকে বলিলেন, “তৈমুর বংশের সহিত আমার বিবাদ নাই । আমার সমস্ত যুদ্ধ ব্যয় আপনাকে বহন করিতে হইবে । আমার সৈন্তের পক্ষে কয়েকদিন দিল্লীতে বাস করা আবশ্যক ।”

অনন্তর নাদির শাহ পাদশাহকে সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে দিল্লীতে গমন করিলেন । লুণ্ঠন লোলুপ পারসীক সৈন্ত নাদির শাহের কঠোর শাসনে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া রহিল ; প্রথমে দিল্লীতে কোন প্রকার উপদ্রব হইল না । কিন্তু নাদিরের সহরে প্রবেশের দ্বিতীয় দিবস একজন কলহ প্রিয় পারসীক সৈন্ত কপোতক্রমব্যাপদেশে বিবাদের সূত্রপাত করিল ; তাহার দুর্ভাবহারে নাগরিকগণ উত্তেজিত হইয়া রাত্তিকালে পারসীকদিগকে অস্ত্রসহ আক্রমণ করিল । ইতি মধ্যে নাদির শাহের মৃত্যুর অমূলক জনরব প্রচারিত হওয়াতে নগরবাসীদের উত্তেজনা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল । তাহাদের হস্তে পারসীক সৈন্ত নলে দলে নিহত হইতে লাগিল । নাদিরের কর্মচারিগণ তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে রাত্তির জন্ত কেবল আশু রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বলিলেন । পরদিন প্রাতঃকালে নগরবাসীরা তাঁহাকে দেখিলেই শঙ্ক ভাব অবলম্বন করিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল । একজন্ত তিনি রাতি প্রভাত মাত্র অস্মারোহণে চাদনী চকে উপনীত হইলেন । কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াও ক্রোধোন্মত্ত নগরবাসীরা ক্রক্ষেপ করিল না । নাদির শাহ রসনদোলায় প্রত্যা-
বর্তন করিয়া তাহাদিগকে দমন জন্ত মজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

এমন সময় জনৈক দিল্লীবাসী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 'গুলি বর্ষণ করিল'। এই ঘটনার তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং তাহাতে অমিত ধনরত্ন পূর্ণ বিচিত্র হস্তারাজি শোভিত দিল্লী ভস্মভূত হইয়া গেল। তাঁহার আদেশে পারসীক সৈন্য পৈশাচিক মূর্তি ধারণ করিয়া বালরুদ্ধ দ্বী পুরুষ নির্বিশেষে দিল্লীবাসীর হত্যার জন্য তরবারি কোষোন্মুক্ত করিল। নিহত নরনারীর রক্ত স্রোতে রাজপথগুলি প্লাবিত হইল। সৈন্যগণ সুদৃশ্য প্রাসাদাবলী অগ্নি সংযোগে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করিল। প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন পর্যন্ত পারসীক সৈন্য হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। এই নয় ঘণ্টা ব্যাপী হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য নরনারী জীবন বিসর্জন করিয়াছিল। (১) নাদির শাহ রসনদৌলা নামক একটি লাল প্রস্তর নির্মিত মসজিদের উপর বসিয়া এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। তাঁহার নিশ্চয় ভয়াবহ মূর্তি দর্শনে ভীত হইয়া কেহই সে স্থানে উপস্থিত হইয়া দিল্লীবাসীর প্রাণ ভিক্ষা করিতে সাহস করিল না। অবশেষে মোহাম্মদ শাহ প্রজাবৃন্দের করুণ বিলাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নাদির শাহের নিকট গমন পূর্বক কম্পিত কলেবরে অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থী হইলেন। ইহাতে নাদির শাহের ক্রোধানল নির্বাপিত হইল। তাঁহার আদেশে তাদৃশ নগর ব্যাপী নরহত্যা ও গৃহদহন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভোজবাজির দ্বারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

(১) কত লোক এই প্রলয় ব্যাপারে নিহত হইয়াছিল? কিন সাহেবের নির্দিষ্ট সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। ফ্রেসার সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে, মৃত্যু সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজারের নূন ও দেড় লক্ষের অধিক ছিল না। তারিখ-উ-হিন্দির লেখক রস্তুম আলীর মতে মৃত্যু সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। বিরানি-ই-ওয়াকি নামক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সের কোতওয়াল অনুসন্ধান অবস্থ হত্যার সংখ্যা বিশ হাজার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। নাদির নামা গ্রন্থে ত্রিশ হাজার নগরবাসী নিহত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

সহর মধ্যে শাস্তি সংস্থাপিত হইলে নাদির শাহ রাজপ্রাসাদে গমন পূর্বক বিমর্ষচিত্ত সম্রাটকে সাহসনা করিলেন । তাঁহারা এক সঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া কাফি পান করিলেন । অতঃপর নাদির শাহ মোহাম্মদের মস্তকে রাজ মুকুট পরাইয়া দিলেন । কলতঃ দিল্লীর সম্রাট অস্বতঃ কিয়ৎকালের জন্য ও আপনাকে পারস্তের করদ রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন । বিজয়ী বীর পঞ্চনদ প্রদেশ ও কাবুল রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন ; তার পর জগদ্বিখ্যাত কহিনুর ও ময়ূরতন্ত্র এবং রাজ কোষের পুঞ্জীকৃত ধনরত্ন সমভিব্যাহারে দিল্লী পরিত্যাগ করলেন । (১)

নাদির শাহের আক্রমণের ফলে দিল্লীর রাজকোষ কপর্দক শূন্য, এবং মোগল সাম্রাজ্য নাম মাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছিল । তাজকিরা নামক ইতিহাসকর্তা লিখিয়া গিয়াছেন যে, সার্ব্ব তিন শত বৎসরের সঞ্চিত ধন রাশি এক মুহূর্তে হস্তান্তরিত হয় । অতঃপর স্বার্থপর রাজস্ব কর্মচারিগণ রাজ কোষে অর্থ প্রেরণ বন্ধ করেন । ইহার ফলে রাজ কোষে অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত হয়, এবং সৈন্যগণ নিঃশ্রমিত বেতন না পাইয়া কার্য্য পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করে । পক্ষান্তরে আমার ওমরাহগণ রাজপ্রাপা অর্থ আশ্বাস্য করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করেন, এবং তদ্বারা আপনাদের স্বার্থ সাধন জন্য সৈন্য পরিপোষণ করিতে প্রবৃত্ত হন । একারণ পাদশাহ তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন ।

(১) নাদির শাহ বরাদি সহ তারতবর্গ হইতে কত টাকা লইয়া গিয়াছিলেন ? কিন সাহেব লিখিয়াছেন যে, নাদির শাহ সর্বসাকুল্যে আট কোটি পাউণ্ড লইয়া যান । বয়ানি-ই-ওরাক নামক গ্রন্থে আশী ক্রটি মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায় । দশ টাকায় এক পাউণ্ড ধরিলে উক্ত সংখ্যায় একা হইতে পারে । তাজকিরা নামক ইতিহাস রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, একমাত্র মণি মুক্তাভেদে পঞ্চাশ কোটি টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল ।

এই সময় রাজধানীর বহির্ভাগে পাদ শাহের সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। কাবুল হইতে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশ নাদির শাহ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়া ছিলেন। শিখ জাতি সরহিন্দে ও পঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লী ও আগ্রা প্রদেশের একাংশে রোহিলা-আফগানেরা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অযোধ্যা প্রদেশে সাদত খাঁ পাদশাহের প্রতিনিধি ছিলেন। দিল্লীতে নাদির শাহের অবস্থিতি কালে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সাদত খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় জামতা সফদার জঙ্গ অযোধ্যার শাসন ভার লাভ করিয়া তথায় অধুনা প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতেছিলেন। মালব ও গুজরাট দিল্লীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল। নিজামি ও মহারাষ্ট্রীয়গণ সমগ্র দক্ষিণা পথগ্রাস করিয়াছিলেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন কঠা নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

ইহার পর ক্ষমতা লোলুপ আত্মপরায়ণ রাজপুরুষগণের তাণ্ডবে ও কলহে রাজকার্য্য রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

ফলতঃ নাদির শাহের আক্রমণের পরেই জগৎপ্রখিত মোগল সাম্রাজ্য অন্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পরও দ্বাবিংশতি বর্ষ কাল মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাহা সে সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক নহে, ছায়া মাত্র।

নাদির শাহের দিল্লী পরিত্যাগের পর মোহাম্মদ শাহ আপনাকে হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব উদ্ধার জন্ত যত্নশীল হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘ কাল শাস্তিতে বাস করিতে পারিলেন না। আমেদ শাহ আবদালী বা দুরানী নামক একজন আফগান প্রথমতঃ নাদির শাহের চোপদারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সোভাগ্য লক্ষীর

কৃপার কাল ক্রমে কোঁষাখান্ধর পদ লাভ করেন। নাদির শাহের মৃত্যুর পর সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে রাজকোষ হইতে তিন শত উষ্ট্রের বহনোপযোগী স্বর্ণ মুদ্রা অপহরণ করিয়া ছরানী আফগানিস্থানে উপস্থিত হন, তাহার পর আফগানদিগকে বশীভূত করিয়া হিরাট, খোরসানের কিয়দংশ, সিন্ধু ও কাশ্মীর অধিকার পূর্বক এক অভিনব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

আমেদশাহ আবদালী স্বর্ণভূমি ভারতভূমি লুণ্ঠন করিয়া কৌড়ি সংস্থাপন জন্ত ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে সৈন্য লাহোর প্রদেশে আগমন করিলেন। পাদশাহ দেশ রক্ষার কল্পনার জ্যেষ্ঠপুত্র আমেদশাহ ও উজীর কমরউদ্দীনকে সৈন্যপত্যে বরণ করিয়া আবদালীর গতিরোধ জন্ত প্রেরণ করিলেন। মোগল সৈন্যের রণকোশলে আবদালী পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু বুদ্ধকালে উজীর কমরউদ্দীন শত্রুহন্তে জীবন বিসর্জন করাতে পাদশাহের প্রধান অবলম্বন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

উজীরের মৃত্যু সংবাদ পরিক্রান্ত হইয়া পাদশাহ অতিশয় শোকাবল হইলেন, এবং সমস্ত রজনী অশ্রু বিসর্জন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দরবারের সময় পরলোকগত উজীরের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি বাপুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “হায় দারুণ বিধি, আমার বৃদ্ধ বয়সের প্রধান অবলম্বন ভাঙ্গিয়া দিলে। আমি এরূপ বিবস্ত কৰ্ম্মচারী কোথায় পাইব ?” শোক প্রকাশকালে তাঁহার পুরাতন ব্যাধি মূর্ছা উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎই তাঁহার অশান্তিক্রিষ্ট জীবনের অবসান করিল। মোহাম্মদ শাহের রাজত্ব ত্রিশবৎসর স্থায়ী ছিল।

আমেদ শাহ ।

পিতার পরলোক গমনের পর শাহজাদা আমেদশাহ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নূতন সম্রাট উজীরের শূন্যপদে অযোধ্যার

শাসনকর্তা সফদার জঙ্গকে নিযুক্ত করিলেন । সফদার জঙ্গের প্রকৃত নাম আবুল মনসুর । আবুল মনসুর বাণিজ্য উপলক্ষে পারস্যদেশ হইতে দিল্লীতে আগমন করেন, এবং ঘটনাক্রমে অযোধার প্রতিনিধি সাদত খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন । (১) আবুল মনসুর প্রতিনিধির কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন । এই ঘটনার দিল্লীর দরবারে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সাদত খাঁর মৃত্যুর পর তিনি অযোধ্যা প্রদেশের শাসনভার লাভ করেন । উজীর কমরউদ্দীন খাঁর পরলোক গমনের পর সফদারজঙ্গ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন ; তিনি অযোধ্যার শাসন জন্ত নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রাজধানীতে অবস্থান পূর্বক স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন । নিজাম বাহাদুরের পুত্র গাজিউদ্দীন মোহাম্মদের রাজত্বকালে মিরবন্দের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেই পদে বহাল রহিলেন ।

আমেদশাহের সিংহাসনারোহণের পর অবিলম্বেই রাজপুরুষগণের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হইল । এক পক্ষে সফদারজঙ্গ এবং অন্য পক্ষে গাজিউদ্দীন । এই বিবাদের সময় উজীর একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন । ইহাতে গাজি প্রকাশ করিলেন যে, তিনি স্বার্থপরতার বশবস্তী হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক মোগল শক্তিকে একজন নগণ্য জায়গীরদারের হস্তে অবজ্ঞাত করিয়াছেন । এই সন্দেহের মূলে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবার জন্ত পাদশাহ অমুরুদ্ধ হইলেন । কিন্তু খোজা জাওয়েদ খাঁ উজীরের পক্ষাবলম্বন করাতে পাদশাহ তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিলেন না । (২)

(১) আবুল মনসুরের নাম সাদত খাঁও প্রথমে পারস্য দেশের একজন বণিক ছিলেন । তার পর এদেশে আগমন পূর্বক আপন প্রতিভাবলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া অযোধ্যার সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হন ।

(২) খোজা জাওয়েদ কে ? পাদশাহ আমেদশাহের মাতা উম্মবাই প্রথমে এক-

মৌগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে রাজপুরুষগণের আত্মকলহই নিয়মে পরিণত হইয়াছিল। সফদারজঙ্গ এবং তদীয় উপকারী বন্ধু জাওয়েদ খাঁর মধ্যেও বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু কেহই কাহাকেও সহসা অপদস্থ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন সফদার জঙ্গ জাওয়েদ খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন, এবং কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। এই ঘটনার পাদশাহ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সফদারজঙ্গকে পদচ্যুত করিয়া দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং কুমার উদ্দীন খাঁর পুত্রকে খানখানান উপাধি প্রদান করিয়া উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। সফদারজঙ্গ উজীরের পদ হইতে তাড়িত হইলেন, কিন্তু অস্বাভাবিক শাসনাধিকার তাঁহার প্রতিনিধির হস্তে রহিয়া গেল। সফদার জঙ্গ বাহুবলে লুপ্ত ক্ষমতা উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পাদশাহ ও মিরবক্সী গাজিকে (১) পরিবেষ্টন করিলেন। কিন্তু

জন নষ্টকী ছিলেন; তার পর মোহাম্মদ শাহের স্বদৃষ্টিতে পতিত হইয়া রাজাস্তঃপুরে স্থানপ্রাপ্ত হন। কিন্তু অচিরে চরিত্র দোষের জন্য সকলের নিকট ঘৃণাম্পদ হইয়াছিলেন; এমন কি, পাদশাহ পুত্র আমেদকে মাতৃদর্শন করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর উদয়বাই স্বীয় পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বপূর্ণ করিয়া Parent of the pure প্রভৃতি বিন্দুশ উপাধিলাভ করেন, এবং প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্ব সুকীর্ষ হইয়া উঠেন। রাজাস্তঃপুরের প্রধান খোজা জাওয়েদ খাঁর সঙ্গে তাঁহার অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই সূত্রে জাওয়েদ খাঁ পাদশাহের নামে রাজকাব্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু তিনি লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন।

(১) এই গাজি নিজামের পুত্র নহেন, পৌত্র। নিজাম বাহাদুরের মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজি ও কনিষ্ঠ পুত্র সলাবত জঙ্গের মধ্যে বিবাদ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে গাজি নিহত হন, এবং সলাবত জঙ্গ শাসন করিতে লাভ করেন। গাজির পুত্র গাজি দিল্লীতে মিরবক্সী নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার তরুণ বয়স, কিন্তু তিনি রণকুশল

তিনি রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া জাটদের শরণাপন্ন হইলেন। জাটগণ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করাতে গাজিউদ্দীন তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি পাদশাহের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই জাটদিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য মহারাষ্ট্রে সেনাপতি মহলরাও এবং রঘুনাথ রাওকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে তাহার সৈন্তে উপনীত হইলে সম্মিলিত সৈন্তের সেনাপত্য লইয়া খানখানানের সঙ্গে গাজির বিবাদ উপস্থিত হইল। বহু বাদানুবাদের পর গাজি সেনাপতির পদে বৃত্ত হইয়া মহারাষ্ট্রা সৈন্ত সহ জাটদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য গমন করিলেন। সম্মিলিত সৈন্তের আক্রমণে জাটগণ বিপন্ন হইল। কিন্তু এমন সময়ে মোগলশিবিরে গোলাগুলির অভাব উপস্থিত হইল; গাজি জনৈক সেনানায়ককে গোলাগুলি আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

জাটদুর্গ গাজির হস্তগত হইলে তিনি অত্যন্ত বলশালী হইবেন বলিয়া খানখানানের বিশ্বাস ছিল। গাজির তাদৃশ বলশালীতা তাঁহার প্রভুর রক্ষার পক্ষে বিরজনক হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি গোলাগুলি প্রেরণ করিতে নিষেধ করিলেন। খানখানান এই নিষেধ করিয়াই নিরস্তুর রহিলেন না; পাদশাহের নিকট গাজিকে রাজমুকুট লাভের প্রয়াসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। পাদশাহ জাট সৈন্তের সঙ্গে যোগ দিয়া গাজিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে মৃগয়া ব্যপদেশে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। গাজি এই ঘটনাদের বিষয় অপরিজ্ঞাত রহিলেন না। তিনি পাদশাহের অতিথানের সংবাদ পাইয়া জাট দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ পূর্বক রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পাদশাহ সেকেন্দ্রাবাদ নামক স্থানে উপনীত হইয়া গাজির প্রত্যাগমন সংবাদ প্রাপ্ত বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। পিতার ন্যায় ইনিও সফলরূপে উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন।

হইলেন ; (১) তাঁহার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে ফলশ্রুতি হইবে না বিবেচনা করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন ।

গাজি পাদশাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজধানীতে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন ! তারপর গাজি প্রতিহিংসাবশে সম্রাটের নয়নদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন ।

দ্বিতীয় আলমগীর ।

অতঃপর গাজি তৈমুর বংশোদ্ভব আজিমউদ্দীনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । ইহার পর তিনি খানখানানকে হত্যা করিলেন । আজিম উদ্দীন সদাশয়তা ও মহাত্মবৃত্তা প্রদর্শন পূর্বক রাজত্বের প্রারম্ভে সপ্ত-দশ জন অবরুদ্ধ রাজকুমারকে মুক্তি প্রদান করেন । আজিম উদ্দীন ইতিহাসে দ্বিতীয় আলমগীর নামে অভিহিত হইয়াছেন । তিনি রাজ-সিংহাসনে বৃত্ত হইবার পূর্বে কারারুদ্ধ ছিলেন । তিনি নাম সর্বস্ব পাদশাহ হইলেন ; গাজি স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়া পুত্রে পরিণত করিলেন । রাজসিংহাসন তাঁহার নিকট কারাগার অপেক্ষাও হীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ।

দ্বিতীয় আলমগীর গাজি-উদ্দীনের প্রভুত্ব সহ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন রূপেই তাঁহার সর্বস্ব প্রভুত্ব খর্ব করিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার হস্ত হইতে

১১) সেকেন্দ্রাবাদে পাদশাহী শিবিরে করকশিয়রের কন্যা প্রকৃতি রাজমহিলাগণ অবস্থান করিতেছিলেন । আশবরি-ইমুহাবত নামক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, একদা মহলরাও পাদশাহী শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে হৃত করিয়া লইয়া যান । এ বৃত্তান্ত সত্য হইলে ইহাট দিল্লীর রাজশক্তির পূর্ণ অধঃপতন ও অবমাননার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । গ্রাণ্ট ডফ লিখিয়াছেন যে, কেবলমাত্র জিনিসপত্র স্তম্ভিত হইয়াছিল । কিন্তু স্বট সাহেন লিখিয়াছেন যে চৌংকার ও স্তম্ভনের পর রাজমহিলাদিগকে এক দল রক্ষক সহ দিল্লীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল ।

পরিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উপায় না দেখিয়া অগত্যা আবদালীকে আহ্বান করিলেন । (১) আবদালী এই আশ্রয় কলহের সুযোগে পুনর্বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে অসম্মত হইলেন না । তিনি সঙ্গেতে দিল্লীতে আগমন করিয়া গাজি উদ্দীনকে পদচ্যুত এবং পাদশাহকে মনোমত উজীর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন । কিন্তু অব্যবহিত পরেই গাজি আফগান বীরকে সুকৌশলে আপন পক্ষাবলম্বী করিয়া পুনর্বার স্বকাষে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । আবদালী দিল্লীদারীর নিকট হইতে এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন । এই সময়ে তাহাদের এতদূর ছরবস্থা হইয়াছিল যে, নাদির শাহের আক্রমণ কালে দশকোটি মুদ্রা সংগ্রহ করা অপেক্ষা আবদালীর আদেশে এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করাই অধিক ছুরুহ হইল । পাদশাহ সর্বগ্রাসী গাজির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য মহা শত্রুকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না ; উপরন্তু আমন্ত্রিত শত্রু প্রকৃতি পুঞ্জের যথা মর্ষস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইলেন ; তাহার সত্য্যচারে রাজধানী শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইল । পাদশাহ প্রকৃতি পুঞ্জের হৃদশার অপনয়ন জন্য একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না ; এক দিকে তাহাদের কাতর ধ্বনি গগণ স্পর্শ করিতেছিল, অপর দিকে পাদশাহ মোহাম্মদ শাহের কণ্ঠার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার আশায় লুণ্ঠনকারীর তোষামোদে ব্যাপ্ত ছিলেন । আবদালী নানাধিক এক বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া স্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

(১) ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতক্রমণের পরে ও এই আহ্বানের পূর্বে আবদালী আর একবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন । কিন্তু অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই পাদশাহ তাহাকে পঞ্জাব অর্পণ করিয়া পরিতুষ্ট করেন ; এবং তজ্জন্য তিনি আর অগ্রসর না হইয়াই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন ।

আলমগীরের পুত্র আলীগহর রণকুশল ও বুদ্ধিমান ছিলেন । এজন্য গাজি-উদ্দীন তাঁহাকে আপন পথের কণ্টক স্বরূপ বিবেচনা করিয়া কারাকুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন । আলী গহর কোশলে কারাকুবন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দূরে পলায়ন করিলেন, এবং গাজি উদ্দীনের করাল কাল হইতে পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য মহারাষ্ট্র সেনাপতি ইটলরাওর শরণাপন্ন হইলেন । অর্দ্ধ বৎসর তাঁহারা দিল্লীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলেন । কিন্তু অভিষ্ট সিদ্ধির পক্ষে কোন প্রকার সুযোগ প্রাপ্ত না হওয়াতে আলীগহর ইটলের সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়া সেকেন্দ্রাবাদের জায়গীর দার নজব উদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । নজব উদ্দৌলা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার অমুকূলে অস্ত্র ধারণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন । একারণ আলীগহর সেকেন্দ্রাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় বিধ্বস্ত অসুচর সহ অযোধ্যা প্রদেশের প্রধান নগরী লক্ষ্মীতে উপনীত হইলেন । এই সময় সফদার জঙ্গের পুত্র সুজাদৌলা অযোধ্যার শাসন পতি ছিলেন । তিনি স্বাধীন ভাবে শাসন কার্য্য নির্বাহ করিতেছিলেন । দিল্লীর পাদশাহের জ্যেষ্ঠ কুমার তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন না । আলীগহর বিফল মনোরথ হইয়া তথা হইতে এলাহাবাদের শাসন কর্তার নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন । অতঃপর তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এলাহাবাদের অভিমুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন । এবার অযোধ্যার শাসনপতি সুজাদৌলা তাঁহাকে হস্তগত করিয়া তাঁহার নামের সাহায্যে আপন ছরাকাজী পরিতৃপ্ত করিতে মনন করিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া এলাহাবাদে গমন করিলেন । এলাহাবাদ সুজাদৌলার অধিকৃত হইল ।

এই সময়ের কিছু পূর্বে মহারাষ্ট্রীয় অধিনায়কগণ সৈন্সকে পক্ষাঘাত উপনীত হন, এবং তদানন্তর সহজেই বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া শাসন কার্য্য নির্বাহ কর্তৃক স্বাধীন নিযুক্ত করেন । অতঃপর তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন কর্তৃক আরোহণে প্রবৃত্ত হন । এই উদ্যোগ পূর্বকালে দিল্লীর রাজবংশ বসন্ত সন্ধ্যাপরে তুমার রাশির দ্বারা লোক লোচনের বহির্ভূত হইতেছিল ; সমগ্র ভারতবর্ষে কেহই মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতিদ্বন্দী ছিল না ; এবং দেশের সর্বত্র অরাজকতার পূর্ণ প্রভাব দৃষ্টিগোচর হইত । এই সময়েই দিল্লীর দুর্গ আকারে হিন্দুর বিজয় নিশান উড্ডীন করার পক্ষে বাহেস্ত্রকণ প্রস্তুত ছিল । (১)

মহারাষ্ট্র সৈন্ত পক্ষাঘাত সংস্থাপিত হইলে আবদালী আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষাতি-মুখে ধাবিত হন । এই সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে পাদশাহ শাজির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার অভিপ্রায়ে আবদালীর সঙ্গে বড়ঘরে প্রবৃত্ত হইলেন ।

দ্বিতীয় শাহজাহান ।

ইহাতে গাজি জুজ হইয়া তাহাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিলেন,

(১) একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক দিল্লীর সাম্রাজ্যের এই সময়ের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি । “Every petty chief, in the mean time, by counterfeited grant from Delhi, laid claim to jagirs and districts ; the country was torn to pieces with civil wars, and groaned under every species of domestic confusion. Villainy was practised in every form ; all law and religion were trodden under foot, the bonds of private friendship and connexions, as well as of society and government were broken ; and every individual could rely upon nothing, but strength of his arm.”

এবং দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে একজন রাজকুমারকে শাহজাহান উপাধি দিয়া বসাইলেন। অপরদিকে আলমগীরের পুত্র আলৌগহর এলাহাবাদে আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া শাহ আলম উপাধি গ্রহণ করিলেন। গাজীর উৎপীড়নে সর্ব সাধারণ অত্যন্ত উত্থিত হইরাছিল ; তাঁহার উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমশঃ এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইরাছিল যে, একদা কতিপয় সৈনিক পুরুষ প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া নগরপথে ও শূন্য শিরে রাস্তাপথে টানিয়া লইয়া যায়। এই সময় তাঁহার মৃত্যু বিভীষিকা উপস্থিত হইরাছিল ; কিন্তু এ অবস্থাতেও গাজি বিরুদ্ধবাদী সৈনিক পুরুষদিগকে অকথ্য ভাষার গালি দিতে বিরত ছিলেন না। অবশেষে সেনানায়কগণের মধ্যস্থতার তিনি পরিত্যাগ লাভ করেন। তিনি আপনাকৃত হইয়াই নৃশংস ভাবে বিরুদ্ধবাদী সমস্ত সৈনিক পুরুষকে তরবারি মুখে সমর্পণ করেন। তাঁহার দুর্ব্যবহারে নগরবাসীরা কেহই তাঁহার পক্ষপাতী ছিল না। এই সব কারণে তিনি আবদালীর গতি-রোধ করিতে পারিলেন না ; তাঁহার আক্রমণে দিল্লী পুনর্বার বিধ্বস্ত হইল। গাজির সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল, তিনি ভয় হৃদয়ে দক্ষিণা-পথে গমন করিলেন। (১)

আবদালীর সৈন্ত গৃহ সকল দগ্ধ ও নরনারীকে হত্যা করিতে লাগিল। রক্ত পিপাসু সৈন্তেরা নির্দোষ নরনারীর রক্তপাতে কিছুতেই বিরত হইল না। অবশেষে তাহারা মৃতদেহ রাশির পুতিগন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া নগর পরিত্যাগ করিল,—নগরবাসীর জীবন রক্ষা

(১) ইহার পর গাজির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইরাছিল। তিনি আর ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তীর্থযাত্রার ছদ্মবেশে দেখা গিয়াছিল।

পাইল। কিন্তু তাহাদের প্রতি বিধাতার অভিসম্পাত ছিল; তাহারা তরবারির মুখ হইতে পরিগ্রাণ লাভ করিয়া দুর্ভিক্ষের ভীষণ গ্রাসে পতিত হইল। দলে দলে নরনারী অনাহারে আপন আপন ভগ্নাবশেষ গৃহমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের এইরূপ দুর্ভবস্থার সময়ে মহারাষ্ট্র নারক পেশওয়া আবেদালীকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিনুগুণ্ডায় মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ ধ্বংস সাধন পূর্বক তদুপরি হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিতে মনন করিলেন।

তদনুসারে তিনি সদাশিব রাও ভাওয়ের সৈন্যপত্যে বিংশতি সহস্র অশারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জাটবীরগণ ও রাজপুতনার রাজ্যবর্গ সসৈন্তে মহারাষ্ট্র বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইলেন। বস্তুতঃ এই অভিযানকে ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃ স্থাপন জন্য সমগ্র হিন্দুজাতির সম্মিলিত অভ্যুত্থান রূপে বর্ণনা করা বাইতে পারে।

মহারাষ্ট্র সেনাপতি দিল্লীতে উপনীত হইয়া দ্বিতীয় শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং স্বপক্ষভুক্ত মোসলমান আমীর ও মরারহের সন্ধেহ দূর করিবার জন্য জাহানবক্ত নামক একজন রাজকুমারকে সিংহাসনে বসাইলেন। এই অর্ধাটীন পাদশাহের শাসনকার্য্যে কৌশল দক্ষতা ছিল? শাসনকার্য্যে দক্ষতা থাকিলেই বা কি হইত? কারণ, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার লোক ছিল না। ফলতঃ বোধ হয় এখন, মহারাষ্ট্র সেনাপতি মোসলমান রাজলক্ষীর অবমাননার নিমিত্তই জাহান বক্তাকে রাজার প্রতিমূর্তিরূপে রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাও দিল্লীতে আপনার ক্ষমতার অপ-

ব্যবহার করিয়া আপামর সাধারণের অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠেন। তিনি মূল্যবান অলঙ্কারের লোভে রাজপ্রাসাদ, সমাধিভবন ও ধর্ম মন্দিরের কারুকাঁচা ধ্বংস করেন। তাও দরবার গৃহের রৌপ্য নির্মিত চক্রাতপ ধ্বংস করিয়া সতর লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হন, এবং রাজসিংহাসন ও অন্যান্য মূল্যবান আসবাব আত্মসাৎ করেন।

হিন্দু জাতিকে মোসলমানের রাজশক্তি চূর্ণ করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের মোসলমানগণ আবদালীর সঙ্গে যোগ প্রদান করিলেন। হিন্দু মোসলমান উভয় পক্ষেই ঘোর যুদ্ধের আরোজন হইল। কিন্তু কেহই অগ্রে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু অবশেষে মহারাষ্ট্র শিবিরে বসদের অভাব উপস্থিত হওয়াতে সদাশিব রাও তাও ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে ভারতের ভাগ্যানির্ধরক পানিপথের বিশাল প্রান্তরে মোসলমান সৈন্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তুমুল যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী মোসলমানের অঙ্ক-নাগিনী হইলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে হিন্দু সম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশাও চিরদিনের জন্য বিসর্জিত হইল। পানিপথের যুদ্ধে পঞ্চাশ সহস্র মহারাষ্ট্র সৈন্য রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। কৈদৃশ বিপুল সৈন্য বিনষ্ট হওয়াতে মহারাষ্ট্র-শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল।

পানিপথের যুদ্ধের পর আবদালী গুরুতর প্রয়োজন বশতঃ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময় মহারাষ্ট্র সেনাপতি সদাশিব রাও কর্তৃক স্থাপিত জাহানবক্ত দিল্লীতে পাদশাহ উপাধিধারী ছিলেন। এবং শাহ আলম পুত্র গর্ত্ত পাদশাহ উপাধি লইয়া এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আবদালী জাহানবক্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাহ আলমকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন না। একজন আবদালী নজব উদৌলাকে দিল্লীতে শাহ আলমের

প্রতিধির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । শাহ আলম শূন্য গর্ত্ত উপাধি লইয়া দীনভাবে অযোধ্যার আধিপতি সুজাদ্দৌলার আশ্রয়ে এলাহাবাদে বাস করিতে লাগিলেন । এই সময় তাঁহার অর্থ কুঞ্জে একশেষ হইয়াছিল ।

একটি ঘটনায় শাহ আলমের অর্থাত্তাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর হয় । ষষ্ঠীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে কুঠি সংস্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতেছিলেন । ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তরুণ বরদ সিরাজদৌলার বাঙ্গলার মসনদে উপবিষ্ট হন । অচিরে তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গলার রাজপুরুষগণের মনোমালিন্য উপস্থিত হয় ; এবং ইংরেজ বণিক দলের সরদার অসন্তুষ্ট রাজপুরুষগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া নবাবকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত করেন, ও সেনাপতি মীরজাফরের মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দেন । ইহাতে বঙ্গদেশে ইংরেজের সর্বময় প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয় । মীরজাফর অকস্মাৎ শাসনকর্তা ছিলেন । একারণ ইংরেজ সরদার তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মীর কাসিমকে শাসনভার অর্পণ করেন । মীর কাসিম স্বাধীনচেতা ছিলেন । তিনি ইংরেজের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন । কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন । এই সময় অর্থাৎ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শাহ আলম শূন্য গর্ত্ত রাজ উপাধি লইয়া এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন ; এবং মহারাষ্ট্র, শিখ, জাট ও রোহিলা সৈন্য গুণ্ড কুলের ঋণ দিল্লীর পর্য্যাসিত মৃতদেহ নখাঘাতে ছিন্ন বিছিন্ন করিতেছিল । যাহা হউক মীর কাসিম যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিয়া শাহ আলম ও অযোধ্যার আধিপতি সুজাদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন । তাঁহারা মীর কাসিমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । এবারও ইংরেজ জয়লাভ করিলেন ; এবং অযোধ্যার নবাব উপাধিস্থর না দেখিয়া

সন্ধির প্রার্থী হইলেন। মীর কাসিমের পর মীর জাফর পুনর্বার বাঙ্গলার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। শাহ আলম ও মুজাফ্ফোর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ কালে তিনিই বাঙ্গলার শাসন কর্তৃপক্ষে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাঙ্গলার নবাব সমস্ত রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, এবং শাসন কার্য্য ও তাঁহার নামে পরিচালিত হইত। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার ভার ইংরেজের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইংরেজ সরদার এই বন্দোবস্ত আপনাদের স্বার্থ বিরোধী মনে করিয়া শাহ আলম ও মুজাফ্ফোর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের সূত্র অবলম্বন পূর্বক বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যের জন্য নূতন প্রণালীর প্রবর্তন করিলেন। সন্ধির স্তম্ভ অনুসারে মুজাফ্ফো এলাহাবাদ ও কোরা জিলা ইংরেজকে অর্পণ করিলেন। ইংরেজ সরদার শাহ আলমকে এই জেলা দুইটী এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ মুদ্রা রাজকর স্বরূপ দিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিলেন। এই বন্দোবস্তে এই প্রদেশত্রয়ের রাজস্ব ইংরেজের হস্তগত হইল ; এবং নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সব বন্দোবস্ত ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

অতঃপর শাহ আলম এলাহাবাদে বাস করিয়া ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তি এবং এলাহাবাদ ও কোরা জেলার উপস্থিত দ্বারা নিঃস্বার্থে উদর পূর্তি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে সাত বৎসর অতিবাহিত হইলে মহা-রাষ্ট্রদ্রোহ আপনাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য শাহ আলমকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর দিল্লী ও তাহার চতুঃপাশ্বে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ প্রতিনিধি নজাব দৌলার যত্নে সমস্ত স্থানে শান্তি সংস্থাপিত হইল। পাদশাহ দিল্লীতে গমন করিলে পুনর্বার বিশ্বখ্যা উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করিয়া ইংরেজ সরদার

তাহাকে মহারাষ্ট্রীয়গণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বলিলেন ; কিন্তু তিনি ক্ষমতা লাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া ইংরেজের নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন । কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে এলাহাবাদের শাস্তি আবাদ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন, তাহা সিক্ত হইল না ; উপরন্তু গোলাম কাদের নামক একজন দুর্বৃত্ত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইল । ইংরেজগণ তাহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন ; এবং কোরা ও এলাহাবাদ জেলাও তাহার হস্তচ্যুত হইল ।

এই সময় রাজধানীর বহির্ভাগে মোগলের কোন আধিপত্য ছিল না । গোলাম কাদের বাহুবলে চতুর্দিক প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সংকল্প করিল ; এবং তজ্জন্ত সৈন্য পরিপোষণ করিয়া অনেক বার করিতে লাগিল । বহুব্যয় নিবন্ধন অচিরে অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইল । তখন গোলাম অর্থ লোভে পাদশাহকে অশেষ বক্সা দিতে লাগিল । এই সময় পাদশাহ আমেদ শাহের পুত্র বেদারবক্ত রাজান্তঃপুরের গুপ্ত ধন্যগার হইতে দশ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া রাজসম্মানের প্রার্থী হইল । গোলাম কাদের তাহাকে লইয়া কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে রাজ-দরবারে উপনীত হইল, এবং সিংহাসনোপবিষ্ট পাদশাহকে নিরস্ত্র করিতে আজ্ঞা দিল । এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে গোলাম কাদের তাহাকে হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিল । এ আদেশও প্রতিপালিত হইল । অতঃপর গোলাম বেদারবক্তের হস্ত ধারণ পূর্বক তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিল । কিন্তু নবাভিষিক্ত সম্রাট তাহাকে প্রতিশ্রুত দশ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহার অর্থ লালসা চরিতার্থ করিতে পারিলেন না । তিনি বলিলেন যে, রাজমহিলা ও রাজকুমারদিগকে নির্যাতন না করিলে গুপ্ত ধনের সন্ধান পাওয়া বাইবে না । একত

গোলাম কাদের রাজকুমার আকবর ও সোলেমান সেকুকে হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বেজাঘাত করিতে আদেশ দিলেন। তারপর দুর্বৃত্ত তাঁহাদিগকে প্রথর রৌদ্রে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিল। ইহাতেও অভীষ্টানুরূপ অর্থলাভ হইল না দেখিয়া গোলাম কাদের রাজাস্তঃপুরের দাসীদিগকে বন্ধন করিয়া তাহাদের হস্ত পদতলে উত্তম তৈল ঢালিয়া দিল। এই ভাবে জুলাই মাসের ২৯এ তারিখ অতিবাহিত হইল। পরদিন দুর্বৃত্ত অনুচরবর্গ দুর্বৃত্ত প্রভুর আজ্ঞায় রাজমহিলাদিগকে ধরিয়া বসিল তাহাদের পবিত্র অঙ্গ কলঙ্কিত করিতেও কুষ্ঠিত হইল না। কিন্তু গুপ্ত ধনাগারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। একত্র ১লা তারিখে শাহ আলমকে যন্ত্রণা দিয়া গুপ্ত ধনাগারের বিষয় অবগত হইবার জন্য পুনর্বার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তিনি গুপ্ত ধনাগারের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহেন বলিয়া দৃঢ়তা সহকারে বারম্বার প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, “তোমার বিশ্বাস যে, আমি রাজকোষের অর্থ গোপন করিয়াছি। আমার নিজের শরীর ভিন্ন অর্থ আর কোথায় রাখিব? তুমি আমার উদর বিদোর্ণ করিয়া সহ্য হও।” গোলাম কাদের অতঃপর পাদশাহকে নানা প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিল। কিন্তু কিছুতেই গুপ্ত ধনের অনুসন্ধান মিলিল না। ইহার পর পাদশাহের বৃদ্ধা মাতা ও অন্যান্য পক্ষকেশী পুরাঙ্গণার লাক্ষ্যনা আরম্ভ হইল। তাহাদের যথাসকল লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। দুর্বৃত্তদের পাণব অত্যাচারে ভাল হৃদয় ছই তিন জন রাজকুমারীর প্রাণ বিয়োগ হইল। এই ঘটনার পরদিন গোলাম কাদের বেদারখানের পার্শ্বে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আলম বিজড়িত ভাবে তাম্রকূট সেবন করিয়া বর্ষরতার পরিচয় দিল। ৬ই তারিখে রাজ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তৎসংযুক্ত

স্বর্ণ রোপ্য আয়সাৎ করা হইল । ইহার পর গোলাম কাদের তিন অহোরাত্রি গুপ্ত ধনের উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রাসাদ তর তর করিয়া অনুসন্ধান করিল । কিন্তু কোন স্থানেই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাওয়া গেল না । সমস্ত প্রয়াস বার্থ হওয়াতে গোলামের ক্রোধের সীমা রহিল না । গোলাম কাদের গুপ্ত ধন বাহির করিয়া দিবার জন্য শাহ আলমকে আদেশ করিল । তিনি গুপ্তধনের বিষয় পূর্ববৎ অস্বীকার করিলেন । ইহাতে গোলাম কাদের ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিল, তোমাকে পৃথিবীতে রাখিলে কোন ফললাভ হইবে না । তোমার দৃষ্টিশক্তি নশ করিব ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া পাদশাহ আবেগ ভরে বলিলেন, “এমন কাজ করও না, এই চোখের সাহায্যে আমি গত ৬০ বৎসর যাবৎ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পাঠ করিয়া আসিতেছি, এখন দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইয়াছে । এই বৃক্ষের চোখ দুইটি রক্ষা করিতে পার ।” গোলাম শাহ আলমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চক্ষু স্পর্শ করিতে সক্ষম রহিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে রাজকুমারদিগকে অশেষ যত্ননা দিতে আরম্ভ করিল । শাহ আলম সেই বিকট দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, আমাকে অন্ধ কর, আমি আর এ দৃশ্য দেখিতে পারি না । এই বাক্য উচ্চারিত হইবা মাত্র গোলাম কাদের সিংহাসন হইতে লক্ষ দিয়া উঠিল ও শাহ আলমকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বহস্তে তাঁহার চোক দুইটি ভুলিয়া ফেলিল । অতঃপর পাদশাহকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল । ইহার কতিপয় দিবস পরে গোলাম কাদের মহারাষ্ট্রে সেনাপতি সিন্ধিয়ার হস্তে অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হইয়া আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল ; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বেদারবক্তুরও রাজনাম ঘুচিয়া গেল । মহারাষ্ট্রীয়গণ অন্ধ শাহ আলমকে কারাযুক্ত করিয়া তাঁহার নামে দিল্লী শাসন করিতে লাগিলেন । এই ভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে

ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক দিল্লী জয় করিয়া অরু ও উপবাসক্লিষ্ট পাদশাহকে হস্তগত করিলেন । ইংরেজগণ তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের অস্ত্র বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন । দিল্লী ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল ।

শেষ ।

শাহ আলমের পৌত্র বাহাদুর শাহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তি উপভোগ করিয়া দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন । এই সময় সিপাহীগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে তিনি তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন । সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ইংরেজ তাঁহাকে এই অপরাধে রেশ্মনে নির্বাসিত করেন । কতিপয় বৎসর গত হইল, এই স্থানে তিনি শাস্তির ক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, এবং ভারত-বর্ষ হইতে তৈমুর বংশের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ।

ক গতা ধরলীপালাঃ সসৈন্তবলবাহনাঃ ।

বিয়োগনাক্ষিণী যেথাং ভূমিরম্মাপি তিষ্ঠতি ॥



মোগল সাম্রাজ্য ।

শাসন ব্যবস্থা ।

ধর্মমণ্ডলী নরপতি নির্বাচন করিবেন ; এবং কোরাণের আদেশ উৎকট ভাবে উল্লঙ্ঘন করিলে সে নরপতি পদচ্যুত হইবেন, ইহাই এসলাম ধর্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা । কিন্তু কার্যকালে মোসলমান জাতির রাজপদ বংশানুক্রমিক ও রাজার ক্ষমতা অধিক । মোসলমান নরপতি এসলাম ধর্মশাস্ত্রের বিধান প্রতিপালন করিবার জন্য লোকতঃ ধর্মকৃৎ দায়ী । কিন্তু তিনি পদে পদে সে বিধান উল্লঙ্ঘন করিলেও তাঁহাকে পুনর্বার তাঁহার অঙ্গুগত করিয়া তুলিবার কোন পন্থা নাই । প্রকৃতি-পুঞ্জ বিদ্রোহ অবলম্বন ব্যতীত আর কোন উপায়েই রাজার তাদৃশ স্বেচ্ছাচারের গতিরোধ করিতে পারে না ।

ভারতবর্ষের মোগল নরপতিগণও রাজ্যশাসন ব্যাপারে কোন নিয়মাধীন ছিলেন না । তাঁহার স্বেচ্ছামত রাজকাণ্ড পরিচালনা করিতেন । তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে আদেশ প্রদান করিতেন, তাহাই সর্বসাধারণকে শিরোধার্য্য করিতে হইত । কি সর্বশ্রেষ্ঠ আমীর, কি নগণ্য কৃষক, সকলেরই ধনপ্রাণ তাঁহাদের অঙ্গুলিসঞ্চালনে মূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইত । বিদ্রোহ অবলম্বন ব্যতীত ইহার প্রতিরোধ করিবার আর কোন উপায়ই ছিল না । কলতঃ ভারতবর্ষের মোগল শাসন প্রণালী স্বেচ্ছামূলক ছিল ।

বাবর সসৈন্তে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাহুবলে লোদি বংশের হস্ত হইতে রাজ্য অধিকার করেন । আফগান নরপতিগণ ভূস্বামী ছিলেন । তদনুসারে বাবরও দেশের সমস্ত ভূমির অধিকারী (Proprietor)

হন । এই ভূমির রাজস্বই মোগল নরপতিগণের অতুল ঐশ্বর্যের মূল কারণ ছিল । প্রথমে প্রকৃতিপুঞ্জ কেবল মাত্র অশ্বাবর সম্পত্তি ও নগর ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিল ; কিন্তু রাজকর্মচারিগণ রাজার অনুমতি ব্যতীত তাদৃশ সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী নিয়োগ সম্বন্ধে চরম পত্র দ্বারা কোন প্রকার নির্ধারণ করিতে পারিতেন না । কিন্তু কালবশে এ প্রথাও কথঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছিল । মোগল পাদশাহগণ কোন কোন কার্যের জন্য রাজপুরুষদিগকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি প্রদান করিতেন । রাজপুরুষগণ ইচ্ছামত এই সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিতে পারিতেন, এবং কোন রাজপুরুষ মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অন্তরূপ নির্ধারণ করিয়া না গেলে তদৌর সম্ভানবর্গ কোরাণের নির্দেশ মত সমস্ত সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতেন । এইরূপ ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল । কিন্তু ইচ্ছা করিলেই নরপতিগণ পূর্বোক্ত জায়গীর সকল বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন ; তাহার প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না । কোন কোন পাদশাহ বোষণাপত্র প্রচার করিয়া জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ; অনেক স্থলে তাঁহাদের তাদৃশ কার্যের সমর্থনও করা যাইতে পারে । সাম্রাজ্যের স্বামিত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে রাজকুমারগণ সেনাপতিদিগকে বশীভূত রাখিবার জন্য বিনা বিচারে জায়গীর দান করিতেন । দু'একবার রাজবিপ্লবের পরেই পূর্বোক্ত কারণে রাজস্ব বহুলপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত । একজন্ত পাদশাহগণ কখন কখন সাম্রাজ্যকে অর্থহীন হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুরুষগণের বিপ্লবলব্ধ জায়গীর সকল বোষণাপত্র প্রচার করিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ।

পাদশাহগণই সমস্ত প্রকার সাধারণ উত্তরাধিকারী ছিলেন । মূল ধনার সম্ভান বর্তমান থাকিলে তাঁহারা স্বয়ং প্রজার সম্পত্তি কদাচিৎ

গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কোন রাজপুরুষ প্রজাপীড়ন দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জন করিলে পাদশাহগণ তাঁহার মৃত্যুর পর সে সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেন। একপ স্থলে মূল ধনীর সম্মান অথবা ঘনিষ্ঠ আশ্রয়গণ কাজির নির্দেশমত জীবিকা নিকাশের উপযুক্ত বৃত্তি পাইতেন ; তাঁহা-দিগকে রাজকাৰ্য্যেও নিযুক্ত করা হইত। কোন প্রকার ওয়ারীস বিস্ত-মান থাকিলে বণিক, ব্যবসায়ী অথবা শিল্পীগণের সম্পত্তি কখনও বাজে-রাপ্ত করা হইত না।

মোগল শাসনকালে রাজপুরুষগণের মর্যাদা ও সম্মান বংশাশ্রমিক ছিল না। তাঁহারা য য প্রতিভাবলে রাজকাৰ্য্যে প্রতিপত্তি এবং রাজাশ্রমে দরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়া বশরী ও সম্মানভাজন হই-তেন। কোন প্রতিভাশালী রাজপুরুষের বংশ-মর্যাদা থাকিলে তাহা সোণার সোহাগার দ্বারা কায়া করিত ; তাঁহারা বংশ-গৌরবগর্ষিত সন্ন্যাসগণের সমধিক প্রিয়পাত্র হইতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও পদবা রাজকাৰ্য্যের অন্তর্গত ছিল। কেবলমাত্র সৈনিক বিভাগে এই নিরমের ব্যতীর দৃষ্টিগোচর হইত। বিচারক, সাহিত্যবিদ ও বনিকগণ অনেক সময় উপাধিলাভ করিয়া গৌরবাবিষ্ট হইতেন এবং রাজদরবারে আমীর ওমরাহগণের সঙ্গে এক শ্রেণীতে আসন লাভ করিতেন। অভিজাত সম্প্রদায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ; (১) আমীর, (২) খাঁ, (৩) বাহাদুর। সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও সুবাদারগণ আমীরশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। খাঁ উপাধিদারগণ সৈন্য বিভা-গের বিশিষ্ট পদসমূহে নিয়োজিত ছিলেন। বাহাদুরগণ কার্য্যাদিতে বিলাতী নাইট সম্প্রদায়ের অনুরূপ ছিলেন। এই তিন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না।

হিন্দুরাজত্বকালে কর্মচারী ও সৈনিক পুরুষদিগকে পারিশ্রমিক

স্বরূপ ভূমিদান করিবার প্রথা ছিল । দক্ষিণাপথে মোসলমানের প্রবেশ-লাভ করিবার সময় বিজয়নগর প্রভৃতি রাজ্যে এইরূপ জায়গীরের প্রথা বিদ্যমান ছিল । মোসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সৈনিক-গণের পারিশ্রমিক প্রদান করিবার ক্ষম্ত কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাইতে পারে না । ফেরিস্তার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে জায়গীর প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল । ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার রাজত্ব কালের শেষ । পক্ষান্তরে সমসু-ই-সিরাজের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফিরোজ শাহ ভোগলকই (১৩৬৫ খৃঃ) প্রথমে রাজকর্মচারী ও সৈনিক পুরুষদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ জায়গীর প্রদানের প্রথা প্রবর্তিত করেন, এবং ফিরোজের পূর্ববর্তী আলাউদ্দীন (১২৯৫ খৃঃ) এ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন । (১) আমরা পরস্পর বিরোধী বিবরণের বর্ণনা প্রণালী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করি যে, মোসলমান রাজত্বের আরম্ভ হইতেই জায়গীরের প্রথা অমূল্য হইয়াছিল, কিন্তু আলাউদ্দীন এ প্রথার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া কর্মচারী ও সেনাপতিদিগকে নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন ; তাহার পর ফিরোজশাহ ভোগলক আলাউদ্দীনের নিয়ম গ্রহণ করিয়া পুনর্বার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করেন ।

(১) Some ancient Omrahs, who had estates conferred on them in the provinces near the Indus, had, for some time past, refused to supply their quotas to the army, for the maintenance of which they held these estates. Quoted from the reign of Nasiruddin Mamood in Dow's History of Hindostan.

This method (of paying officials) was introduced by Sultan Feroz and remains as a memorial of him. In the reigns of the former rulers of Delhi it had never been the rule to bestow villages

যাহাহউক, বাবর ভারতবর্ষে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া জায়গীর প্রদানের প্রথাই অবলম্বন করেন । তিনি সেনাপতিদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন এবং সেনাপতিগণ এই প্রকার জায়গীরের উপস্থিত দ্বারা অধীন সেনাদিগকে পারিশ্রমিক দিতেন । তুমায়ুনও এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই প্রথার তিনটি দোষ ছিল । প্রথমতঃ অধীন লোকের প্রতি জায়গীর ভোগী সেনাপতিগণের অখণ্ড আধিপত্য সংস্থাপিত হইত, এজন্য তাঁহারা সহজেই বিদ্রোহ অবলম্বন করিতে পারিতেন । দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা জায়গীর ভূমির কর আদায় করিবার সময় অত্যধিক লোভের বশবর্তী হইয়া নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতেন । তৃতীয়তঃ, সেনাপতিগণ যে পরিমাণ সৈন্ত প্রতিপালন করিবার উপযোগী জায়গীর ভোগ করিতেন, তাহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্ত রক্ষা করিতেন এই সব কারণে আকবর এই প্রথা রহিত করিয়া সৈন্তদিগকে নগদ পারিশ্রমিক প্রদান করিবার নিয়ম করেন । তিনি সেনাপতিদিগকে মনসবদার উপাধি প্রদান করেন । তাঁহারা শুণামুসারে দশহাজার, সাতহাজার, পাঁচহাজার কিম্বা তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্তের অধিনায়কত্ব লাভ করিতেন এবং তাহাদের বেতন রাজকোষ হইতে পাইতেন ।

as stipends upon office-bearers * * * * * Sultan Alauddin used to speak of this practice with disapprobation. * * * * * Such a number of pensioners would give rise to pride and insubordination, and if they were to act in concert, there would be danger of rebellion. With these feelings there is no wonder that Alauddin refused to make grants of villages and paid his followers every year with money from the Treasury. * * * * * During the forty years of his reign, he (Firoz) devoted himself to the generosity and benefit of Musalmans by distributing villages and lands among his followers :—*Tarikh-t-Firoz-shahi* by Shams-i Siraj Afif.

অধীন সৈন্তের সংখ্যানুসারে সেনাপতিদিগকে দশহাজারী, সাতহাজারী প্রভৃতি বলা হইত । সমগ্র সৈন্ত দলে দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের পরিচালনার নিমিত্ত কোন এক নির্দিষ্ট অনুপাতানুসারে সেনা-
নামক নিয়োজিত করিবার নিয়ম ছিল না । প্রত্যেক মনসবদারের অধীন সৈন্তের একাধি পদাতিক ও অপরাক্ষ অশ্বারোহী ছিল । পদা-
তিক সৈন্তের চতুর্থাংশ বন্দুকধারী ও অবশিষ্ট তিরন্দাজ ছিল । মনসব-
দারের অধীন সৈন্ত বাতীত আর এক শ্রেণীর সৈন্ত ছিল । তাহা-
দিগকে আহেদী বলিত । অনেক সময় রণ কুশল অশ্বারোহী সৈনিক
একাকী মোগল সরকারে কর্ম প্রার্থনা করিত ; তাহাদের দ্বারাই এই
সৈন্তদল গঠিত হইয়াছিল । ইহাদের বেতন মনসবদারের অধীন
অশ্বারোহী সৈন্তদের পারিশ্রমিক অপেক্ষা অধিক ছিল । আহেদী
সৈন্তের বেতন গুণানুসারে স্থিরীকৃত হইত । মনসবদারের অধীন
অশ্বারোহী সৈন্তবৃন্দমধ্যে ভারতবাসিগণ মাসিক বিশ টাকা ও মিকুনদের
পশ্চিম তীরবাসিগণ মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইত । তিরন্দাজ
পদাতিক সৈন্তের বেতন মাসিক আড়াই টাকা ও বন্দুকধারী পদাতিক
সৈন্তের বেতন মাসিক ছয় টাকা নির্দিষ্ট ছিল । আওরঙ্গজেব পাদ-
শাহের সময়ে আহেদী সৈন্তের বেতন মাসিক পঁচিশ টাকার ন্যূন ছিল
না । মোগল পাদশাহগণ গোলন্দাজবিভাগে ইউরোপীয়ানদিগকে
নিযুক্ত করিতেন । কিন্তু ধর্ম্মাক্ষ আওরঙ্গজেব এ প্রথার পরিবর্তন
করিয়া মোসলমানদিগকে গোলন্দাজ বিভাগের ভার প্রদান করিয়া-
ছিলেন । যে সকল মনসবদার আমীরশ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, তাহারা
মাসিক দুইশত হইতে সাতশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন । সুবি-
খ্যাত বেণিয়ার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, মোগলাধীন মনসবদার
গণের বৃত্তি যথেষ্ট ছিল । আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল মনসব-

দারগণের মাসিক বৃত্তি যে হার উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম ।

দশ হাজারী—৬০০০০\

আট হাজারী—৫০০০০\

সাত হাজারী—৪৫০০০\

পাঁচ হাজারী—৩০০০০\

চারি হাজারী—২২০০০\

তিন হাজারী—১৭০০০\

দুই হাজারী—১২০০০\

এক হাজারী— ৮২০০\

কেবল মাত্র রাজকুমারগণকেই দশ হাজারী মনসব প্রদান করা হইত । রাজকুটুম্বগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিলে আট হাজারী ও সাত হাজারী মনসবদার হইতে পারিতেন । সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতাশ্রমে জাতিধর্মনির্কিশেধে পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদ পর্যন্ত লাভ করিতে পারিতেন । আকবরের পর বাদশাহগণ পুনশ্চ জায়গীর প্রদানের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন ; এবং ক্রমশঃ জায়গীর ভূমি দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে । এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গীরদারগণ কালক্রমে সম্মিলিত হইয়া বহুসংখ্যক বংশানুক্রমিক স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী রাজ্যের সূত্রপাত করাতেই মোগল সম্রাজ্যের পতন দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিয়াছিল । (১)

মোগলশাসনকালে সৈন্ত-সংখ্যা কত ছিল তাহা যথাযথরূপে নির্দেশ করিবার কোন উপায় নাই । বেণিয়ার সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে, আওরঙ্গজের পাদশাহের দুই লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্ত ছিল । এতদ্ব্যতীত

তিনি গোলদার এবং অশিক্ষিত পদাতিক সৈন্য পরিপোষণ করিতেন । আকবরের সময়ে এতাদিক সৈন্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না ।

মোগল জাতির এক কোরাণ ব্যতীত আর কোন শাস্ত্র-গত অনুশাসন ছিল না । দেশাচার ও যুক্তিমূলক কতকগুলি বিধান প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল ; এসকল বিধানের কথাও লিপিবদ্ধ ছিল । এতদ্বারা কোন কোন বিষয়ের মীমাংসা করা হইত । পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট এই সকল বিধানের মর্ম ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন ।

পল্লীগ্রামে কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে, গ্রাম্য পঞ্চায়েত তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন । কিন্তু প্রত্যেক পরগণায় একজন করিয়া কাজি নিযুক্ত থাকিতেন, এই সকল বিচারক এক এক সময়ে উৎকোচগ্রাহী হইতেন । বিচার্য সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ কাজিদিগকে দিতে হইত । কাজিগণ বিচারকার্য তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিতেন । কোন কাজি বিচার বিভ্রাট ঘটাইলে ও সে সংবাদ পাদশাহের কর্ণগোচর হইলে অভিযুক্ত কাজির গুরুদণ্ড হইত । এজন্য তাহারা অধিকাংশ স্থলেই ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিতে সাহসী হইতেন না । কোন বিবাদে উভয় পক্ষই হিন্দু অথবা মোসলমান হইলে কাজিগণ অপক্ষপাতে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতেন, কদাচিৎ কোথায়ও বিচার বিভ্রাট ঘটাইতেন । কিন্তু এক পক্ষ হিন্দু ও অপর পক্ষ মোসলমান হইলে অনেক সময় হাস্যকর বিচারাভিনয় হইত । কেবল মাত্র ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকেই কাজি নিযুক্ত করিবার জন্য কোরাণের কঠোর অনুশাসন আছে । এজন্য অনেকস্থলে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণই কাজির পদে নিযুক্ত হইতেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে । কাজির বিচারকালে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য মুফতি নামক এক শ্রেণীর শাস্ত্রবিদগণ নিযুক্ত থাকিতেন ।

সমাজ, ধর্ম ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে হিন্দুদিগকে কাজির বিচারের অধীন হইতে হইত না। তাহার মীমাংসার জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল।

কাজিগণ কোন অপরাধের নিমিত্ত প্রাণ দণ্ডের বিধান করিলে তাহা সুবাদারের অনুমোদনের জন্ত প্রেরণ করিতে হইত। এইরূপ অনুমতি না পাইলে সে আদেশ কার্যে পরিণত করিবার নিয়ম ছিল না। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন বিবাদে অর্থী প্রত্যর্থী সন্তুষ্ট না হইলে তাহারা উর্দতন আদালতে অভিযোগ করিতে পারিত। এখানে স্বয়ং সুবাদার বিচারকার্য নিরূহ করিতেন। রাজধানীতে তিনজন উচ্চপদস্থ বিচারকর্তা প্রজাগণের অভিযোগের মীমাংসা করিতেন। তাঁহারা আসেসরগণের সাহায্যে আপীল অথবা প্রথম অভিযোগের বিচারকার্য সমাধা করিতেন।

এতদ্ব্যতীত মোগল পাদশাহ স্বয়ং প্রকৃতিপুঞ্জের অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া তাহার যথাযোগ্য প্রতিকার করিতেন। অভিযোগের বিষয়টি সরল ও স্পষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করা হইত। কিন্তু বিষয়টি জটিল হইলে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ ও শাস্ত্রবেত্তার অভিমত জিজ্ঞাসা করিবার নিয়ম ছিল। বিচার্য বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সময় সময় মীমাংসার ভার রাজধানীর আদালতের প্রতিও অর্পণ করা হইত। কিন্তু এস্থলেও অর্থী প্রত্যর্থী আদালতের মীমাংসার বিরুদ্ধে পাদশাহের নিকট পুনর্বিচার প্রার্থী হইতে পারিত। পাদশাহ প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে পাত্র মিত্র সহ দরবারে উপবেশন করিতেন। তৎকালে একজন নগণ্য প্রজাও আবেদন পত্র হস্তে উপস্থিত হইলে, পাদশাহ তাহাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ পূর্বক যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করিতেন।

প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ দ্বারা মজি সমাজ গঠিত ছিল। কোন

গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা কালে মন্ত্রিগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার নিয়ম ছিল । মন্ত্রিগণ আপনাদের অভিমত জ্ঞাপন করিতেন, তাহার পর পাদশাহ ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য করিতেন, অথবা মনঃপূত না হইলে তাঁহাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের ইচ্ছামত আদেশ প্রচার করিতেন । তিনি সময়ে সময়ে নিম্ন-শ্রেণীর কর্মচারিগণেরও পরামর্শ জিজ্ঞাসু হইতেন । কোন আদেশ সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার আবশ্যক হইলে তদ্রূপ সম্বন্ধীয় সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত্বনা গ্রহণ করা হইত ।

মোগল সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান রাজপুরুষের নাম উজ্জীর । সমস্ত রাজ-কীর ঘোষণাপত্র ও আদেশলিপি তাঁহার সহি মোহর যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত । উজ্জীরের স্বাক্ষরের পর পাদশাহ তাহাতে স্বীয় চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেন । উজ্জীরের দপ্তর নানা ভাগে বিভক্ত ছিল । প্রত্যেক বিভাগের কার্য পরিচালনের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিয়োজিত ছিলেন । উজ্জীরের হস্তে আর খায় বিভাগের সমস্ত ভার অর্পিত ছিল । তিনি প্রাদেশিক রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন । পদগৌরবে ও ক্ষমতায় উজ্জীরের নিম্নেই মিরবকী । মিরবকী সমস্ত বিভাগের কর্তা ছিলেন । ইনি উজ্জীরের কর্তৃত্বাধীন ছিলেন না । প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন । আবুল ফজল আকবরের সময়ের প্রত্যেক বিভাগের নিদিষ্ট কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । রাজ-কোষ ও টাকশালের বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃগন্ধ, ফল ও পুষ্প সংক্রান্ত কার্যালয়, রন্ধনশালা এবং কুকুর খানা পর্যন্ত প্রত্যেক বিভাগের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এই বিবরণ পাঠ করিলে নয়ন সমক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও বৈভবের চিত্র উজ্জল হইয়া উঠে, এবং তাহাতে সহজেই পাঠকের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে ।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রদেশ সমূহের শাসন সংরক্ষণ জন্য এক এক জন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের উপাধি সুবাদার বা নিজাম ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রবল ক্ষমতা ও তুর্দান্ত প্রতাপ ছিল। যদিচ শাসনকর্তৃগণ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে পাদশাহী নিয়মাবলী ছিলেন, তথাপি তাঁহারা অনেক সময়ে এক এক জন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার ন্যায় কার্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বৎসরান্তে নিরূপিত রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করিলে পাদশাহ তাঁহাদের কৃত কার্যে আর হস্তক্ষেপ করিতেন না। পাদশাহের অনুমতি সাপেক্ষে তাঁহারা ভূসম্পত্তি দান করিতে পারিতেন। সৈনিক ও অন্যান্য বিভাগের সমস্ত কর্মচারীর বহাল বরতরফ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কেবলমাত্র যে সকল কর্মচারী পাদশাহী নিয়োগক্রমে কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে সুবাদারগণ পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কোন কোন কর্মচারী অত্যাচারণ করিলে পাদশাহের আদেশ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসন কর্তৃবর্গের ছিল। বিচারকর্তৃগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে সুবাদারগণই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। দেশের শান্তি ও রাজশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য সুবাদারগণ সর্বতোভাবে দায়ী ছিলেন। দেশের রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ানের উপর অর্পিত ছিল। রাজস্ব সংগ্রহ কার্যে সুবাদারগণের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু কেহ রাজস্ব সংগ্রহকালে প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহারাই দায়ী ছিলেন। শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীর ব্যয় দেওয়ানের মারফৎ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে গ্রহণ করিতে হইত।

পদগোরবে ও ক্ষমতায় সুবাদারের নিম্নেই দেওয়ান। দেওয়ান পাদ-

শাহী নিয়োগক্রমে নিযুক্ত হইতেন, তিনি কোন বিষয়ে সুবাদারী কর্তৃত্বাধীন ছিলেন না । রাজস্ব, শুল্ক, ও অন্যান্য রাজকর সংগ্রহের ভার দেওয়ানের হস্তে অর্পিত ছিল । দেওয়ান দেশের শাসনসংক্রান্ত নিরূপিত ব্যয় সুবাদারের নির্দেশ মত প্রদান করিয়া উদ্বৃত্ত রাজস্ব রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন । দেশের আর বায়ের হিসাব নিকাশের জন্য পাদশাহী সরকারে দেওয়ানই দায়ী থাকিতেন । এজন্য সুবাদার কোন প্রকার অত্যাচার করিলে অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত সৈন্য নিযুক্ত করিলে দেওয়ান সে ব্যয় নির্বাহ জন্য রাজকোষের অর্থ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইতে পারিতেন ।

শাসন সৌকার্য্যার্থ এক একজন সুবাদারের শাসনাধীন দেশকে কতিপয় সরকারে, প্রত্যেক সরকার কতিপয় পরগণাতে এবং প্রত্যেক পরগণা কতিপয় দাস্তরে বিভক্ত ছিল । এই সকল বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারিগণ রাজস্ব ও শাসনসংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন ।

প্রত্যেক সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য এক এক জন ফৌজদার রাখিবার নিয়ম ছিল । তাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্য ব্যতীত আপন আপন বিভাগের সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন । সরকার সমূহের শান্তি রক্ষা এবং সুশাসনের ভার ও তাঁহাদের হস্তেই গুপ্ত ছিল । প্রত্যেক পরগণার জন্য দেওয়ানের অধীনে একজন করিয়া ক্রোরী নিযুক্ত থাকিতেন । তাঁহারা দেওয়ানের নির্দেশমত রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্য নির্বাহ করিতেন । ক্রোরীগণের অধীনে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য ফসিলদারগণ নিযুক্ত ছিলেন । বৃহৎ বৃহৎ নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কোতওয়াল নিযুক্ত থাকিতেন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে রাজস্ব কর্মচারিগণই শান্তিরক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিতেন ।

প্রত্যেক পরগণার জন্য এক এক জন কারকুন নিযুক্ত থাকিতেন ।

তাহারা পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত প্রত্যেক কার্যের দৈনিক বিবরণী রক্ষা করিতেন। সে বিবরণীতে শীকদার প্রভৃতি কর্মচারীর স্বাক্ষর রাখিবার নিয়ম ছিল। এই বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার প্রুতি তিন মাস অন্তর রাজধানীতে প্রেরণ করিতে হইত। যাহাতে প্রাচীন রীতি-নীতির অন্তথাচরণ,— নূতন বাজেকরের প্রবর্তন এবং অন্য কোন প্রকার পরিবর্তনের সূত্রপাত হইতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য পরগণা সমূহের কারকুনগণ আদিষ্ট ছিলেন। শীকদার প্রভৃতি কর্মচারিগণের কাগজ পত্র যথাযথরূপে লিখিত হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার ভারও তাহাদের হস্তেই সমর্পিত ছিল। কারকুনগণ যে সকল বিবরণী রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন, তাহার মর্ম্ম রাজস্ব বিভাগের দপ্তরে সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত ছিল। ইহার ফলে দেওয়ানগণ হিসাব নিকাশ প্রদান করিবার পূর্বেই পাদশাহ সুবা সমূহের রাজস্ব সংক্রান্ত আয় ব্যয়ের সমস্ত বিবরণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন। এজন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়ানগণের অপকার্যের প্রতিরোধক ছিল এবং তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে স্ত্রায় পথে প্রতিষ্ঠিত রাখিত।

মোগল পাদশাহ ইচ্ছাক্রমে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিতে পারিতেন। যথেষ্টমূলক শাসনপ্রণালীবদ্ধ রাজ্যে এরূপ নিয়ম প্রয়োজনীয়। জ্যেষ্ঠ-পুত্রই উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু পাদশাহের ইচ্ছা হইলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিত। নানা কারণে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মোগল রাজপুত্রগণের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যলাভের আশা তাহাদিগকে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও পিতার অনুগত করিয়া রাখিত। একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনাধিকারী, এসম্বন্ধে কোন ধরাবাধা নিয়ম না থাকাতে রাজপুত্র মাত্রেই রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। এজন্য মোগল পাদশাহের মৃত্যুর পর রাজবিপ্লব

উপস্থিত হইত । এই বিপ্লবকালে প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্যবৃন্দ যে রাজকুমারের পক্ষ অবলম্বন করিত, তাঁহারই রাজসিংহাসন লাভের সমধিক সম্ভাবনা থাকিত । সুতরাং রাজকুমারগণ পিতার জীবদ্দশাতেই প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্যবৃন্দের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত রাখিবার কল্পনার অনেক সময়ে সম্পূর্ণ অবলম্বন করিতেন এবং প্রতিভা ও কার্যকুশলতার পরিচয় দিতে যত্নশীল হইতেন । যথেষ্টামূলক শাসনপ্রণালীবদ্ধ রাজ্যের অধিপতি তরুণ বয়স্ক অথবা দুর্বলচিত্ত হইলে তাহার বিপদ অবশ্যসম্ভাবী । এই সব কারণে মোগল পাদশাহের উত্তরাধিকারী নিয়োগের ক্ষমতা প্রয়োজনীয়ই ছিল ।

আমরা এখানে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার যে রেখাপাত করিলাম, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে রাজপুরুষগণের পক্ষে বিদ্রোহ অবলম্বন করা সহজ সাধ্য ছিল । মোগল পাদশাহ রাজপুরুষগণের বিদ্রোহ আশঙ্কায় অনেক সময় প্রজাহিতৈষী হইতেন । রাজপুরুষগণের বিদ্রোহ কালে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার পক্ষাবলম্বী থাকিলে তাঁহার সিংহাসন অটল থাকিত । এজন্য মোগল পাদশাহ সন্মাননে প্রজাবৃন্দের হৃদয় আকৃষ্ট রাখিতে যত্নশীল ছিলেন । সার টমাস্ রো লিখিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীর পাদশাহ প্রজারঞ্জনের জন্য প্রত্যহ গবাক্ষ পথে একবার উপনীত হইয়া জন সাধারণকে দর্শন দিতেন ; এ নিয়মের ব্যত্যয় হইত না । কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে তাহা পূর্বেই বিজ্ঞাপিত করিবার নিয়ম ছিল । কারণ সমস্ত প্রজা তাঁহার ক্রীতদাস ভূত্যা ; এজন্য তিনিও পারস্পরিক সম্বন্ধে তাহাদের নিকট এক প্রকার দাসত্বে আবদ্ধ ছিলেন । তিনি এক দিন দৃষ্ট না হইলে অথবা তাঁহার অনুপস্থিতির উপযুক্ত হেতু প্রদর্শিত না হইলে প্রজাগণের বিদ্রোহ অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা ছিল । এই বিবরণ হইতে অনুমিত হইবে যে, মোগল পাদশাহের পক্ষে প্রজারঞ্জন করা

কীদৃশ প্রয়োজনীয় ছিল। স্বৈচ্ছাচারী রাজার সিংহাসন প্রজা প্রীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা কখনও স্থায়ী লাভ করিতে পারেনা। দৌরাখ্য ও অত্যাচার যথেষ্টমূলক শাসন প্রণালীর প্রকৃষ্ট নীতি নহে। যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় রাজভক্তিতে উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়া স্বৈচ্ছাচারী রাজার সিংহাসন অভিসিক্ত করিতে পারে, তদুপায় অবলম্বন করাই ষথার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য। মোগল পাদশাহগণ এই আদর্শে রাজ্য-শাসন করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিভাশালী দয়ার্জচিত্ত প্রজারঞ্জক পাদশাহগণের সুশাসনে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ন্যূনাত্মিক দেড়শত বৎসর কাল উহার মহিমা ও প্রাধান্য অটুট থাকে। বাবর ভারতের প্রথম মোগল পাদশাহ। তিনি অসি হস্তে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া হিন্দুস্থানে মোগলের বিজয় পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উদারচেতা পুরুষসিংহ সে অসি কখনও প্রকৃতিপুঞ্জের রক্তে কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি বিজিতদেশ শাসন করিতেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বার্থপরতা দয়াধর্ম্য বিবর্জিত ছিল না। এজন্য তিনি দেশ শাসনোপলক্ষে কখনও অত্যাচারের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই, পরন্তু তাহাদের মঙ্গল বিধান জ্ঞাত মনোবোগী ছিলেন। তাঁহার ভারতগমন পরস্ব লুণ্ঠন জ্ঞাত আকস্মিক আক্রমণ নহে। তিনি দেশের রাজস্বই আপ-নার অতুল অধ্যবসায় ও উৎকট পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বাবর সেনাপতিদিগকে পারিশ্রমিক প্রদানকালে কখনও হস্ত সঙ্কুচিত করেন নাই। এজন্য তাঁহারা রাজপ্রদত্ত অর্থেই পরিতৃপ্ত ছিলেন। বাহাডুঘর ও রূপৈশ্বর্যপ্রিয়তা বাবরের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। এজন্য রাজ্যের স্বাভাবিক আয়ই তাঁহার সমস্ত অভাবমোচনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি কখনও বিজয়াধীন প্রকৃতিপুঞ্জের ধননান্যের

প্রতি ঈর্ষ্যা কলুষিত নয়নে দৃষ্টিপাত করেন নাই । যে সকল বীরপুরুষ হিন্দুস্থানে মোগলের বিজয় বৈজয়ন্তি বহনকার্য্যে বাবরকে সহায়তা করিয়া ছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার চরিত্রবলে সঙ্কুচিত ছিলেন । এজন্য তাঁহারাও প্রকৃতিপূজার সঙ্গে ব্যবহার কালে সদাশয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিতেন ।

বাবরের পুত্র হুমায়ুন প্রতিভাবিত বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন না । কিন্তু তাঁহার প্রজাপ্রীতির অভাব ছিল না । তিনি নিজে কখনও প্রজার শোষণ কার্য্যে হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই । হুমায়ুনের মস্তক হইতে দুর্দান্ত শের শাহ ব্রাজমুকুট কাড়িয়া নিয়াছিলেন । এই সময় ভারতবর্ষের প্রকৃতিপূজা হুমায়ুনের পক্ষপাতী ছিল না । রাজ্যচ্যুত হইবার পর তাঁহার দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল ; প্রকৃতিপূজা তাঁহার অনুরাগী থাকিলে তাঁহার তাদৃশ কষ্টভোগ করিতে হইত কি না, সন্দেহের স্থল । তিনি সপ্তদশ বৎসর কাল তরঙ্গ সঙ্কুল নদীগর্ভে নিমজ্জিত তৃণখণ্ডের ন্যায় নানা স্থানে বিক্লিষ্ট হইয়া অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে সিংহাসন পাতিয়া ছিলেন । এ সময়েও তিনি প্রকৃতিপূজার পূর্ব্ববিরাগের প্রতিশোধ লইতে উৎসুক হন নাই ।

হুমায়ুনের পুত্র আকবর প্রজাপ্রীতির মোহনমন্ত্রে ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং ন্যায় ধার্ম্মানুমেদিত পথে প্রজা পালন করিতে সর্ব্বদা যত্নবীল ছিলেন । তিনি রাজার বিনা অনুমতিতেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা প্রজাবর্গকে অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে রাজপুরুষগণের শোষণ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিনিয়োগ বিধানের প্রণয়ন করেন ।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর অস্থিরমতি নৃশংস নরপতি ছিলেন । কিন্তু তাঁহার হৃদয় একবারে কোমলতা বর্জিত ছিল না ; এবং তাঁহার শাসন

কার্য পিতৃ অন্তর্ভুক্ত পথেই পরিচালিত হইয়াছিল । তিনি প্রত্যেক্ষণের
 ক্ষণ অপক্ষপাতে স্ত্রীর বিচার করিতেন । এমন কি, স্ত্রীর বিচারের ক্ষণ
 তিনি প্রথম মহিষী নূরজাহানের পালিত পুত্রকে হস্তীর পদতলে পেষণ
 করিতেও কুণ্ঠিত চন নাই ।

• জাঙ্গারের পুত্র শাহজাহান রাজনীতি বিশারদ বিচক্ষণ নরপতি
 ছিলেন । সুপ্রসিদ্ধ ট্যাভারনিয়ার লিখিয়াছেন যে, শাহজাহান অপত্য
 নির্কিংশেবে প্রজাপালন করিতেন ।

শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব কূটনীতিবিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্তা
 ছিলেন । তিনি আপনার গল্গলী পথ নিরঙ্কুশ করিবার জন্য পাপে দ্বিধা
 শূন্য ছিলেন । তাঁহার গুপ্ত বিষ প্রয়োগে অনেকের ইহলীলার শেষ হইয়া-
 ছিল । তাঁহার ধর্ম্মাকতার হিন্দুগণ অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াছিল । কিন্তু
 ইহা সর্ব্বো আওরঙ্গজেব নিজে কখনও প্রজার ধনবস্তুর প্রতি কুটিল
 কটাক্ষপাত করেন নাই এবং রাজপুরুষগণের শোষণ ও অত্যাচার হইতে
 তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন । তিনি ভ্রাতৃরক্তে
 পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া ছিলেন, কিন্তু জীবনে আর কখনও প্রকাশ্যভাবে
 নৃশংস আচরণের পরিচয় প্রদান করেন নাই । মির আতইআলম নামক
 গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি কখনও কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ
 প্রদান করেন নাই ।

মোগল শাসনকালে প্রকৃতিপুঞ্জ পরমস্বখে কালান্তিপাত করিয়াছে,
 তাহার কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করে নাই ; ইহা প্রতিপন্ন
 করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে । আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, মোগল
 পাদশাহগণ প্রজা হিতৈষী শাসনকর্তা ছিলেন । প্রজার হিতকর বিধান
 প্রণয়ন করিলেই তাহা প্রতিপালিত হয় না ; তাহার প্রতিপালন ক্ষণ
 তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । সর্ব্বদা সক্রিয়গ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া

বাদশাহগণ সকল সময়ে রাজপুরুষগণের কার্যে স্ফুর্নাস্ফুর্ন দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না । এজন্য নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিত । বিশেষতঃ আওরঙ্গ জেবের বংশধরগণ প্রজাপালনে অপটু দুর্বলচিত্ত শাসনকর্তা ছিলেন । তাঁহারা সর্বদা বিলাসশ্রোতে ভাসমান থাকিতেন, এবং ছরাকাজক মন্ত্রিসমাজের কার্যানুমোদন করিয়াই আপন আপন রাজকীয় কর্তব্য সমাধা করিতেন । এই নির্জীব রাজত্ববর্গ মন্ত্রীগণের কর ধৃত সূত্রাবলম্বনে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, এবং কোন কারণে সে সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেই তাঁহারা ভুলুষ্ঠিত হইতেন । এই সব কারণে মোগল শাসনের শেষভাগে দেশ মধ্যে অরাজকতার রাজত্ব ছিল ।

রাজস্ব ।

অসাধারণ বৈভবশালী মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ অবগত হইবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে । সুদৃশ্য রাজ দরবার, বিপুল সৈন্য, অসংখ্য রাজ কর্মচারী, সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ অভিজাত সম্প্রদায় এবং রাজ পরিবারবর্গের ভোগবিলাসের জন্য পাদশাহগণ প্রভূত ধন ব্যয় করিতেন । তাঁহারা এই প্রভূত ধন কি ভাবে সংগ্রহ করিতেন, তাহা আলোচনার যোগ্য । ভূমির রাজস্বই রাজস্বের প্রধান অংশ । আমরা এখানে তাহার একটি তালিকা প্রদান করিলাম ।

আকবর	১৫৯৪	...	১৬৫৬৮৮০০০
• ঐ •	১৬০৫	...	১৭৪৪৮৮০০০
জাহাঙ্গীর	১৬২৭	...	১৭৪৯৩৩০০০
শাহজাহান	১৬২৮	...	১৬৬৬৬৬০০০
• ঐ •	১৬৪৮	...	২২০০০০০০০
ঐ	১৬৫৫	...	২৬৭৩৭৭০০০

আওরঙ্গজেব	১৬৬০	...	২২৫৮৬৬০০০
ঐ	১৬৬৬	...	২৩৭৩৩৩০০০
ঐ	১৬৬৭	...	২৭৪২২২০০০
ঐ	১৬৯৭	...	৩৮৭১১১০০০
ঐ	১৭০৭	...	৩০১৭৭৭০০০

মোগল শাসনাধীনে ভূমির রাজস্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আকবর শাহেব রাজস্বের শেষভাগে ভূমির রাজস্ব ১৬৫৬৮৮০০০ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব পাদশাহের চরমোন্নতির সময় উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিত হইয়া ৩৮৭১১১০০০ টাকায় পরিণত হয়। করদ-রাজ্য সমূহ হইতে পাদশাহগণ যে রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও এই তালিকায় গ্রহণ করা হইয়াছে। দক্ষিণাপথের স্বাধীন মোসলমান রাজ্য সকল করদরাজ্যে পরিণত হওয়াতেই ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৬৬০ ও ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ কালে অন্তর্বিপ্লবে সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়াছিল, এবং তারপর ভারতবাসী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; ইহাই ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব হ্রাস পাইবার কারণ। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ ও দক্ষিণাপথের অরাজকতা নিবন্ধন ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। শাসনকার্য্য সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া, রাজকোষে পাদশাহগণের নিজ ব্যয় জন্য কি পরিমাণ অর্থ উদ্ভূত থাকিত; আমরা তাহা নির্ণয় করিতেছি। মির আতাই আলম নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থকর্তা বলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্ব ২৩১১৪২৯০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, তন্মধ্যে পাদশাহগণ নিজ ব্যয় নির্বাহার্থ (খালেসা) ৪৩১২২৫০০ মুদ্রা গ্রহণ করিতেন। সৈনিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য (জায়গীর) ১৮৭২৪৩

৩০০ মুদ্রা নির্দিষ্ট ছিল। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া, রাজকোষে সমগ্র রাজস্বের ষষ্ঠাংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত সঞ্চিত হইত।

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য উপায়ে কত মুদ্রা মোগল রাজকোষে সঞ্চিত হইত; তাহা অবধারণ করার ক্ষুদ্র উপায় নাই। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আকবর শাহ আটত্রিশ প্রকার কর রহিত বা হ্রাস করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব পাদশাহের রাজত্বের প্রারম্ভে অন্তর্কিবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত ও ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি আশি প্রকার কর রহিত করিয়াছিলেন। ইতিহাসবেত্তা খাফি খাঁ বলেন যে, ভূমির রাজস্ব ব্যতীত অন্য উপায়েও কোটী কোটী মুদ্রা রাজকোষে আনীত হইত। আকবর শাহ যে সকল রাজকর রহিত বা হ্রাস করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব তাহার কতকগুলি পুনঃস্থাপিত বা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব মোসলমান পণ্যজীবীদিগকে গুরু হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এই নিয়ম পরিবর্তন করিয়া হিন্দুরা যে পরিমাণ গুরু দিত, তাহার অর্ধেক মোসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ভূমির রাজস্ব ব্যতীত নানা প্রকার হাসিল মাণ্ডল (Tolls), কর (Tax) ও অতিরিক্ত কর (Cess.) হইতে মোগল রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হইত; কিন্তু সাময়িক মোসলমান ইতিহাস লেখকগণ তাহার কোন তালিকা প্রদান করেন নাই। আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃস্থাপিত করিলে, রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাদশাহ সর্বদা যে সকল মহাৰ্ষ দ্রব্য উপহার পাইতেন, তাহা হইতেও প্রচুর অর্থ লাভ হইত। মোসলমান লেখকগণ অন্যান্য বিষয়ক রাজস্ব সম্বন্ধে লেখনী

চালনা করেন নাই। কিন্তু আমরা বৈদেশিক পর্য্যটকগণের নিকট হইতে কিছু তথ্য পাইতে পারি। উইলিয়ম হাকিন্স সাহেব জাহাঙ্গীর পাদশাহের সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন যে জাহাঙ্গীর পাদশাহের রাজত্বকালে ১৬০৯ হইতে ১৬১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার্ষিক পঞ্চাশ কোটি টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত ছিল। ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত অর্থ এই হিসাবে ধৃত হইয়া থাকিলে, তাঁহার উক্তি অত্যধিক অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। বৈদেশিক চিকিৎসক কাক্র বলেন যে, আওরঙ্গজেব অন্যান্য উপায়ে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাহা ভূমির রাজস্ব হইতেই ন্যূন ছিল না। কেবল মাত্র এক সুরাট হইতেই আওরঙ্গজেব প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা লাভ করিতেন। ডাক্তার জিমিলি কেরারি দক্ষিণাপথে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, মোগল রাজ্য সমস্ত রাজস্ব বাবদ আশী কোটি টাকা পাইতেন। আমরা পূর্বো-
ল্লিখিত তালিকায় দেখিয়াছি যে, ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ৩৮৭১১১০০০ টাকা ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধিষ্ট ছিল। আমরা এই তিনজন বৈদেশিক পর্য্যটকের বিবরণে ঐক্য দেখিতেছি। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মতানুসারে ভূমির রাজস্ব যে পরিমাণ নির্দ্ধিষ্ট ছিল, মোগল পাদশাহগণ সর্বসাকুল্যে তাহার দ্বিগুণ রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন। মোগল রাজত্বকালে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে সর্বসাকুল্যে ৩৩১৩৭৭০০০ টাকা রাজস্ব স্বরূপ নির্দ্ধিষ্ট ছিল। তার পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক শতাব্দী পরে উহা ৭৭৪২২২০০০ টাকাতো পরিণত হইয়াছিল।

কাক্র বলেন, ঈদৃশ বিপুল রাজস্ব বিশ্বয়জনক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অর্থরাশি চিরকাল রাজকোষে আবদ্ধ থাকিত না। প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ উহার অধিকাংশ বাহির হইয়া পড়িত, ও পুনর্বার সাম্রাজ্যের সর্বত্র শতমুখে বিস্তৃত হইত। বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের

মোগল সাম্রাজ্য,—ভারতবাসীর অবস্থা । ৩৮৩

অধিকাংশ রাজকীয় বদান্ততার উপর নির্ভর করিত। অসংখ্য রাজ-কর্মচারী ও সৈন্য রাজদত্ত বেতন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত; এবং যে সকল শ্রমজীবী কেবল মাত্র সম্রাটের কার্যে পরিশ্রম করিত, তাহারাও রাজকোষ হইতে জীবনযাত্রা নির্বাহ জন্য অর্থ প্রাপ্ত হইত। নগরবাসী অধিকাংশ শিল্পী মোগলের আদেশে কার্যে নিরত থাকিত। তাহারাও রাজকোষ হইতে অর্থ শোষণ করিত। মোগল পাদশাহগণ শতমুখে এত প্রচুর ব্যয় করিতেন যে, তাহাশ বিপুল আয় সত্ত্বেও তাহারা অতিসামান্য সঞ্চয় করিতে পারিতেন। শাহজাহান পাদশাহের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল, এবং তিনি স্বয়ং রাজকোষে অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন। তথাপি তিনি রাজকোষে নগদ ছয় কোটি মুদ্রাও সঞ্চিত করিতে পারেন নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে কেবল মাত্র তেরলক্ষ টাকা রাজকোষে সঞ্চিত ছিল।

ভারতবাসীর অবস্থা ।

বর্তমান কালে কোন রাজার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাহার শাসনে প্রকৃতি পুঞ্জের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার বিবরণও ঐতিহাসিকগণ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ববর্তী ইতিহাস লেখকগণ সন্ধি বিগ্রহের কথাতেই আপন আপন গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন; এজন্য প্রাচীন কালে দেশের অবস্থা কীদূশ ছিল বহু পরিশ্রমেও তাহার পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। মোগল রাজত্বের ইতিহাস লেখকগণও প্রকৃতিপুঞ্জের কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই, বাদশাহগণের বিবরণ প্রদান করিয়াই স্ব স্ব কর্তব্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মোগল শাসন কালে প্রজার অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান দুঃসাধ্য নহে। আবুল ফজল আইন-ই আকবরী গ্রন্থে ভারতবাসীর অবস্থার বিবরণ প্রদান

করিয়াছেন । মোগল শাসনকালে বহু সংখ্যক ইউরোপীয় পর্য্যটক এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতেও এদেশের তৎকালীন অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহার অনেক বিবরণ জানা যাইতে পারে ।

ভারতবাসীর অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাদের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ও সমাজের দশা কিরূপ ছিল, তাহাই প্রথমে আসিয়া পড়ে । মোগল জাতি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন । মোগল শাসন প্রবর্তিত হইবার কিছুদিন সার্কি তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আফগান প্রভৃতি জাতির আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল । অতএব মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন সার্কি তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই নূতন রাজার প্রতাপে নূতন সভ্যতার সংঘর্ষে এদেশে সমাজ-বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল । মোগল শাসন প্রণালী আফগান শাসন প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল । কিন্তু আফগান শাসন কালে যে সকল কারণে হিন্দুর ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সমাজে পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহা মোগলের সময়েও সমভাবে বিদ্যমান ছিল । সুতরাং আফগানের সংস্পর্শে দেশ মধ্যে যে পরিবর্তনের স্রোত আসিয়াছিল, তাহা মোগলের সময়েও অব্যাহত ছিল । তবে আফগানের সময়ে বাহা অন্ধ-মুকুণ্ডিত অবস্থায় ছিল ; মোগলের সংস্পর্শে তাহাই পূর্ণ বিকশিত হয় । এই বাহা কিছু প্রভেদ । সুতরাং আফগানের শাসনকাল ছাড়িয়া মোগলের সময়ে দেশের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ও সমাজের অবস্থা কিদূর ছিল, তাহা অঙ্কিত করিলে আংশিক চিত্র মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এ কারণ আফগান ও মোগল, উভয় জাতীয় মোসলমানের সংঘর্ষে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে হিন্দুর কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহাই মোটের উপর বর্ণিত হইল । মোগল শাসন আফগান শাসন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি

মোগল সাম্রাজ্য,—ভারতবাসীর অবস্থা । ৩৮৫

এবং রাজ কার্য লাভ সম্বন্ধে উভয় শাসন কাল মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ঘটিয়াছিল । এইজন্ত আফগান শাসন কালে এসব বিষয়ে ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া মোগলের শাসন শুধু ভারতবাসীর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি এবং রাজ কার্য লাভ সম্বন্ধে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, কেবল মাত্র তাহারই চিত্র অঙ্কিত করা হইল ।

মোসলমানের সংঘর্ষে কিরূপ অবস্থাস্থর ঘটিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার পূর্বে তৎপ্রাকালে হিন্দুর ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বলা আবশ্যক । মোসলমান শাসন কালে ভারতবাসীর পূর্ব গৌরব ও সৌষ্ঠব বিলুপ্ত হইয়াছিল । অগ্নি শিখা অদৃশ্য হইয়া গেলে অম্মার ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ; মোসলমান শাসনকালে ধর্ম ও জ্ঞান সর্বত্র ভারতবাসীর তদ্রূপ অবস্থা হইয়া ছিল । কিন্তু দেশে মোসলমানের আধিপত্য স্থাপিত হইবার পূর্বে হইতেই হিন্দুসভ্যতা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । এরূপ হইবার কারণ কি ? বর্ণভেদ প্রথা নিবন্ধন কালক্রমে শাস্ত্র চর্চা ও জ্ঞানানুশীলন এক নাত্র ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল । অলবেঙ্গী লিখিয়াছেন, “উপাসনা, বেদ পাঠ ও হোম প্রভৃতি যে সকল কার্যে ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল, বৈশ্য অথবা শূদ্রের পক্ষে তাহার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল । যদি কেহ এই ব্যবস্থার অন্ত্যথাচরণ করিত, তবে ব্রাহ্মণগণ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, এবং নিয়ম ভঙ্গকারীর জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হইত ।”

ভারতবর্ষের স্বাধীন যুগের ধর্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিয়য়ক গ্রন্থ সমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইত । সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ব্রাহ্মণগণ মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল । ধর্মবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক,

কবি, সকলেই একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছেন । বুদ্ধ বিদ্যায় ক্ষত্রিয়গণের একাধিকার ছিল । কি জ্ঞানানুশীলন, কি শস্ত্র চালনা, কিছুই সঙ্গেই জন সাধারণের সম্পর্ক ছিল না । শাস্ত্র চর্চা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল । অলবেঙ্গনী লিখিয়াছেন যে কোন্ কোন্ বর্ণ মুক্তির অধিকারী, এসম্বন্ধে হিন্দুগণের মধ্যে মতবৈধ ছিল । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্ত্রজাতির বেদে অধিকার ছিল না, একারণ কাহারও কাহারও মতে কেবল মাত্র তাঁহারাই মুক্তি লাভে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেন । আমরা অলবেঙ্গনীর এই লেখা পাঠে অবগত হই যে, তদ্রূপ পূর্বে বৈশ্বজাতির শাস্ত্রাধিকার ছিল, তথাপি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তাহারা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল । ক্ষত্রিয়গণ সর্বদা শস্ত্র বিদ্যা উপার্জনে নিরত থাকিতেন বলিয়া, তাঁহাদের ধর্মচর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের অবসর ছিল না । এইজন্য একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই শাস্ত্র ও জ্ঞানানুশীলন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল ।

যে সকল রত্ন ভোজরাজা অথবা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও বৈশ্ব অথবা শূদ্র ছিলেন না । দেশ চলিত ভাষা তখন ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হইতেছিল । গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইত । কিন্তু ভারতবর্ষের জন সাধারণ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিল । ক্ষত্রিয়গণ অবসরাভাবে গ্রন্থপাঠে মনোবোগী ছিলেন না । কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণই গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন । কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অন্যান্য বর্ণের তুলনায় নগণ্য ছিল । অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকটই সংস্কৃত গ্রন্থগত বিদ্যা অর্গলবদ্ধ ছিল । এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দুর ধর্ম ও জ্ঞান সংকীর্ণ ধাতে বদ্ধনায় পতিত হইয়াছিল ।

এই সময় লোকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানকেই ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করে । দেব দ্বিজের ভক্তি, তীর্থ পর্যটন,

মোগল সাম্রাজ্য,—ভারতবাসীর অবস্থা । ৩৮৭

উপবাস, ব্রত, এই সকলই তখন ধর্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত । দেবতার সংখ্যা ও পূজার আড়ম্বর বৃদ্ধি পাইয়াছিল । ব্রাহ্মণ-বাক্য সর্বত্র পালনীয় ছিল । ব্রাহ্মণ সাধুই হউন বা পাপনিরতই হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া বাইত না ; ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করার জন্যই তিনি সর্বসাধারণের নিকট সম্মানার্থ ছিলেন । লোকে সাধুতা, সত্যবাদিতা, পরমার্থ পরতা প্রভৃতি গুণনিচয় হইতে বর্জিত হইয়াও কেবল মাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মহিমায় জন সমাজে ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত । বস্তুতঃ, তৎকালীন হিন্দুধর্ম “মনুষ্যের হৃদয়কন্দর হইতে স্বাভাবিক শোভায় বিনিঃসৃত হইয়া দিগন্ত প্রমোদিত” করিত না ।

সকল প্রকার শাস্ত্রাপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রই কঠিন ও সারবান পদার্থ । ইহার আলোচনায় গভীর ধীশক্তি ও মনঃস্থিতার আবশ্যক । শ্রায় দর্শনের আলোচনার ব্রাহ্মণগণ চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন ; ভারত-বর্ষের অক্ষর ভূষণ মহাত্মা শঙ্কর আচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন । তাঁহার তিরোভাবের পর আর কোন মৌলিক দার্শনিক ভারত-বর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই । কবিবর মাঘ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শিশুপাল বধ কাব্য প্রণয়ন করেন ; নৈষধ প্রণেতা শ্রীহর্ষ, গীত-গোবিন্দের গায়ক জয়দেব এবং কথা-সরিত-নাগর রচয়িতা সোমদেব দ্বাদশ শতাব্দীতে বিচরণ করেন । ইহাদের পরবর্ত্তী কালে আর কোন উল্লেখ-যোগ্য কবি প্রাদুর্ভূত হইয়া তাবের তরঙ্গ লীলায় এদেশকে আলোড়িত করেন নাই । যদিচ মিথিলা, নবদ্বীপ ও কাশী প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত বিজ্ঞার আলোচনা হইত, এবং রঘুনাথ, রঘুনন্দন, সায়নাচার্য্য প্রভৃতির শ্রায় প্রতিভাশালী মহানহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, তথাপি তৎকালীন পণ্ডিত মণ্ডলী পূর্ববর্ত্তী জ্যোতিষগণের তুলনায় নিম্নতর ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । সমাজের অধঃপতনের সময়ে হিন্দু

প্রতিভা কতদূর পরিপূর্ণ হইতে পারে, তাহারা তাহারই দৃষ্টান্ত হন। প্রাচীন জাতি সমূহ মধ্যে হিন্দু জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রেও সর্কশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পর এই দুই বিজ্ঞানও হৃদশা উপস্থিত হইয়াছিল। উহা গণনা ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসকগণের জীবিকা অর্জনের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। ভাস্করাচার্যের পর আর কোন নামযোগ্য বৈজ্ঞানিক এদেশে প্রাদুর্ভূত হন নাই। প্রভুত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ভাস্করাচার্যের আবির্ভাব কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জয়দেবই চির-কুসুম-বিকশিত সংস্কৃত কাব্য-কাননের শেষ কোকিল, এবং সোমদেবের পর আর কোন উপন্যাস রচয়িতা সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে রত্নরাজি সঞ্চিত করেন নাই।

মোসলমানের আগমন কালে কেবল যে, ধর্ম ও জ্ঞানের অধোগতি ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সামাজিক হীনতা নিবন্ধন জনসাধারণের হৃদয় হইতে স্বদেশানুরাগও তিরোহিত হইয়াছিল। তাহারা দেশের ইষ্টানিষ্টে উদাসীন ও বীতশ্পৃহ ছিল। এইজন্য মোসলমান অসিহন্তে ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইলে জনসাধারণ জনভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ এক পদও অগ্রসর হয় নাই। কেবলমাত্র রাজ্য-বর্গই ক্ষাত্রাধর্ম ও রাজনীতি প্রতিপালন জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর এইরূপ দুর্ববস্থার সময় দেশ মধ্যে মোসলমানের আধিপত্য স্থাপিত হয়; তাহাদের প্রথর শাসনে হিন্দুজাতির সঙ্কীর্ণ ধাতবদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞান শুষ্ক হইয়া পড়ে, এবং সে খাতের কেবলমাত্র কর্দম অবশিষ্ট থাকিয়া ভারতবাসীর কলঙ্কের কারণ হইয়া উঠে।

অলবেরুণী সবজুগীন ও তদীয় পুত্র মামুদের ভারতাক্রমণোপলক্ষে লিখিয়াছেন, “মামুদ দেশের সর্বনাশ করিয়াছেন; যে সকল অদ্ভুত কার্যো ভারতবাসী ধূলিকণার আয় দশদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা মামুদ

কর্তৃকই সংসাধিত হয় । * * * * ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত অবশিষ্ট ভারতবাসী
 কাজে কাজেই সকল শ্রেণীর মোসলমানের বিরুদ্ধে বহুমূল ঘৃণা পরিপোষণ
 করিয়া থাকে । এ কারণেই হিন্দুর বিদ্যা আমাদের বিজিত দেশ পরিত্যাগ
 করিয়া বহুদূরে, এই পর্য্যন্ত আমাদের অনধিগম্য কাশী ও কাশ্মীর প্রভৃতি
 স্থানে পলায়ন করিয়াছে ।” প্রাচীনকালে এদেশে গ্রন্থবিক্রয়ের প্রথা
 প্রচলিত ছিল না । গ্রন্থকর্তৃগণ রাজার অর্থ সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ
 করিতেন । হিন্দুর সিংহাসনে মোসলমানের অধিকার সংস্থাপিত হইলে
 সংস্কৃত বিদ্যা কাশী ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিয়াছিল । হিন্দু
 রাজগণের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের আশ্রয়প্রাপ্ত পণ্ডিত সমাজেরও
 অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল । পণ্ডিত সমাজের অধঃপতনেই আর্য্যধর্ম্ম
 বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সর্বনাশ ঘটিয়াছিল । বিজয়নগর প্রভৃতি কতিপয়
 স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে সে সময়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিপালিত হইতে-
 ছিলেন । কাশী নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা ছিল । কিন্তু
 ইহা সত্ত্বেও সার্ব্বিক পঞ্চ শত বৎসরব্যাপী মোসলমান শাসনকালে ব্রাহ্মণকূলে
 আর তাদৃশ প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয় নাই । এই সময় মধ্যে
 কেবলমাত্র কতিপয় টীকাকার সংগ্রহকার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ।
 সায়নাচার্য্য মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন, ইহারাই এ যুগের অলঙ্কার স্বরূপ বলিয়া
 বিবেচিত হইয়া থাকেন । কিন্তু ইহাদের কেহই মৌলিক গবেষণা প্রদর্শন
 করিতে পারেন নাই । মোসলমান যুগে জয়পুরাধিপতি জয়সিংহের
 আবির্ভাব হইয়াছিল । জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল ।
 এযুগে একমাত্র তিনিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মৌলিক গবেষণা প্রদর্শন
 করিয়া ভারতভূমির বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন ।

ভারতবর্ষে মোসলমান শাসন বহুমূল হইবার পূর্বে ব্রাহ্মণগণের অথও
 প্রভাব ছিল । ব্রাহ্মণের জাতির মধ্যে কেহই তাঁহাদের সমকক্ষ ছিল না ।

তাহারাই সমাজের নেতা ছিলেন। তাহারা কখনও কাহারও অঙ্গুনি সংক্ষেপে পরিচালিত হন নাই। মোসলমান শাসনের আরম্ভ হইতেই ব্রাহ্মণ জাতির হৃদশার সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতেই তাহারা বাহাদিগকে স্নেহ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাহাদিগকে দেশাধিপতি বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য হন। দেশের বিশিষ্ট রাজপুরুষগণ আর তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন না অথবা দেশাধিপতিগণ রাজ্যশাসন বিবধে তাহাদিগের মন্তব্যপ্রার্থী হইতেন না। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তাহাদের অথগু প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মোসলমানের আগমনে তাহাদের এই প্রাধান্য অকস্মাৎ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। তাহারা ~~সাহায্য~~ সাহায্যে বিদ্যালোচনায় উৎসাহিত হইতেন। যে সকল রাজসিংহাসন হইতে ব্রাহ্মণ সমাজের উপর অজস্রধারে প্রীতি ও ভক্তি বর্ষিত হইত, তাহা অতঃপর বাহাদের পদতলে পতিত হয়, তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে কুসংস্কারাপন্ন অপধর্মাবলম্বী বলিয়া অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন। এইজন্য যে সকল ব্রাহ্মণের সামর্থ্য ছিল, তাহারা কাশী ও কাশ্মীর প্রভৃতি দূর স্থানে পলায়ন করেন।

কাশী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের অধিকাংশই এই সময় হইতেই অজ্ঞানানাক্ষকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। মোসলমানের নিকট কি ব্রাহ্মণ, কি নীচ শূদ্র, সকলেই কাফের বলিয়া সমভাবে ঘৃণার পাত্র ছিল। নিম্নশ্রেণীর নিকট হইতে ব্রাহ্মণগণ পূর্ববৎ সম্মান পাইতেছিলেন; কিন্তু তাহাদের সেই পূর্ব মানসিক বল, উদ্ভাবন ক্ষমতা, স্বাধীন চিন্তা ও করণা শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। মোসলমান আগমনে ব্রাহ্মণগণই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ পূর্ববৎ স্ব স্ব ব্যৱ-

সার লিপ্ত ছিল। এমন কি, ক্ষত্রিয়গণও মোসলমানের অধীনে সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রাজদরবারে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, এজন্য তাঁহাদের অবলম্বিত বৃত্তির পুরস্কার ও গৌরব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। এই অবস্থেলায় তাঁহারা আপনাদিগকে অপমানিত বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার ফলে ব্রাহ্মণকুল উদাসীন ও বৈরাগ্য-প্রবণ হইয়া উঠেন এবং দেব দেবী সম্বন্ধে অন্তঃসার শূন্য গল্প প্রণয়ন করিয়া কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য ছিল। বৈশ্য ও শূদ্রের আনুকূল্যেই তাঁহাদের ভরণ পোষণ নির্বাহ হইত। ব্রাহ্মণগণ ধর্মশীল ও জ্ঞানবদ্ধ হিন্দু রাজত্ববর্গের আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জীবিকা অর্জনের জন্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বদান্ততার উপর নির্ভর করিতে হইত। ধর্মের কুসংস্কার বিহীন অংশই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ ছিল। তাহাদের সমস্তোষ উৎপাদন করাই ব্রাহ্মণ জাতির প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য দেশ হইতে ক্রমশঃ নির্বাসিত হইয়াছিল। কিন্তু কুসংস্কার ও সহজ বিশ্বাস দেশ মধ্যে পূর্ববৎ প্রবল ছিল; ইহার প্রসার ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং যে সকল কারণ পরম্পরায় হিন্দুর প্রজ্ঞা উজ্জ্বল মূর্তি পরিগ্রহ করে, তাহার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। আমাদের মত সমর্থনার্থ জ্যোতিষশাস্ত্রের হৃদশার বিষয় উল্লেখ কর্তৃ হইতে পারে। তথা কথিত জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞগণ জ্যোতিষ মণ্ডলের অভিনব রহস্য উদ্ঘাটনে আর ব্যাপৃত থাকিতেন না। তৎপরিবর্তে বার বেলা, বার দোষ এবং শুভদিন নির্ণয়ে ও কোন তিথিতে কোন দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ তাহার রীমাংসাতেই তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইত। ফলতঃ হিন্দুর যাহা কিছু মহৎ, তাহার তিরোভাব হইয়া তৎকালে

— বাহা কিছু তমসাক্ষর তাহাই বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । অবশেষে মোসলমান রাজত্বের শেষভাগে বেদবিষয়িণী প্রজা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল ; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য পড়িবার লোকাভাব ঘটিয়াছিল, কাব্য-রসাস্বাদনের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল । কেবলমাত্র ক্রিয়াকর্ম স্বাক্ষরী তত্ত্ব আরম্ভ করিয়াই ব্রাহ্মণগণ সমাজে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন । এই সময়ের পণ্ডিত সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে একজন হিন্দুদর্শী ইংরেজ লিখিয়াছেন, "The number of learned is not only diminished, but the circle of learning, even among those who still devote themselves to it appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected, and no branch of learning cultivated but what is connected with the peculiar doctrines of the people."

মোসলমান শাসনকালে একদিকে যেমন উপধর্ম সমাজ মধ্যে বহু-মূল, এবং হিন্দুর প্রজা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, অন্যদিকে তদ্রূপ উদার ধর্মের সুশীতল ছায়াও তাৎক্ষণিক ভারতবাসীর শ্রান্তি দূর করিবার ক্ষমতা বিলুপ্তি লাভ করিয়াছিল । নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সবিশেষ গুণী হইলেও তাহার জাতি ও কুল ভদ্রীয় উন্নতির বাধাদায়ক হইত । কিন্তু মোসলমান যাত্রাই সমান । অতি নীচ মোসলমানও কোরাণ পাঠ ও মসজিদে উপাসনার অধিকারী । রাজত্ব ও দাসত্বের মধ্যে কেবলমাত্র প্রণয়ের বাধা-ধান । অনেক ক্রীতদাস কেবল মাত্র বুদ্ধি ও শৌর্য্যবলে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন । এসলাম ধর্মের এই সাম্য ভাবের প্রভাব হিন্দু-সমাজে কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল । খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কতিপয় ধর্ম প্রচারক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সমুদ্র

ঋষিসম্প্রদায়ে দেশের মুখশ্রী প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন । রামানন্দ, কবির, নানক ও চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মনে মোসলমান ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল । ইহারা সকলেই একেশ্বরবাদী ও বর্ণভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন । রামানন্দ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হইতে শিষ্য গ্রহণ করিতেন । কবির জাতিতে জোলা ছিলেন । কবির, নানক ও চৈতন্য সকলেই মোসলমানদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতেন । ইহারা এসলাম ধর্মের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

এই উদার ধর্মের প্রচার প্রভাবে জনসাধারণের ব্যবহৃত দেশচলিত ভাষা সমূহের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল । কবির ও চৈতন্যের উপদেশমালা দেশচলিত ভাষায় গ্রথিত হইয়াছিল । তাহারা জনসাধারণের নিকট তাহাদের ব্যবহৃত ভাষায় ধর্মের উপদেশ প্রদান করিতেন । তাহারা দেশ মধ্যে যে প্রেম ধর্মের বক্তা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধানে দেশ-চলিত ভাষা সমূহও শ্রাবণশীলধারণ করিয়াছিল । তাহারা ধর্ম প্রচারের জন্ত দেশ-চলিত ভাষায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির অথও প্রতাপের দুর্গম দুর্গে প্রবল আঘাত করেন । সে আঘাতে সংস্কৃত ভাষা মৃত্যুদশায় উপস্থিত হয় । এ যাবৎ গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত । অভিনব ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষগণের অভ্যুদয়ে পণ্ডিতগণ দেশচলিত ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন । সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহ জনসাধারণের বোধগম্য ছিল না । জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এ সকল গ্রন্থ রচিতও হইত না । দেশ চলিত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিত হইলে নিরক্ষর লোকের নিকট পাঠ করিলে সেও তাহা বুঝিতে পারে । এক্ষণেই গ্রন্থকারগণ দেশ চলিত ভাষায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন । ফলতঃ মোসলমান শাসনের সময়েই হিন্দী, বাঙ্গলা, উড়িয়া, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ-চলিত ভাষায় পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল ।

কতিপয় ব্রাহ্মণের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা জীবিত ছিল। দেশ-চলিত ভাষার প্রভাবে কালক্রমে ইহার মৃত্যু অনিবার্য ছিল। কিন্তু মোসলমান বিজয়ের ফলে দুই কারণে সংস্কৃত ভাষার বিলোপ ও দেশ-চলিত ভাষার পরিপুষ্টি দ্রুতগতিতে সাধিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, মোসলমান শাসনে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির গৌরব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ইহাদের গৌরব হ্রাস প্রাপ্ত হওয়াতে গৌণ ভাবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ দেশ-মধ্যে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ মোসলমানের সংস্পর্শে হিন্দুগণ বর্ণ বৈষম্য এবং ব্রাহ্মণ জাতির বংশানুক্রমিক প্রাধাত্যের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঈদৃশ মতের প্রভাবে সকল ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারা সকলেই একেশ্বরবাদী ও বর্ণভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কবির, বঙ্গদেশে চৈতন্য, মহারাষ্ট্রদেশে একনাথ এবং পঞ্জাবে নানক বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময়েই অমানিশার অন্ধকার তুল্য জনসাধারণের হৃদয়কন্দর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবার উগ্র বাসনা দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মনে উথিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের রত্নরাজি এতদিন সংস্কৃতভাষার লৌহসিকুকে আবদ্ধ থাকিয়া জনসাধারণের অপ্রাপ্য ছিল। এই সময় এই দুই মহাগ্রন্থ প্রধান প্রধান দেশ চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই সময়ের অমর কবিগণ সকলেই দেশ-চলিত ভাষায় কাব্যমালা গ্রন্থিত করিয়া জনসাধারণের কণ্ঠে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন ; কেহই বর্ণ-বৈষম্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই উদারভাব কেবলমাত্র ধর্ম ও সমাজ সহকীয় সাহিত্যেই আবদ্ধ ছিল। আকবর রাজকার্যে পারস্ত ভাষা প্রবর্তিত করাতে তৎসময় হইতে হিন্দুগণ বহুল পরিমাণে উহার অমুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দেশ-

চলিত ভাষা সমূহের সঙ্গে পারস্তু ভাষার সোসাদৃশ্য ছিল । দেশ-চলিত ভাষা সমূহের স্থান উহাতেও কোন গভীর বিচার আলোচনা হইত না ।

বৈষ্ণব ধর্মের পরিচর্যাতেই যে দেশ-চলিত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, পূর্বোক্ত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক মহাপুরুষগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে দেশ চলিত ভাষার রাজপুতনার চারণগণের হিন্দী গাথা ভিন্ন আর কিছুই রচিত হইয়াছিল না, এবং প্রথম যুগের অধিকাংশ গ্রন্থকারই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন । পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ষষ্ঠাদশ শতাব্দীর পূর্বে কবির বাতীত আরও দুইজন অমর কবির আবির্ভাব হইয়াছিল ; তাঁহারা উভয়েই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন । ইহাদের নাম তুলসীদাস ও সুরদাস । চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল কলকণ্ঠ গায়ক বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই কৃষ্ণপ্রেমে উৎসৃষ্টপ্রাণ ছিলেন । এই গায়ক কুল মধ্যে বিজাপতি ও চণ্ডীদাস সর্বশ্রেষ্ঠ । ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে মহারাষ্ট্র দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছিল না । তুকারাম ও শ্রীধরই সে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহারা উভয়েই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন ।

মোগল পাদশাহগণ প্রজাহিতৈষী শাসন কর্তা ছিলেন । কিন্তু নানা কারণে সুশাসন সহজসাধ্য ছিল না । শাসন সৌকার্য্যার্থ সমগ্র দেশ নানা সুবার বিভক্ত ছিল । সুবার শাসনকর্তৃগণ সুবিধা দেখিলেই স্বাভাব্য প্ররাসী হইয়া উঠিতেন । এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সুবার স্বাধীনতুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণের আধিপত্য বহুমূল ছিল । মহারাষ্ট্রীয়গণ, জাটগণ, শিখগণ এবং ইউরোপীয় বণিকগণ সকলেই স্বাধীনতা প্ররাসী ছিল । সুতরাং সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছরাকাজ্জার স্রোত প্রবাহমান ছিল বলিয়া শাসন কার্য্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিত ।

আমরা ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারি যে, প্রকৃতিপুঞ্জকে দক্ষা ও তত্ত্বের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত ছিল না। অনেক সময় অত্যাচারী রাজপুরুষগণ প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেন। পদচ্যুত সৈন্ত, ব্যবসায়ী দক্ষা ও রাজদ্রোহি-গণে দেশ পরিপূর্ণ ছিল। দুর্বলের অপহরণ করাই ইহাদের ব্যবসায় ছিল। লোক পীড়া অথবা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত, তাহা নিঃস-নেহে বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তৎসম্বন্ধে সুবন্দোবস্তের অভাব ছিল বলিয়াই আমরা অনুমান করি। সিংগরমালুসির প্রদত্ত বিব-রণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মোগল শাসনকালে অপকৃপাতে জায়বিচার করিবার ব্যবস্থা ছিল। বিচারপ্রণালী সরল ও সহজ ছিল; কোন অভিযোগের মীমাংসায় অতিরিক্ত কাল ক্ষেপণ করা হইত না। পল্লীগ্রামে পঞ্চায়তি প্রথায় বিচার কার্য নির্বাহ হইত। ইহাতে সুফল, কুফল, উভয়ই ফলিত। আইনের দোষে অনেক সময়ে সুশাসনের পথে কষ্টক পড়িত। আইনের ব্যবস্থাপ্রণে হত্যা অপেক্ষা মৃত্যুপান অধিক দৃষ্ণীয় ছিল। মোগলমান আইনে অপরাধের তিন শ্রেণী ছিল। (১) প্রথম শ্রেণীতে শরীরে সম্বন্ধীয় অপরাধ, নরহত্যা এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর অপরাধীকে ফরিয়াদী ইচ্ছা করিলে অর্থ গ্রহণ করিয়া মুক্তি দিতে পারিত। (২) মৃত্যুপান, বাস্তিচার ও অপহরণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। প্রথম দুইটি অপরাধ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাতে আপো-সের নিয়ম ছিল না। (৩) তৃতীয় শ্রেণীতে অবশিষ্ট নানা প্রকার অপরাধ স্থান পাইয়াছিল। গর্দভের পৃষ্ঠে পশ্চাৎ দিকে মুখ দিয়া বসিলে আরো-হীর যে অপরাধ হইত, তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। কেহ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলে, সে কার্য তাহার ইচ্ছাকৃত কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত

করা হইত না, কিন্তু কি প্রকার অঙ্গ দ্বারা হত্যা-কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অপরাধের গুরুত্ব নির্ধারণ করা হইত । মোগল আমলে দিল্লীখরগণ খাল খনন ও রাজপথ নির্মাণ বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন । মোগল শাসনকালে গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোডটি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া দেশে জনশ্রুতি রহিয়াছে । বঙ্গদেশের অনেক স্থানে মোগল কৃত রাজপথ ও সেতুর ভগ্নাবশেষ আজ পর্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে । বেণিয়াস সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কৃষি ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাজমহল হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত গঙ্গানদীর উভয় পার্শ্বে অসংখ্য কৃত্রিম খাল এবং খালের ধারে জনাকীর্ণ নগর ও পল্লী এবং শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল ।* রাজস্ব সম্বন্ধে মহানুভব আকবর প্রজার হিতজনক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । হিন্দু রাজত্বকালে ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইত । আকবর তৃতীয়াংশ কর স্বরূপ লইবার নিয়ম প্রবর্তিত করেন । অতএব আকবরের আমলে করের হার বর্ধিত হইয়াছিল । কিন্তু অন্তদিকে উৎপাদনের মূল নানারূপ বাজে কর ও শুদ্ধ তুলিয়া দিয়া প্রজার হিতসাধন করা হয় । জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালেও রাজস্ব সম্বন্ধে আকবরপ্রচলিত প্রথাই স্থির-তর ছিল । আওরঙ্গজেব পাদশাহের রাজত্বকাল হইতে নানারূপ বাজে জমা অবধারিত হইয়া প্রজাপীড়নের সূত্রপাত হইয়াছিল । মোগল শাস-
নের নানারূপ ক্রটি সত্ত্বেও ভারতবাসিগণ শস্যশ্যামল ভারতবর্ষে চাহ অথবা বাণিজ্য লিপ্ত থাকিয়া এক প্রকার সুখেই কাল কটন করিত । বিশেষতঃ, শাহজাহানের শাসনকালে প্রকৃতিপুঞ্জের ভাগ্যে অভূতপূর্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল ।

* পাদশাহ নামা পাঠে জানা যায় যে, শাহজাহান পাদশাহের আমলে কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য রাস্তািনদ হইতে খাল কাটা হইয়াছিল, এবং এই খাল কাটার কার্য পরি-
দর্শন জন্য স্বয়ং পাদশাহ লাহোরে গমন করিয়াছিলেন ।

মোগল শাসনকালে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা কীদূশ ছিল ? মোটের উপর তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলিয়াই আমরা অনুমান করি । আমরা এখানে আকবরের রাজত্বকালে শ্রমজীবীগণের দৈনিক বেতনের হিসাব প্রদান করিলাম ।

স্বত্বধর	১/২৩ পাই—	২৩ পাই ।
রাজমিত্রী	১/৪ ½ " —	১/২৩ পাই ।
বাঁশ ফোঁড়	২৩ " —	
ঘরামি	১/২৩ " —	
ভিত্তি	১/২৩ " —	২৩ পাই ।

আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে ঐ সময়ের প্রধান প্রধান শাস্ত্র সামগ্রীর মণকরা মূল্যের গড় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

পদ্ম	১ ২৩ পাই	মুগের দাইল	১/২৩ পাই
ঘব	১/২৩ " "	ঘৃত	২৮
ভূট্টা	১/৪ ½ " "	তৈল	২১
মুচী চাউল	১০	গুড়	১৮/৪ পাই
জিরা (সব) চাউল	১১	হরিজা	১০
হুগ	১৮/০	সিলাহাতি কাপড় প্রতি গজ	১০
পেরাজ	১/৪ ½ পাই	কদল প্রতিখানা (নিকটে)	১০
মটরের দাইল	১ ২৩ পাই		
গমের মরদা (নিকটে)	১৮		

একজন মরদা ভোজী পূর্ণ বয়স্ক শ্রমজীবির সাধারণতঃ যে পরিমাণ দৈনিক আহার সামগ্রীর আবশ্যক, তাহার একটি হিসাব আমরা এখানে প্রদান করিলাম ।

মোগল সাম্রাজ্য,—ভারতবাসীর অবস্থা । ৩৯৯

জিনিসের নাম		আকবরের সময়ের মূল্য
ময়দা	॥ ৫	৬৯ পাই
দাইল	/৫	৭৩ "
মুত	/১	/ ৩ "
লবন	/১	২৬ "

১/৭৬ পাই

মশলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া আকবরের সময়ে একজন পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তি মাসিক ছয় আনা ব্যয়ে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিত। যে পরিবারের জন সংখ্যা পাঁচজনের (নিজে, স্ত্রী ও তিন সন্তান) অধিক ছিল না, তাহার ভরণপোষণের জন্য মাসিক পাঁচ সিকা মাত্র খরচ পড়িত। এরূপ পরিবারের একজন মাত্র উপার্জনকারী থাকিলেও কষ্টের কোন কারণ হইত না। কারণ একজন সামান্য শ্রমজীবির (মথা, ভিত্তি) মাসিক আয়ও ১৮৮/০ আনার মূল ছিল না। অতএব সে ব্যক্তি আহার সামগ্রীর মূল্য বাদে কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রিক খরচ জন্য প্রতিমাসে দশ আনা করিয়া সঞ্চয় করিতে পারিত। তৎকালে দ্রব্যাদি যেরূপ মূল্যে ছিল, তাহাতে একজন শ্রমজীবির পক্ষে মাসিক দশ আনা সঞ্চয়ই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মোগল শাসন সময়ে ভারতীয় শিল্পীকুলের উন্নতির মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইয়াছিল। মোগলের সংস্পর্শে হিন্দুগণ বিলাসপটু হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই সময়ে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্য-বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই দুই কারণে শিল্পীকুলের অর্থগতির পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাস্কো ডিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। ইহা ভারত

ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা। এই ঘটনা হইতে ভারতবর্ষের বহির্ব্যাগিণী শতমুখে প্রবাহিত হইয়া শিল্পীকুলকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে মসলিন ও কালিকো (১) প্রস্তুত হইত ; তন্মধ্যে বহুদেশে এবং করমণ্ডল উপকূলের উত্তরাংশেই বস্ত্র শিল্পের সমধিক প্রসার ছিল। ঢাকা সুচিকণ মসলিন বস্ত্র প্রস্তুতের প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উত্তরসরকার এবং মসলিপতনের পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ ছিটের কাপড়, কালিকো এবং কিংখাপের জুতা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কার্পাস, পশমী ও রেশমী বস্ত্র বয়নে যে সকল শিল্পী নিরন্তর থাকিত, তাহাদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। মোগলের অধীনে ইউরোপের বস্ত্র বাণিজ্যের পথ সুপ্রশস্ত হওয়াতে ইহাদের সমৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন মোগলমান ইতিহাসলেখক প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ স্বচ্ছন্দতার এবং তাহাদের রমণিগণের স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কারের ননোজ্জ্বল বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক শ্রমজীবির উত্তম শয্যা ও সুদৃশ্য উদ্যান ছিল।

সিবাষ্টিন মণিরক নামক একজন পর্য্যটক ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারি। এই সময় বঙ্গদেশ জাত উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রাচ্য দেশের সর্বত্র বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। তিনি বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীকে বহু জনাকীর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহার জন সংখ্যা দুই লক্ষাধিক ছিল এবং পৃথিবীর সর্বজাতীয় লোক তথায় সৌভাগ্যলক্ষীর অন্বেষণে উপনীত হইত। তিনি লাহোর হইতে মুলতানে গমন করেন ; এই পথের উভয় পার্শ্বস্থ সমগ্র-

(১) Stuff made of Cotton, first manufactured at Calicut.

মোগল সাম্রাজ্য,—ভারতবাসীর অবস্থা । ৪০১

দেশ অমিত ধন ধান্ত পূর্ণ এবং নয়নাভিরাম শ্রামল শস্ত-ক্ষেত্র-শোভিত ছিল। পথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক গণ্ডগ্রাম বিস্তৃত ছিল, এই সকল গণ্ডগ্রামে বহু উৎকৃষ্ট পাছনিবাস মণিরকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তিনি সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত ঠাটনগরে একমাস কাল অবস্থান করেন। এই নগর সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই যে, উহা তৎকালে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং উহার চতুঃপার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে গোধূম, ধান্ত ও কার্পাস জন্মিত। কার্পাস বস্ত্র বয়নে অস্তুতঃ দুই সহস্র তাঁত নিযুক্ত থাকিত। এতদ্ব্যতীত রেশমী বস্ত্র এবং রেশমী ফুল ও উৎকৃষ্ট চর্ম প্রস্তুত হইত।

মন্দিস-লো নামক একজন জর্মান ভ্রমণকারী ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারত-বর্ষে আগমন করেন। এই সময় বরোচ নগর জনাকীর্ণ ছিল; ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই তন্তুব্যবসায়ী ছিল এবং তাহারা গুজরাট প্রদেশে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিত। তিনি বরোচ হইতে আমেদাবাদ গমন করিবার সময় পথিমধ্যে ব্রোদারা নামক আর একটি তন্তুবায় ও চিত্রকর পূর্ণ নগরীতে উপনীত হন। তিনি আমেদাবাদের বৈভব ও সৌষ্ঠব দেখিয়া চমৎকৃত হন। এই নগরের অধিকাংশ শিল্পীই কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত কার্যে নিযুক্ত থাকিত। জর্মান-পর্য্যটক কাহ্নেকে প্রসিদ্ধ সুরাট নগর অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তথায় বিপুল বাণিজ্য-স্রোত প্রবাহিত ছিল। মোগলের রাজধানী লোক-বিশ্রুত আগ্রানগরী আয়তনে ইম্মাহান অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। সমস্ত নগরী সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত রাজপথমালায় পরিশোভিত ছিল। পণ্যবীথিকা সমূহের দ্রব্য-ভাণ্ড দর্শকগণের সমক্ষে পরিদৃশ্যমান রাখিবার জন্য কোন কোন সুপ্রশস্ত রাজ পথ পার্শ্বে খিলান নির্মিত ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত বের্ণিয়ার সাহেব কিয়ৎকালের

অন্য এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি জনসাধারণের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনাকালে আপনার লেখনি সজ্জিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও এক স্থানে ভারতবর্ষকে অতলস্পর্শ গহ্বরের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সমগ্র ইউরোপের স্বর্ণ রৌপ্যরাশি বাণিজ্য-স্রোতে বহমান হইয়া এই গহ্বরে পতিত হইতেছে। তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, ওমরাহগণের, এমন কি, সামান্য সৈনিক পুরুষগণের পরিচ্ছদের শোভা বর্ধন জন্য বহুমূল্য রত্ন ব্যবহৃত হইত, দরিদ্র লোকের স্ত্রী-কন্যাও স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার আচরণ করিত। বের্ণিয়ারের আগমনকালে এদেশের শিল্প ব্যবসায়ীগণ শাল, গালিচা, রেশম ও তুলার কাপড় এবং জরী, স্তবর্ণ ও রৌপ্য খচিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত।

বিদেশজাত যে সকল দ্রব্য বিক্রয় জন্য ভারতবর্ষে আমদানি হইত, বের্ণিয়ার সাহেব তাহার এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

দেশের নাম,	দ্রব্যের নাম,
ইংলণ্ড ও অষ্ট্রাচিয়া দেশ	সীসক।
ফরাসী দেশ	কাপড়।
ভাতিয়ার, আরব্য ও পারস্য দেশ	অশ্ব।
বুখারা ও অষ্ট্রাচিয়া স্থান	আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আরকোট, আপেল প্রভৃতি।
মালদ্বীপ	কড়ি।
মিশর দেশ	গুড়ারের শর্কর, হস্তীদন্ত ও কীতদাস।
চীনদেশ	মৃগনাভি, কস্তুরি ও কাচের বাসন।
সিংহলদ্বীপ	হস্তী, নানাক্রম মশলা ও মুক্তা।

বের্ণিয়ার সাহেব ভারতবর্ষকে ফল-শস্য-পূর্ণ বহুজনাকীর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশকে মিশর দেশ অপেক্ষাও উর্বর বলিয়া

মোগল সাম্রাজ্য,—ভারতবাসীর অবস্থা । ৪০৩

লিখিয়াছেন । তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ধান্য প্রভৃতি আহার্য শস্য ব্যতীত বেশম, তুলা, নীল ও চিনি প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং ভারতবাসিগণের বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইত না বলিয়া, দেশের অর্থ দেশেই থাকিত । বেণিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন যে, বঙ্গ দেশের উৎপন্ন ধান্য দ্বারা স্বদেশের আহারের সংস্থান হইয়া অত্যন্ত দেশের পোষণের কার্য্যও নির্বাহিত হইত এবং সর্বত্রই মৎস্য মাংস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত ।

মোগলমান রাজত্বকালে কি শাসন, কি সৈনিক, উভয় বিভাগেই হিন্দুগণ বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত হইতেন । তাঁহারা সর্বদা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার লাভ করিতেন । তাঁহারা সেনাপতি, শাসন-কর্ত্তা ও মন্ত্রির পদে নিয়োজিত হইতেন । গোলকুণ্ডার চতুর্থ নরপতি ইব্রাহিম, সোমদেব নামক একজন হিন্দুকে প্রধান অমাত্যের পদ প্রদান করিয়াছিলেন । দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ আদিলের রাজত্বকালে হেমচন্দ্র (হিমু) নামক দিল্লীর একজন দোকানদার ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া রাজকার্য্যে সর্ব্ব সর্বা হইয়া উঠেন ।

ফরকশিরর, রফি-উদ-দরজারত, রফিদৌলা ও মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে রতনচাঁদ নামক একজন দোকানদার মোতাওয়ালীর কৃপায় উজীরের সহকারী পদ লাভ করিয়াছিলেন, সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহার অপরিমিত ক্ষমতা ও প্রভাপ ছিল । রাজা অজিত সিংহ এবং তাঁহার বহুই আওরঙ্গজেব কর্ত্তক পুনঃ প্রবর্ত্তিত ঘৃণা জিজিয়াকর রহিত হইয়াছিল । সায়ের উল মুতকরিন লেখক লিখিয়াছেন, “এমন কি, ধর্ম্ম ও বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্যও তিনি একপ ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন যে, তাহাতে তৎসম্পর্কীয় রাজকর্ম্মচারিগণ সম্পূর্ণ ক্ষমতা হীন হইয়াছিল ; এই হিন্দুর সম্মতি ব্যতীত কেহ কোন নগরের কাজির পদও লাভ করিতে পারিত না ।”

বঙ্গদেশের সুবাদার সুজা খাঁর আমলে রাজা আলম চাঁদ ও জগৎশেঠ রাজকার্যে অতুল প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এমনকি, তিনি মৃত্যুকালে পুত্র সরকারজাখাঁকে এই দুইজন হিন্দুর মন্ত্রণামত রাজকার্য নিৰ্বাহ করিবার জন্ত আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। আলীবর্দী খাঁ বঙ্গের শাসন কর্তৃপদ অধিকার করিয়া রাজা জানকীরামকে প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন খাঁ লিখিয়াছেন যে, জানকীরাম প্রতিভাশালী রাজকর্মচারী এবং সুবাদারের অন্তরঙ্গগণ মধ্যে সর্বোপেক্ষা বিশ্বস্ত ও কর্মঠ ছিলেন।

মহারাজ মোহনলাল সিরাজদৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দুর্লভরাম ও রামনারায়ণ বিশিষ্ট রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আইন-ই আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল আকবরের সময়ের বিশিষ্ট রাজপুরুষগণের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকার নিম্নলিখিত হিন্দু কর্মচারীগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

পাঁচহাজারী সেনাপতি ।

১। রাজা বিহারীমল ।

২। রাজা ভগবান দাস ।

৩। রাজা মানসিংহ । রাজা মানসিংহ কিয়ৎকালের জন্ত বঙ্গদেশের শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। আকবর অবশেষে তাঁহাকে সাত হাজারী সেনাপতির পদ প্রদান করেন। তাঁহাকে এই পদ প্রদান করিবার পূর্বে রাজকুমার এবং রাজার অন্তরঙ্গ কুটুম্বগণ ব্যতীত আর কেহ কখনও পাঁচ হাজারের অতিরিক্ত সেনার নায়কত্ব প্রাপ্ত হন নাই। অতএব আকবর তাঁহাকে সাতহাজারী সেনাপতি করিয়া সমস্ত মোসলমান কর্মচারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্য,—ভারতবাসীর অবস্থা । ৪০৫

চার হাজারী সেনাপতি ।

৪। রাজা তোডরমল । তোডরমল রাজস্ব-নীতি বিশারদ সেনাপতি ছিলেন । তাঁহার সাহায্যেই আকবর অভিনব রাজস্ব বিধান প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন । তোডরমলের যত্নেই পারস্যের পরিবর্তে হিন্দীভাষায় বিচার কার্য সম্পাদন করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল ।

৫। রায় রায়সিংহ । জাহাঙ্গীর পাদশাহ ইঁহাকে পাঁচ হাজারী সেনাপতির পদ প্রদান করিয়াছিলেন ।

আড়াই হাজারী সেনাপতি ।

৬। জগন্নাথ ।

দুই হাজারী সেনাপতি ।

৭। রাজা বীরবল । ইনি আকবর পাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র ও চির সহচর ছিলেন । তিনি ইঁহাকে রায় কবি উপাধি প্রদান করেন ।

৮। রাজা রামচন্দ্র বর্গলা । ৯। রায় কলাগমল । ১০। রায় সুরজন ।

দেড় হাজারী সেনাপতি ।

১১। রায় দুর্গা । ১২। যধুসিংহ ।

সাত্বে বারশতী সেনাপতি ।

১৩। রায় সল ছর তরি (?) ।

এক হাজারী সেনাপতি ।

১৪। রূপসি (সিংহ ?) বৈরাগী । ১৫। অখোখ্যাসিংহ । ১৬। জগমল । ১৭। জগৎ সিংহ । ১৮। রাজা রাজসিংহ । ১৯। রায় ভোজ ।

সাত শতী সেনাপতি ।

২০। রায় তুপার দাস । ২১। মেদিনী রায় । ২২। বাবু ।

পাঁচ শতী সেনাপতি ।

২৩। পরমানন্দ । ২৪। জগমল । ২৫। রাওলভীম । ২৬।
 রামদাস । ২৭। দুর্জয়ন সিংহ । ২৮। শিওল সিংহ । ২৯। রাম-
 চাঁদ । ৩০। রাজা মুকুটমল । ৩১। রাজা রাম চাঁদ । ৩২। রাম
 চাঁদ । ৩৩। ছলপত্ত ।

চার শতী সেনাপতি ।

৩৪। সুখ২ সিংহ । ৩৫। রায় মনোহর । ৩৬। রামচাঁদ । ৩৭। বঙ্ক ।

সাড়ে তিন শতী সেনাপতি ।

৩৮। তুলসীদাস । ৩৯। কুম্ভদাস । ৪০। মানসিংহ । ৪১। বিল-
 বিধর । ৪২। কিষদাস । ৪৩। নীলকণ্ঠ ।

আড়াই শতী সেনাপতি ।

৪৪। রায় রামদাস দেওয়ান ।

দুই শতী সেনাপতি ।

মোট ৮ জন ।

আকবরের সময়ে মোট ৪১৫ জন সেনাপতি ছিলেন । অতএব হিন্দু
 সেনাপতির সংখ্যা শতকরা তেরজন ছিল । ইঁহারা সকলেই দারিদ্র-পূর্ণ
 কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন । তোড়রমল রাজস্ব মন্ত্রীর কার্য নিরূপিত
 করিয়া গিয়াছেন । কেহ কেহ বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হই-
 তেন । একমাত্র রাজকুমারগণের জন্যই যে সকল পদ চিহ্নিত ছিল, তাহাও
 রাজা মানসিংহকে প্রদত্ত হইয়াছিল ।

মোগল পাদশাহগণ হিন্দু রাজকন্যানিগকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ
 করিতেন । কোন কোন মোগল পাদশাহ হিন্দু রাজমহিষীর গর্ভজাত
 ছিলেন । আকবর হিন্দু মহিষীগণের প্রীতির জন্য যত্ন করিতেন বলিয়া
 আইন-ই আকবরীগ্রন্থে উল্লেখ আছে । আকবরের দুইজন মহিষী হিন্দু

ছিলেন। তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর হিন্দুমহিষীর গর্ভজাত ছিলেন। জাহাঙ্গীর পাদশাহের মহিষীর সংখ্যা দশজন ছিল; তন্মধ্যে অনান ছয় জন হিন্দুকুলজাত ছিলেন। তদীয় পুত্র শাহজাহান হিন্দুমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্মণীতে মোসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর রক্তই অধিক প্রবাহমান ছিল।

ভারতবর্ষীয় মোসলমানগণ ক্রমশঃ হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এসলামধর্মের প্রচারে ক্রমশঃ নিরুৎসাহ হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শাহজাহানের রাজ্যচ্যুতি পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবরবি মধ্যাহ্ন আকাশে সমুদিত ছিল। আকবর এবং তদীয় প্রধান পার্শ্বদেয় (ফৈজী ও আবুল ফজল) বহুল পরিমাণে হিন্দু রাজপুরুষগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু মহিষীদের এতদূর প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, তিনি পেরাজ, রমুন ও শ্মশ্রু পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর ন্যায় থাকিতেন। বদায়ুনি লিখিয়াছেন যে, আকবর হিন্দু জনসাধারণের সন্তোষ বিধান জন্য রাজদরবারে পরিবর্তিত আকারে হিন্দুর আচার ব্যবহার প্রচলিত করেন। তোডরমল বীরবল, মানসিংহ এবং হিন্দু ভাবাপন্ন ফৈজী এবং আবুল ফজলই আকবরের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টাতেই মোগল সাম্রাজ্য উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুজাতি সম্বন্ধে আকবরের উদার নীতি, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান পাদশাহের রাজত্বকালেও অব্যাহত ছিল। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম সম্বন্ধে আকবরের পন্থাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিন্দু ও এসলাম ধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া এক-খণ্ড পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় পঞ্চাশখানি উপনিষদ পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। আলমগীর নামার লেখক একস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, দারা রাজ

পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইলে এসলাম ধর্মের দুর্দশা উপস্থিত হইত। আওরঙ্গজেব গোড়া মোসলমান ছিলেন। তাঁহার হিন্দু বিষয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। অতএব তাঁহার সাম্রাজ্যের অধিকার লইয়া যে দ্বন্দ্ব প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হিন্দুপ্রীতি ও হিন্দু বিষয়ের বিবাদরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই বিবাদে হিন্দু বিষয়েরই জয়লাভ হইয়াছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের অত্যাচার পরেই হিন্দু-প্রীতি-মূলক শাসন প্রণালীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। যদিচ আওরঙ্গজেব হিন্দুর প্রতি একান্ত বিষে পরামর্শ ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে রাজা জয়সিংহ ও মহারাজ যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি হিন্দু সেনাপতিগণ দারিদ্র্যপূর্ণ বিশিষ্ট রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। মোগল শাসনকালে হিন্দুর রাজকার্যে উচ্চাধিকার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফলতঃ সিগণর মাসুদী স্বচক্ষে মোগলের স্বল্প ও বহদুর বিচারী শাসন প্রণালী দেখিয়া যথার্থই নির্দেশ করিয়াছেন, "They (the institutions of the Moghul Empire) have not been represented as free from defect, but exhibiting, rather a state in which barbarism is so qualified by the equity which pervades the administration as to render the Government of the Moghul Empire little inferior to that of any other nation."

সম্পূর্ণ।



পরিচিতি ।

আবুল ফজল ।

ষষ্ঠীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেখ মবারক নামক একজন মৌলবী আগ্রানগরীতে বাস করিতেন । তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আরবের অধিবাসী ছিলেন । মবারকের পিতা অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতানার অন্তর্গত নাগরে আগমন করেন । মবারক রাজপুতানা পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় বাসস্থান নির্দেশ করেন । তিনি এসলাম শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন ; এসলাম শাস্ত্রের কোন অংশই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না । তাঁহার প্রকৃতি যেমন চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিত, তাঁহার প্রতিভাও সেইরূপ সর্বদর্শিনী ছিল ; একারণ তাঁহার ধর্মমত সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ পণ্ডিতে আবদ্ধ হয় নাই ।

মবারকের একাধিক পুত্র ছিল । তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ফৈজী, ফৈজী পিতার সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন । তিনিও বিবিধ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার পাঠাগারে প্রায় সার্ক চারি সহস্র হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত ছিল । ফৈজী কবিত্ব-শক্তিশালী ছিলেন । আমীর খুসরু ভারতীয় মোসলমান কবিকুলে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার নীচেই ফৈজীর আসন-নির্দেশ করা যাইতে পারে । আকবর শাহ তাঁহার নানাতাব অলঙ্কৃত কাব্যরাজ্যিপাঠে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন । পিতার স্থায় তাঁহারও ধর্মমত অতিশয় উদার ছিল ।

শেখ ফৈজী ঈদুশ নানাঙের অধিকারী হইয়াও মোসলমান সমাজে অনাদৃত ছিলেন। তদীয় উদার ধর্মমতই তাঁহার প্রতিপত্তিলাভের অন্তরায় ছিল। একবার তিনি একখণ্ড ভূমির জন্য আবেদনপত্র হস্তে মোগলদরবারে উপনীত হইলেন। কাদির অর্থাৎ আবেদন-পাঠক একজন গোঁড়া মোসলমান ছিলেন। তিনি উদার মতাবলম্বী ফৈজীর এই আবেদনপত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে নানাভাবে নিগূহীত করিয়া দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই সময় ফৈজী চিত্তোরে বাস করিতেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আকবর শাহ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। ফৈজীর শত্রুকুল এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া আনন্দে ভ্রূধীর হইল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এসলাম ধর্মবিরোধী মত পরিপোষণ জন্য শাস্তি দিবার অভিপ্রায়েই পাদশাহ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি যাহাতে অব্যাহতিলাভ করিতে না পারেন, তাঁহারা তজ্জন্য আগ্রার শাসন-কর্তাকে চেষ্টা করিতে অহরোধ করেন। ফৈজী বন্দী-ভাবে পাদশাহের নিকট নীত হইলেন। তদীয় শত্রুকুল যাহা তাবিয়া ছিলেন, কার্যকালে তাহার বিপরীত ঘটে। আকবর তাঁহার সুমধুর কাব্যপাঠে সন্তোষলাভ করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে প্রীতচিত্তেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ফৈজী রাজদরবারে পরম সমাদরে গৃহীত হন। ইহার পর অচিরে পাদশাহের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। ফৈজী রাজানুগ্রহলাভ করিয়া মোগল দরবারে সাতিশয় প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন।

ফৈজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম আবুল ফজল। আবুল ফজল ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আবুল ফজলও পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তাঁহার বিজ্ঞান খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান

সুপ্ততীর ও বিচারশক্তি স্মৃতিশ্রু ছিল। তাঁহার নানা বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি সর্ব সাধারণের নিকট আত্মীয় উপাধিলাভ করেন। (১)

ফৈজী আকবর শাহের দরবারে সাতিশয় প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। একত্র তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল ফজল সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই পাদশাহের নিকট পরিচিত হন। গুণগ্রাহী আকবর অচিরে তাঁহার গুণাবলীর সমাদর করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর হইতে তাঁহার উপর অবিরত ধারে রাজানুগ্রহ বর্ষিত হইতে থাকে। আবুল ফজল রাজানুগ্রহে ক্রমে ক্রমে সাতিশয় ক্ষমতালী হইয়া উঠেন। অবশেষে প্রধান অমাত্যের পদ ও চারি সহস্র সৈন্তের মনসবলাভ করেন। পাদশাহের ঈদুশ অনুগ্রহের মূলে আবুল ফজলের অসাধারণ কার্যতৎপরতা বিদ্যমান ছিল। কি বিদ্বজ্জন সম্মিলনীতে, কি মন্ত্রণাকক্ষে, কি বর্ণক্ষেত্রে, সর্বত্রই তাঁহার অতুল প্রতিভা সমভাবে ক্ষুর্ভিলাভ করিত। আবুল ফজল পাদশাহের অসীম বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনি তাদৃশ বিশ্বাসের যোগ্য পাত্রই ছিলেন। আমরা এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আকবরের আদেশে আবুল ফজল দক্ষিণাপথের আশির দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। দুর্গাধিপতি বাহাদুর শাহ আবুল

(১) আবুল ফজলের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং একাগ্রতা কিরূপ অলোক-সামান্য ছিল, তাহার পরিচায়ক একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা আবুল ফজল কোন দুস্ত্রপা উৎকৃষ্ট গ্রন্থের একখণ্ড প্রাপ্ত হন; কিন্তু পুঁথিখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠার দক্ষিণার্দ্ধ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। একত্র তিনি একখণ্ড পূর্ণাঙ্গ পুঁথির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি বহু অনুসন্ধানের উহা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিজেই অগ্নিদগ্ধ অংশ পূরণ করিতে সংকল্প করেন। আবুল ফজল বহু পরিশ্রমে নষ্টাংশ পূরণ করিতে সমর্থ হন। ইহার কিয়দিন পরে দৈবাৎ একখণ্ড পূর্ণাঙ্গ পুঁথি পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ কোতূহলবশে উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন, এবং আবুল ফজলকৃত অংশ মূল হইতে নিকৃষ্ট নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

ফজলের অনুগ্রহলাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট মহাৰ্ঘ উপহারপ্রেরণ করিয়াছিলেন। আবুল ফজল নিম্নলিখিত মন্তব্য সহ বাহাদুর শাহের উপহারফেরত দেন। আমি চারিটি সৰ্ব্ব প্রতিপালিত না হইলে উপহার গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ১ম, বন্ধুতা। ২য়, আমি উপহার-সামগ্রীগুলি অত্যধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিব না। ৩য়, আমি উপহার সামগ্রীলাভ করিবার জন্য উদ্বীণ হইলাম না, ৪র্থ, উপহার-সামগ্রীগ্রহণের আবশ্যকতা। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, বর্তমান ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত তিনটি সৰ্ব্ব প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহা হইলেও আমি আপনার প্রেরিত উপহারগ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, পাদশাহের অনুগ্রহে আমার উপহারগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত হইয়াছে।

ফৈজী ও আবুল ফজল উভয়েই পিতার ভ্রাতৃ ধর্মবিষয়ে উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু পুত্রদ্বয়ের ধর্মমত পিতার ধর্মমত অপেক্ষাও অধিক প্রশস্ত ছিল। তাঁহারা গোঁড়া মোসলমান সমাজে ধর্মত্যাগী, অপধর্মাবলম্বী, সত্যনাশক, Free thinker এবং ভণ্ড প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে অভিহিত হইতেন। ফৈজী ও আবুল ফজলের সঙ্গলাভের পূর্বেই পাদশাহ ধর্মবিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও সমদর্শিতাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ভ্রাতৃযুগল অগ্নিসংযোগ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের ইকনসংগ্রেহেই উহা সজীব ও প্রজ্জ্বলিত ছিল। আকবরের প্রকৃতি, ভাব ও মতের সঙ্গে তাঁহাদের প্রকৃতি, ভাব ও মতের ঐক্য ছিল। কিন্তু তাঁহাদের ভাব ও মত পাদশাহের ভাব ও মত অপেক্ষা অধিক সুগঠিত ছিল। পাদশাহ ভ্রাতৃযুগলের সঙ্গে সর্বদা ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন। ইহার ফলে পাদশাহ ও ভ্রাতৃযুগল নানা গতিতে আপন আপন ধর্মমত পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া অবশেষে তৌহিদ

বা দীন-ই-ইলাহি (Divine Monotheism) নামক অভিনব ধর্মের প্রবর্তন করেন। এই নব ধর্মের শীর্ষস্থানে শ্রয় আকবর অবস্থিত ছিলেন ; তাঁহার নিম্নেই আবুল ফজল ও ফৈজীর স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

রাজকুমার সেলিম আবুল ফজলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি নানারূপ ছুরাকাজ্জার বশবর্তী হইয়া রাজ্যের অনিষ্টচেষ্টা করিতেন। মস্তিষ্ক একান্ত প্রভূভক্ত ছিলেন, তিনি প্রতিবারেই রাজকুমারের ত্রুটিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিতেন। এ জন্যই তিনি রাজকুমারের ঘণারপাত্র হইয়াছিলেন। রাজকুমার স্বচরিত জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, আবুল ফজল তাঁহার বন্ধু ছিলেন না। তিনি ভয় ও ঘণারপাত্রকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিবার সুযোগ অবশ্যে নিরত ছিলেন। রাজকুমার একাধিকবার বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠেন ; তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন অধিকার করিতে অভিলাষী ছিলেন। আকবরের রাজত্বের সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষে রাজকুমার সেলিমের ছুরাকাজ্জা প্রবলাকার ধারণ করে, এবং তাহাতে পাদশাহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই সময় আবুল ফজল দক্ষিণাপথে দেশ-বিজয়ে নিযুক্ত ছিলেন। পাদশাহ রাজকুমারের দমন জন্য তাঁহার স্ত্রীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী মস্তানা ও সহায়তা আবশ্যক মনে করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। আবুল ফজল রাজাজ্ঞানুসারে দক্ষিণাপথ পরিত্যাগ পূর্বক রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন। সময়ের অল্পতা নিবন্ধন তাঁহাকে অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারেই যাত্রা করিতে হইয়াছিল। সেলিম এই সুযোগে তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার জন্য বীরসিংহ নামক একজন কুদ্র সামন্তকে নিযুক্ত করেন। আবুল ফজল এই ঘটনার বিষয় পূর্বেই অবগত হইয়া-

ছিলেন, কিন্তু প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে শত্রুকুল নরওয়ারের নিকটবর্তী স্থানে আবুল ফজলকে আক্রমণ করে। তিনি প্রবল পরাক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু তাহাদের সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত শীঘ্রই নিরস্ত হইয়া পড়েন। হীনমতি রাজা তাহার নিরশ্বেদন করে। ছিন্নশির সেলিমের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। সেলিম রাজ্যলাভ করিয়াই বীরসিংহকে এই অপকার্যের জন্য পুরস্কৃত করেন। তিনি স্বচরিত জীবনবৃত্তে আবুল ফজলের হত্যার কথা স্বীকার করিয়া আপন দোষস্থালন জন্য নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজলের অপঘাতে পাদশাহ একান্ত শোকাবুল হইয়াছিলেন। তিনি বীরসিংহকে শাস্তিপ্রদান জন্য আজ্ঞা প্রচার করেন। রাজসৈন্য তাহাকে ধৃত করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়াছিল। কিন্তু আবুল ফজলের অপমৃত্যুর পর পাদশাহ দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না বলিয়া বীরসিংহ পরি-ত্রাণ লাভ করে।

মা-আসিরউল-উমরা নামক গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন, “অনেকে বলেন যে, আবুল ফজল বিধর্মী ছিলেন। কেহ বা তাঁহাকে হিন্দু, কেহ বা তাঁহাকে উগ্র-উপাসক, কেহ বা তাঁহাকে Free thinker বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; এবং কেহ কেহ ইহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থ মতও প্রকাশ করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন যে, আবুল ফজল অদ্বৈত-বাদী ছিলেন। অস্বাভাবিক সুফির ত্যায় তিনিও পরমেশ্বরের অমুশাসন অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। আবুল ফজল যে শাস্তিপ্রাপ্ত ও উন্নতচরিত্র ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি

কখনও কোন অসঙ্গত কথা বলেন নাই। তদীয় গৃহে দাস দাসীর ভৎসনা, বেতন কর্তন, জরিমানা ও গরহাজিরী ছিল না। কোন কর্মচারীকে অযোগ্য দেখা গেলেও তিনি তাহাকে অপমৃত করিতেন না। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, একবার চাকর নিযুক্ত করিয়া আবার তাহাকে অপমৃত করিলে সকলে প্রভুকে লোকচরিত্র সম্বন্ধে অস্তবলিয়া নিন্দা করে। সূর্য্যের মেঘরাশিতে প্রবেশের দিন আবুল ফজল গৃহস্থালীর সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন, জিনিসপত্রের সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া ফর্দ করিতেন এবং সে ফর্দ নিজের নিকট রাখিয়া পূর্ববর্তী সমস্ত হিসাব দৃষ্ট করিয়া ফেলিতেন। এই সময় তিনি সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ দাস দাসীদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন, কিন্তু পাজামাগুলি কাহাকেও না দিয়া নিজের সম্মুখেই পোড়াইয়া ফেলিতেন।”

“আবুল ফজলের অসাধারণ আহারশক্তি ছিল। কথিত আছে যে, তিনি প্রত্যহ বাইশ সের পরিমিত খাদ্য উদরসাৎ করিতেন। ব্যঞ্জনের ঝোল ও পানীয় জল ছাড়াই তাঁহার খাদ্যের পরিমাণ বাইশ সের ছিল। আবুল ফজল আহার করিতে বসিলে তদীয় পুত্র আবদুর রহমান সফর-চির কাজ করিতেন, রন্ধনশালার অধ্যক্ষকেও উপস্থিত থাকিতে হইত। তিনি কোন আহার্য সামগ্রী দুইবার মুখে দেন কি না তাহা উভয়ে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেন। যদি তিনি কোন খাদ্য দুইবার মুখে দিতেন, তাহা হইলে পরদিনও সেটা প্রস্তুত করা হইত। কোন খাদ্য স্বাদহীন হইলে তিনি তাহা পুত্রকে আশ্বাদ করিবার জন্য প্রদান করিতেন, পুত্র আবার অধ্যক্ষকে দিতেন, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতেন না। দক্ষিণাপথে অবস্থানকালে তাঁহার বিলাসিতার মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একটা শুব্হৎ তাবু মধ্যে এক সহস্র

আমীর ওমরাহকে নানাবিধ সুবাহু খাণ্ড দেওয়া হইত । এই সুবাহু
তাম্বুর নিকটেই আর এক তাম্বুতে কি ধনী, কি নিধন সর্বপ্রকার
আগন্তকের জম্ভাই আহারের বন্দোবস্ত থাকিত । সমস্ত দিন খিচুড়ী
পাক করা হইত, এবং যে কেহ প্রার্থনা করিত, তাহাকেই উহা নির্বি-
চারে প্রদান করা হইত ।”

“লিপিকুশলতায় আবুল ফজল অদ্বিতীয় । তদীয় ভাষা সুন্দর,
প্রাঞ্জল ও পারিতোষিক-শব্দ-বিবর্জিত । তাহার নির্দোষ শব্দগুলি
একপ্রকার প্রসাদগুণবিশিষ্ট, তাহার রচনাভঙ্গী একপ্রকার সুন্দর, তাহার
যোজনা ও তাহার পদবিছার একপ্রকার পারিপাট্যপূর্ণ যে, তদীয় রচনার
অনুকরণ কাহারও পক্ষে সাধ্যাত্ত নহে ।”

দেশীয় সমালোচক মাঝেই তাহার রচনাসম্বন্ধে প্রাণ্ডুরূপ যত
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । বোখারীর অধিপতি আবদুল্লা বলিতেন যে,
তিনি আকবরের অসি অপেক্ষা আবুল ফজলের লেখনীকে অধিক ভয়
করেন । তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ মুন্সী বলিয়া পরিচিত ।
তাঁহার পত্রাবলী ভারতবর্ষের সমস্ত মাদ্রাসার পঠিত হইয়া থাকে ।
প্রথিতনামা বুকম্যান সাহেবও আবুল ফজলের ভূরঙ্গী প্রশংসা
করিয়াছেন ।

কিন্তু এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজ ইতিহাস
লেখক তাঁহার বহুনিদা করিয়া গিয়াছেন । এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব
বলেন, “আবুল ফজল পাদশাহের চরিত্র, অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতার লঘু
জ্ঞাপক প্রত্যেক ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বর্জন অথবা সঙ্কুচিত ভাবে বর্ণনা
করিয়াছেন ; তাঁহার লেখার আশ্রয় পাদশাহের গৌরব ও কীর্তি
বোধগম্য পূর্ণ । পাঠকগণ সমস্ত গ্রন্থাব্যাপী গৌরব ও কীর্তিকাহিনী পাঠ
করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং লেখক ও সঙ্গে সঙ্গে তদীয়

মারকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন । অর্থশূন্য স্তুতিবাচক বাক্যের ঘূর্ণাবর্তে আকবরের প্রকৃত মহিমা ও গৌরব লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া যায় । তাঁহার কার্যাবলীর উদ্দেশ্য, বিপদাপদের বিবরণ ও শক্তিসামর্থ্যের পরিমাণ পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমাদেরিগকে অন্ত্যাত্ম গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হয় । পাদশাহের চরিত্রের একজন লেখক অস্তিত্বপ্রাপ্ত স্তুতিবাক্যে আপন গ্রন্থপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এবং পাদশাহ তাহা স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছেন । ইহা বিবেচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, তাঁহার চরিত্র আত্মাভিমানভূষ্ট ছিল । এই আত্মাভিমানই তাঁহার মহৎ চরিত্রের একমাত্র কলঙ্ক ।” ইলিয়ট ও মর্লি প্রভৃতি লেখক-বর্গও আবুল ফজলের সম্বন্ধে প্রতিকূল মতই প্রকাশ করিয়াছেন ।

প্রাচ্য লেখকগণের প্রতিবাদে ব্রহ্মকম্যান সাহেব যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা এহলে উদ্ধৃত করিতেছি :—“ইউরোপীয় লেখকগণ আবুল ফজলকে স্তুতিবাদক ও স্বীয় প্রভুর হীনতাজ্ঞাপক ঘটনাসমূহের প্রকাশ সম্বন্ধে সঙ্কুচিতহস্ত বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন । আকবরনামা পাঠ করিলে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । যদি আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলী এসিয়াথগের অন্ত্যাত্ম ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, অন্ত্যের তুলনায় তাঁহার প্রশংসা বহুল পরিমাণে প্রগল্ভতাশূন্য, এবং সুশোভন ও মার্জিত । কোন দেশীয় সমালোচকই তাঁহাকে তোষামোদকারী বলিয়া নির্দেশ করেন নাই । রাজস্বত প্রাপ্তিমূলক ও অসম্ভব হইলেও তাহাতে সম্পূর্ণ সন্মতিজ্ঞাপন করিতে প্রাচ্য নীতিশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, এবং সমগ্র প্রাচ্য কাব্যরাজি একরূপ রাশি রাশি উৎকট-রাজ-তোষামোদপূর্ণ যে, ততুলনায় আধুনিক রাজস্ববমালা শুকপত্রের স্তায় প্রতীয়মান হয় । একরূপ অবস্থায় আমরা আবুল ফজলকে কমা

করিতে পারি; কারণ, তিনি একজন প্রকৃত বীরপুরুষের সম্পর্কেই প্রশংসার স্রোত খুলিয়া দিয়াছিলেন ।” শ্রীবৃক ডোসন সাহেবেরও এই মত ।

আবুল ফজল বহু গ্রন্থের প্রণেতা । পাদশাহের সঙ্গে প্রথম পরিচয়কালে তিনি কোরাণের কোন এক অংশের ব্যাখ্যা তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন । এই ব্যাখ্যা-পুস্তকের নাম আরতু-উল-কুরসি । বদায়ুনিয় মতে এই গ্রন্থ তদীয় পিতার লেখনী-গ্রন্থত । ইনশাহ-ই-আবুল ফজল তাঁহার আর একখানি পুস্তকের নাম । এ গ্রন্থে জুলতান ও আমীর ওমরাহের নিকট কি ধরণে পত্র লিখিতে হয়, তাহার আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে । আবুল ফজল কলিমা ও দামনা নামক আরবী গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ করেন । এই অনুবাদগ্রন্থের নাম আরার-ই-দানিশ । তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু সেসকল গ্রন্থ পাঠকসমাজে তাদৃশ পরিচিত নহে । আবুল ফজলের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের নাম আকবরনামা । আকবরনামা দুইভাগে সমাপ্ত । প্রথম ভাগে আকবরের পূর্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় ভাগে বর্ষানুক্রমে তদীয় রাজত্বের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে । তদীয় রাজত্বের সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষে আবুল ফজল লোকান্তরিত হন । এজন্য আকবরনামার এই সময়ের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ; অবশিষ্ট কালের বিবরণ ইনারেজ উল্লা নামক একজন গ্রন্থকর্তা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, এই গ্রন্থের নাম তাকমিলা-ই-আকবর নামা । আবুল ফজলের আর একখানি গ্রন্থের নাম আইন-ই-আকবরী । কেহ কেহ ইহাকে আকবরনামার উপসংহারভাগ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কিন্তু আইনকে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে নির্দেশ করাই সম্ভব । প্রথমে মল্লুইন সাহেব আইন আকবরীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন । তার পর ব্রহ্মদাস সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির

উদ্বোধনে এক অভিনব অনুবাদপ্রচার করিয়াছেন । মর্ডুইন সাহেবের অনুবাদ তাদৃশ মনোরম নহে ; কিন্তু ব্রুকম্যান সাহেবের অনুবাদ সর্বোৎকৃষ্ট প্রীতিপ্রদ । তাঁহার অনুবাদ অক্লান্ত অধ্যবসায় ও গভীর পাণ্ডিত্যের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত স্বরূপ । বহুসংখ্যক টীকাসংযোগে ব্রুকম্যান সাহেবের অনুবাদ সমধিক মূল্যবান হইয়াছে ।

শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটীর উদ্বোধনে আকবর-নামার অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন । লেপ্টেন্যান্ট চেম্বার্স আকবর-নামার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়া বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন । কিন্তু উহা এ পর্য্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই ।

আকবরনামা সম্বন্ধে এনায়েত উল্যা যে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি । “শেখের দ্বিতীয় ভাগের রচনাপ্রণালী তাদৃশ সৌন্দর্য্য-শালী নহে, এবং উহার বহুস্থানে সাধারণ পাঠকসমাজের দুর্ব্বোধ্য অপ্রচলিত শব্দ বিস্তৃত হইয়াছে । এই সকল দোষ অনুমোদিত নহে বলিয়া আমি প্রথম ভাগের আদর্শে দ্বিতীয় ভাগের পদবিন্যাসপদ্ধতি সংশোধন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি ; তাঁহার ভাবসমূহ একদিকে যেমন নানারস সংশ্লিষ্ট ও সুন্দর, অন্যদিকেও যেন তেমনি সাধারণ ভাষায় সর্বজন পরিচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কি পণ্ডিত, কি মূর্থ, সকল শ্রেণীরই বোধগম্য ও প্রশংসনীয় হইতে পারে ।”

নিজাম উদ্দীন ।

খাজে নিজাম উদ্দীন আকবর শাহের শাসনকালের আর একজন বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক । নিজামের পিতার নাম খাজে মুকিমহরই । মুকিম বাবর পাদশাহের একজন অনুচর ছিলেন । তিনি তাঁহার রাজ-স্বের শেখতাবে তোবাখানার দেওয়ানের পদলাভ করেন । বাবরের

পরলোকগমনের পর হুমায়ূন গুজরাট অধিকার করেন, এবং মিরজা আকবরী আমেরাবাদের শাসনভার গ্রাপ্ত হন। এই সময় মুকিম আকবরীর উজিরের পদ গ্রহণ করেন। হুমায়ূন যে সময় সেরশাহের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রাণে প্রাণে চৌসা হইতে আগ্রাতিমুখে পলায়ন করেন, তখন মুকিম তাঁহার সমভিব্যাহারী ছিলেন। আকবর শাহের রাজত্বকালেও মুকিম জীবিত ছিলেন, তৎকালে তাঁহার বৃদ্ধ দশা ; কিন্তু তখনও গুরুতর রাজকার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে স্তম্ভ থাকিত।

মুকিমের পুত্র নিজামউদ্দীন একান্ত ভ্রাতৃপরায়ণ ছিলেন। **বৃত্তান্ত:** তিনি এতদূর ভ্রাতৃপরায়ণ ছিলেন যে, তৎকালের অন্য কাহারও সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হইতে পারে না। তিনি শাসনকার্য্যাভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তাতেও সমস্ত সহযোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একজন গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, নিজামউদ্দীন সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশের আর-স্বেই আকবর শাহের তোষাখানার দেওয়ানের পদলাভ করেন। কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখদৃষ্ট হয় না।

আকবর শাহের রাজত্বের উনত্রিংশ বর্ষে ইতিমধ্যে গা গুজরাটের শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত হন। এই সময় নিজামউদ্দীন বক্সীর পদলাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গুজরাটে গমন করে। তিনি গুজরাটে নৃতাধিক পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। এই কাল মধ্যে প্রয়োজনান্বীনে তাঁহাকে অনেকবার রণক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। অশেষ ধীসম্পন্ন রাজনীতি বিশারদ নিজামউদ্দীনের রণকুশলতার অভাব ছিল। তিনি তরবারিধারণ করিয়া একবারও কীর্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ১৫৮৯—৯০ খৃষ্টাব্দে আকবরশাহ তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। নিজামউদ্দীন রাজাজ্ঞানুসারে কতিপয় উদ্ভারোহী সমভিব্যাহারে পাদশাহের পঞ্চত্রিংশ রাজ্যাভিষেকোৎসব দিনে লাহোর নগরে

উপনীত হন। তদীয় সমভিব্যাহারী উষ্টারোহী ও অশ্বাশ্ব সহচরগণ নয়ন বিনোদন সজ্জায় সজ্জিত ছিল। তাহাদের বিন্মরোপাদক বেশভূষা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাদশাহ নিজে তাহাদিগকে পরিদর্শন করেন। তিনি নিজামউদ্দীনের কৃচি ও কৌশলে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে নানা সম্মানে সম্মানিত করেন। আকবরের রাজত্বের সপ্তত্রিংশ বৎসরে জললারোসানিকে বিনষ্ট করিবার জন্য আনফ খাঁ মিরজা জাফরবক্সীবেগী আদিষ্ট হন। এই সময় নিজামউদ্দীন বক্সীর পদলাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পাদশাহের সঙ্গে যুগয়ায় গমন করেন। যুগয়া শেষ হইবার পূর্বেই তিনি জ্বররোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তদীয় পুত্রগণ রাজানুমতি-ক্রমে তাঁহাকে লইয়া লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু রাতির তীরে উপস্থিত হইলেই নিজামউদ্দীনের প্রাণত্যাগ হয়।

বদায়ুনি লিখিয়াছেন, “নিজামউদ্দীন সুযশ রাখিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম ও বন্ধুতা, উভয় বন্ধনেই বিশেষ ভাবে আবদ্ধ ছিলাম। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই, এবং আমি নিরাশায় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়াছিলাম। অল্পকাল পরেই ঈশ্বরের আজ্ঞার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার অভাবে আমি এতদূর পীড়িত হইয়াছিলাম যে, কাহারও সঙ্গে নূতন করিয়া বন্ধুত্ব-মুত্রে আবদ্ধ হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিরাছি। ১০০৩ হিজিরী অব্দের সফর চাদের ২৩ তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন, এবং লাহোর নগরে তাঁহার নিজের উষ্টানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার মৃত্যুতে কাহারও চক্ষু শুক ছিল না। তাঁহার সমাধির দিন আপামর সাধারণ মন্ডলেই তাঁহার গুণরাজি স্মরণ করিয়াছিল।”

নিজামউদ্দীন উন্নতজন্য, বুদ্ধিমান ও কার্যকুশল বলিয়া বিখ্যাত

ছিলেন ; কিন্তু ইতিহাস-লেখকরাপেই কীর্তিমানেরে স্থানপাতি করিয়া-
 ছেন । তাঁহার রচিত ইতিহাসের নাম তাবকত-ই-আকবরশাহি । ব-
 য়নিও এ গ্রন্থকে এই নামেই অভিহিত করিয়াছেন । কিন্তু উহা তাব-
 কত-ই আকবরী নামেই সাচিতাসমাজে সুপরিচিত । কেহ কেহ
 গ্রন্থকর্তার নামানুসারে তাবকত-ই আকবরীকে তারিখ-ই নিজামীও
 বলিয়া থাকেন । নিজামউদ্দীনের পূর্ববর্তী মোসলমান ইতিহাস-
 লেখকগণ এসিয়াখণ্ডের মোসলমান শাসনাধীন সমস্ত দেশের বিবরণ
 একত্র একগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেন । নিজামউদ্দীনই সর্বপ্রথমে এই
 রীতি পরিহার করিয়া কেবল মাত্র ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন ।
 তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক মাত্রেই তদীয় গ্রন্থকে আদর্শ পুস্তক
 রূপে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন । পরবর্তী লেখকগণ তাবকত-ই আক-
 বরীকে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন এবং উহা হইতে স্ব স্ব ইতিহাস
 প্রণয়নকালে বহুল পরিমাণে সাহায্য লইয়াছেন । বদায়ুনি স্বীয় গ্রন্থকে
 তাবকত-ই আকবরীর সংক্ষিপ্তসার বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ।
 ফেরিস্তা বলিয়াছেন যে, তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকাবলী মধ্যে একমাত্র
 তাবকত-ই আকবরীই সম্পূর্ণ গ্রন্থ ছিল । মা-আসির-উল-উমরা নামক
 গ্রন্থে গ্রন্থকর্তা বলিয়াছেন যে, তাবকত-ই আকবরীর উপকরণ সংগ্রহ
 এবং তথ্য নির্ধারণ করিতে লেখককে বহু পরিশ্রম ও ব্যয় করিতে
 হইয়াছিল । মিরমশুম ভকরী এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সঙ্কলনে
 সহায়তা করিয়াছিলেন : সুতরাং ইহা সর্বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য । হিন্দু-
 শাস্ত্রের রাজত্ববাদের বিস্তৃত বিবরণপূর্ণ পুস্তকাবলী মধ্যে তাবকত-ই
 আকবরীই আদি গ্রন্থ । মোহাম্মদ কাজিম ফেরিস্তা এবং অন্যান্য ইতি-
 হাস-লেখক তাবকত-ই আকবরী হইতে বহুতান উদ্ধৃত করিয়াছেন ;
 তাবকত-ই আকবরীর আদর্শেই তাঁহাদেরই ইতিহাস রচিত হইয়াছে ।

তাহারা কেবল স্ব স্ব উপকরণ সংযোগপূর্বক লমপ্রমাদ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আবুল ফজলের ইতিহাসের সঙ্গে কোন কোন স্থানে তাবকত-ই আকবরীর অনেকা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

নিজামউদ্দীন তাবকত-ই আকবরীর আশ্রয় একখানি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যেসকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :— “আমি বাল্যকাল হইতেই পিতার উপদেশ শ্রুতি ইতিহাসপাঠে নিরত ছিলাম । ইতিহাসপাঠে শিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধি পরিপক্ব হয়, এবং পর্য্যবেক্ষণক্ষম ব্যক্তি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুশিক্ষালাভ করেন । হিন্দুস্থান একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য । সুবিস্তৃত হিন্দুস্থানের শাসকগণ উপাধিগ্রহণ করিয়া দিল্লী, গুজরাট, মালব, বাঙ্গলা ও সিন্ধু প্রভৃতি অনেক প্রদেশে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিয়াছেন, এবং তাহাদের সমসাময়িক লেখকগণ তাহাদের কাৰ্য্যাবলীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন লেখকই এই ভূভাগের সমস্ত বিবরণ একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই ; এমন কি হিন্দুস্থানের কেন্দ্রস্থল,—সাম্রাজ্যের অধিপতির বাসস্থান রাজধানী দিল্লী নগরীর সমস্ত বিবরণ একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি পুস্তকও রচিত হয় নাই । সৰ্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত ইতিহাসের নাম তাবকত-ইনাশিরী । মিনহাজ-উস-সিরাজ এই পুস্তক সংকলন করিয়াছেন । এই গ্রন্থে সুলতান মৈজউদ্দীন ঘোরীর সময় হইতে নাশিরউদ্দীন বিন সমসউদ্দীনের সময় পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসরের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে । ইহার পর সময় হইতে সুলতান ফিরোজ শাহের সময় পর্য্যন্ত জিয়া-ই বর্ণির ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে । ফিরোজ শাহের পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত অনেক সময় ভারতবর্ষে ঘোর বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রকৃতি পুঞ্জও শক্তিশালী

সার্বভৌমিক শাসনে বঞ্চিত ছিল। একারণ আমি তাঁহার পর সময়ের কেবলমাত্র অসম্বন্ধ ও অসম্পূর্ণ ইতিহাস দেখিতে পাইতেছি। সমগ্র ভারতবর্ষের বৃত্তান্তপূর্ণ একখানি ইতিহাসও আমি দেখি নাই। এক্ষণে হিন্দুস্থানের বহির্ভূত ও অন্তর্ভূত সমস্ত প্রদেশ জৈষরের প্রতিনিধির সর্ব্বজনীন অসি দ্বারা বিজিত হইয়াছে, এবং পৃথিবীর সমস্ত ভাগাংশ এক মহা ঐক্যবন্ধনে একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, এবং হিন্দুস্থানের বহির্ভূত অনেক দেশ (এই সকল দেশ পাদশাহের পূর্ববর্তী রাজগণ মধ্যে কেহই জয় করিতে সমর্থ হন নাই।) সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে; এবং আশা করা যাইতে পারে যে, এই প্রতিষ্ঠাযুক্ত মহাপুরুষের অধীনে সমুদ্রদেশই সম্মিলিত হইবে। এক্ষণে আমি সরল ভাষায় একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এই ইতিহাসে সবক্তগীনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আকবরের রাজত্বের সপ্তত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে যত কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইবে।

তাবকত-ই আকবরী প্রণয়নকালে নিজামউদ্দীন উনজিশখানি ইতিহাসের সাহায্যগ্রহণ করেন। সমগ্র গ্রন্থ দশভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগের নাম উপক্রমণিকা। আমরা এখানে একটা সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদান করিলাম। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

উপক্রমণিকা—গজনির রাজবংশের বৃত্তান্ত।

১ম অধ্যায়—দিল্লীর পাঠান ও মোগল নরপতিগণের ইতিহাস। (এই অধ্যায়ে মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ হইতে আকবরের রাজত্বের অষ্টাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।)

২য় অধ্যায়—দক্ষিণাপথের ইতিহাস । (এই অংশে বাহমনী রাজ্যের সংস্থাপন হইতে ধ্বংস পর্য্যন্ত যত কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । তারপর বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) বিজাপুর (২) আমেদনগর (৩) গোলকুণ্ডা রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ।)

৩য় অধ্যায়—গুজরাটের নরপতিগণের বৃত্তান্ত ।

৪র্থ অধ্যায়—মালবদেশের নরপতিগণের বৃত্তান্ত ।

৫য় অধ্যায়—বঙ্গদেশের নরপতিগণের বৃত্তান্ত ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়—জোনপুরের রাজ বিবরণ ।

৭ম অধ্যায়—কাশ্মীরের মোসলমান নরপতিগণের বৃত্তান্ত ।

৮ম অধ্যায়—সিন্ধুদেশের ইতিহাস ।

৯ম অধ্যায়—মুলতানের শাসনকর্তৃগণের বৃত্তান্ত ।

বদায়ুনি ।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক বদায়ুনি ৯৪৭ হিজিরী অব্দে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার প্রকৃত নাম আকুল কাদের । বদায়ুনি উপাধিমাত্র বদায়ুন নগর তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া তিনি এই উপাধিগ্রহণ করেন । বদায়ুনির পিতার নাম শেখ মুলুক শাহ । মুলুকশাহ সম্বলের পীর বেচুর শিষ্য ছিলেন । তিনি ৯৬৯ হিজিরী অব্দে পরলোকগমন করেন । বদায়ুনি তৎকালের খ্যাতনামা ধার্মিক ব্যক্তিগণের নিকট নানা বিদ্যান্ন শিক্ষালাভ করেন । তদীয় গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে এই সকল শিক্ষাগুরু নামের উল্লেখ পাওয়া যায় । বদায়ুনি জ্যোতিষ, সংগীত এবং ইতিহাসে পারদর্শিতালাভ করেন । তাঁহার ঘর সুমিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি দরবারের বৃথবাসরীয় ইমামের কার্যানির্বাহ করিতে নিযুক্ত হন ।

সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি আকবর শাহের সহিত পরিচিত হন । বদায়ুনি চল্লিশ বৎসরকাল শেখ ববারক, ফৈজী ও আবুল ফজলের সঙ্গে একত্র বাস করেন । কিন্তু তাঁহাদের সহিত প্রীতিমূর্ত্তে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই । তিনি এসলাম ধর্মের গোড়া ছিলেন, একারণ উদার ধর্মাবলম্বী শেখ ববারক প্রভৃতিকে heretics বলিয়া বিবেচনা করিতেন । বদায়ুনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে পরলোকগমন করেন । তাবকতশাহজাহানী নামক ইতিহাসের মতে তাঁহার মৃত্যুকাল ১০২৪ হিজিরী অম্ব ।

বদায়ুনির নানাবিদ্যায় গভীর পাণ্ডিত্য ছিল । তিনি আকবরের আদেশে রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত ও জমি-উর-রসিদ প্রভৃতি আরবি গ্রন্থের পারসী অনুবাদ করিয়াছিলেন । তিনি এই সকল কাজের জন্য যথেষ্ট অর্থলাভ করিতেন ; কোন এক কাজের পুরস্কার স্বরূপ সার্কি এক শত ঘণ ও দশ সহস্র রোপায়ুদ্রা এবং নিকর ভূমি প্রাপ্ত হন । ফলতঃ আকবর তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে কখন কুণ্ঠিত হন নাই । কিন্তু তিনি আকবরের বিরুদ্ধে প্রতিকূলভাবে পরিপোষণ করিতেন ।

বদায়ুনি হদিম্ সম্বন্ধে বহর-উল-অসমার নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । লজাত-উর-রসিদ নামক নীতি ও ধর্মবিবরণ গ্রন্থও তাঁহারই লেখনীপ্রসূত । বদায়ুনি মহাভারতের দুই পর্কেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন । তিনি কাশ্মীরের ইতিহাসেরও সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করেন ।

বদায়ুনি বিবিধ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন ; কিন্তু মোগলরাজবৃত্তিই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । তিনি এই গ্রন্থরচনা করিয়াই অমরহ লাভ করিয়া গিয়াছেন । এই গ্রন্থের নাম মুস্তাখব-উল-তোয়ারিখ । এই নামে অনেক ইতিহাস বিদ্যমান আছে । এই জন্য বদায়ুনির ইতিহাস পাঠকসমাজে সাধারণতঃ তারিখই-বদায়ুনি বলিয়াই প্রখ্যাত ।

বদায়ুনির গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে গজনীবংশীয় রাজগণের, দ্বিতীয় ভাগে দিল্লীর পাঠান বংশীয় সুলতানগণের, তৃতীয় ভাগে বাবর ও হুমায়ূনের ও চতুর্থ ভাগে আকবরের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । গ্রন্থের শেষভাগে আকবরের সম-সাময়িক ধার্মিক, দার্শনিক, চিকিৎসক ও কবি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিখ্যাত ব্যক্তিগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । আকবরের রাজত্বের বিবরণের জন্যই বদায়ুনির গ্রন্থ মূল্যবান । আকবরনামা প্রভৃতি গ্রন্থের আদ্যস্ত আকবরের পূর্ণাঙ্গ স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ । বদায়ুনির গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক নিন্দা ও গ্লানির ভাব অনুসৃত হইয়াছে ; কিন্তু বদায়ুনির নিন্দা ও গ্লানির মধ্যেও আকবরের মহিমার যে আদর্শ বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা আবুল ফজলের স্তুতিপূর্ণ অলঙ্কারচ্ছটারও দেখিতে পাওয়া যায় না ।

বদায়ুনি আকবর ও তদীয় অমাত্যগণের বিদ্বেষী ছিলেন । বদায়ুনি এসলামধর্মের গোড়া ছিলেন । আকবর অমাত্যগণের পরামর্শে ও সাহায্যতায় এসলামধর্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই বদায়ুনির বিদ্বেষের মূল কারণ । একথা তিনি নিজেও সরলভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার ধর্মবিশ্বাস স্বার্থসিদ্ধি স্পৃহার নিকট সঙ্কচিত হইত, তদীয় গ্রন্থে এরূপ স্বীকারোক্তিরও অভাব নাই । পাদশাহ তাঁহার গুণের সমুচিত আদর করেন না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল । এমন্য তিনি সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকিতেন । তদীয় সহযোগী অমাত্যগণ রাজদ্রুগ্রহলাভে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী ছিলেন বলিয়াও তিনি ঈর্ষাকুল ছিলেন । এই দুই কারণেও তাঁহার বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল ।

বদায়ুনির গ্রন্থে ১০০৪ হিজরী অর্থাৎ আকবরের রাজত্বের চল্লিশ বৎসরে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় এ

গ্রন্থের প্রচার হইয়াছিল না। জাহাঙ্গীর পাদশাহের রাজত্বকালে পাঠকসমাজে উহার প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের দশম বর্ষেও কেহ তারিখই-বদায়ুনির বিষয় কিছু অবগত ছিল না। এই সময় মা-আসির-ই রহিমি নামক গ্রন্থ লিখিত হয়। উহার রচয়িতা তাবকত্ ও আকবরনামা ব্যতীত আকবরের শাসনবিবরণ সম্বন্ধীয় অন্য কোন গ্রন্থে বিদ্যমান নাই বলিয়া ক্ষোভপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তারিখই-বদায়ুনির অন্তিম পরিজ্ঞাত থাকিলে তিনি অবশ্যই উহার উল্লেখ করিতেন।

প্রধানতঃ তাবকত্-ই আকবরী ও তারিখই মবারকশাহী অবলম্বনেই বদায়ুনির গ্রন্থরচিত হয়। কিন্তু উহাতে মৌলিক তত্ত্বেরও অভাব নাই। বদায়ুনি গ্রন্থরচনাকালে পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্যগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই এ বিষয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি পাঠ করিয়া গ্রন্থের মৌলিকতা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মে, তাহা প্রকৃত নহে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ মৌলিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ।

গ্রন্থকর্তা স্বয়ং এই গ্রন্থরচনার যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার অনুবাদ প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :—

“আকবরশাহের আদেশক্রমে ৯৯৯ হিজিরী অব্দে কাশ্মীরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার রচিত হয়। তৎকালের একজন প্রধান গণ্ডিত প্রাপ্ত শাহের আদেশেই কাশ্মীরের ইতিহাস হিন্দী হইতে পারসী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। আমি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত ইতিহাসানুরাগী ছিলাম। আমি প্রত্যহ কিছু না কিছু সময় ইতিহাস অধ্যয়নে অথবা রচনায় অতিবাহিত করিতাম। কদাচিৎ ইহার

ব্যতিক্রম হইত । এ কারণ ভারতবর্ষে মোসলমান শাসনের প্রারম্ভ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল মোসলমান সুলতান দিল্লীতে আধিপত্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিবার অভিলাষ অনেক সময় আমার হৃদয় অধিকার করিত । * * * কিন্তু ঘটনাধীনে এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অবসরপ্রাপ্ত হই নাই ; এবং সর্বদাই কোন না কোন বিষ উপস্থিত হইত । বিশেষতঃ ভরণপোষণোপযোগী অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন আমি স্বদেশ ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম । একন্ম আমার অভিলাষানুরূপ গ্রন্থপ্রণয়ন-কিয়দিবসের নিমিত্ত স্থগিত ছিল । তাহার পর আমি আমার গুণশালী প্রিয় মিত্র নিজাম উদ্দীন আমেদ বক্সীর পরলোক-গমনের পর এ কাজে প্রবৃত্ত হই । তাঁহার রচিত ইতিহাস উৎকৃষ্ট ; তথাপি আমার মনে হয় যে, উহার স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধন করা বাইতে পারে । সুতরাং যবানকশাহী এবং নিজাম-উততৌয়ারিখনিজামি নামক গ্রন্থদ্বয় অবলম্বনে ভারতবর্ষের কতিপয় বিখ্যাত রাজার বিবরণ স্বীয় মন্তব্যসহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করি । রচনাপ্রণালী বাগাড়ম্বরশূন্য করিবার জন্য যত্ন করা হইয়াছে, অলঙ্কারপূর্ণ কবিত্বময় ভাষা সর্বত্রই পরিহার করা গিয়াছে, আমি এই পুস্তকের মুস্তাখবউত্ তৌয়ারিখ নাম রাখিয়াছি । বিখ্যাতরাজকুলবৃন্দের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যৎশীলগণের নিকট নিজের কীর্ত্তিসংস্থাপনই আমার গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য । ভরসা করি, এ গ্রন্থ আমার হৃর্তাগ্যের মাত্রাবৃদ্ধি না করিয়া চিরস্থায়ী সুখের কারণ হইবে ।

যাহা সত্য, তাহাই লিপিবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল । সুতরাং ভরসা করি, কোন নগণ্য ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিলেও লেখক তাহা ক্ষমা করিবেন ।”

ফেরিস্তা ।

ইতিহাসগ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই ঐতিহাসিককুলভিলক ফেরিস্তার নাম অবগত আছেন। ফেরিস্তা ভারতীয় মোসলমান ইতিহাসবেত্তাগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি কাম্পিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী অস্ত্রাবাদ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকাল লইয়া ঐতিহাসিক সমাজে মতবৈধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জেনারল ব্রিগস সাহেব ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক জুলস্মোল সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ফেরিস্তা ব্রিগস নির্দিষ্ট সময়ের বিশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ফেরিস্তা আমাদের ঐতিহাসিকের উপাধিহীন, তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ। তাঁহার পিতা গোলাম আলী হিন্দু শাহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন ; কিন্তু ভাগ্যানন্দী তাঁহার প্রতি কৃপা-কটাকৃপাত করেন নাই। একান্ত তিনি শিশু-পুত্র ফেরিস্তাকে সঙ্গে লইয়া অর্থঅন্বেষণে ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং দক্ষিণাপথে মৃত্যুঞ্জী নিজাম শাহের আশ্রয়গ্রহণ করেন। তিনি রাজকুমার মিরণ শাহের পারশু শিককের পদলাভ করেন, কিন্তু এই পদে নিযুক্ত হইবার আবাবহিত পরেই অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হন। ফেরিস্তা শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া একান্ত বিগ্ন হইয়া পড়েন।

উদীয় পিতা অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে নিজামের দরবারে অল্প সময়ের মধ্যেই একান্ত প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। শিশু-ফেরিস্তা পিতার গুণগ্রামযুক্ত নিজামের আশুকুল্যে প্রতিপালিত হন। এই সময়ের বিশেষ বিবরণ কিছুই জানা যায় না ; যিনি ভাবীকালে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া ঐতিহাসিককুলের বরণ্য হইয়া-

ছিলেন, তাঁহার শৈশবকাল কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্ত স্বভাবতঃই কোতূহল জন্মিতে পারে, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় সে কোতূহল চরিতার্থ করিবার কোন উপায় নাই ।

যাহা হউক, ফেরিস্তা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া মূর্তাজা নিজাম শাহের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন, এবং অচিরে বিশিষ্টরাজকার্যে নিযুক্ত হন । ১৫৮৬, কি ৮৭ খৃষ্টাব্দে মূর্তাজার পুত্র মিরণ শাহ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া পিতাকে রাজ-সিংহাসন হইতে অপমৃত করিয়া স্বয়ং রাজপদ অধিকার করেন । এই ঘটনার দিন ফেরিস্তা মূর্তাজা শাহের শরীফরক্ষক সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন । (১) শত্রুগণ মূর্তাজার অনুচরদিগকে হত্যা করিয়া আপনাদের তরবারি কলঙ্কিত করিয়াছিল । যদি মিরণ শাহ ফেরিস্তাকে স্বীয় গৃহশিক্ষকের পুত্র বলিয়া স্বয়ং চিনিতে না পারিতেন ও তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য আগ্রহপ্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনিও অন্যান্য রাজানুচরের ন্যায় নিহত হইতেন ।

পিতৃদ্রোহী মিরণ শাহ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই । তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণের এক বৎসর মধ্যেই শত্রুকুল প্রবল হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করিয়াছিল । এই রাজবিপ্লব-কালে ফেরিস্তা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই ।

এই সময়ে নিজামের দরবারে সুরিমতের প্রাধান্ত ছিল ; ফেরিস্তা নিজে সিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, একজন্ত তাঁহার ধর্ম্মমত তদীয় উন্নতি-লাভের অন্তরায় স্বরূপ ছিল । তিনি সুরিমতের কেন্দ্রস্থল আমেদনগর

(১) ব্রিগস্ নির্দিষ্ট সময় (১৫৭০ খৃঃ) ফেরিস্তার জন্মকাল হইলে তৎকালে তাঁহার বয়স মাত্র বোড়শ, কি সপ্তদশবর্ষ ছিল ; কিন্তু তাঁহার পদের গুরুত্ব দেখিলে অনুমিত হয় যে, ফেরিস্তা জুলসমাল সাহেবের প্রদর্শিত ১৫৫০ খৃষ্টাব্দেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

পরিভ্রাণ করিয়া বিজাপুরে গমন করিতে সঙ্কল্প করেন, এবং তদনুসার ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তথায় উপনীত হন। এই স্থানে তিনি রাজপ্রতিনিধি দেলওয়ার খাঁ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন ; এবং তাঁহার যত্নে বিজাপুরের অধিপতির সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তৎকালে এব্রাহিম আদিল শাহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; তিনি ফেরিস্তার প্রতি বথোপযুক্তঅনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। ইহার পর বর্ষচতুষ্টয় অতিবাহিত হইলে দেলওয়ার খাঁ রাজার বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া পলায়ন করেন। দেলওয়ার খাঁর পর সিরাজনগর-নিবাসী এনায়াত খাঁর প্রাধান্ত সংস্থাপিত হয়। তাঁহার যত্নে ফেরিস্তা পুনরায় এব্রাহিম শাহের সাক্ষাৎকারলাভ করেন, এবং এবার স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া রাজানুগ্রহভাজন হন।

এই সময়ে একদা এব্রাহিম শাহ রৌজাতুকসফা নামক গ্রন্থের এক খণ্ড ফেরিস্তাকে উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিতে আদেশ করেন। তিনি এই উপলক্ষে ফেরিস্তাকে বলেন, “একমাত্র নিজামউদ্দীন বন্দী ব্যতীত আর কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এপর্যন্ত ভারতবর্ষের মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। নিজামউদ্দীনের গ্রন্থও, বিশেষতঃ উহার দক্ষিণাপথের অংশ, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিও ; এই জাতীর গ্রন্থসমূহ মিথ্যা ও তোষামোদবাক্যে কলুষিত ; তুমি আপনার লেখনীকে এ দোষ হইতে মুক্ত রাখিও।”

ইহার পর ফেরিস্তা অবসর যত ইতিহাস সঙ্কলনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সসন্মানে ও সগৌরবে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি একবার দৌত্যকার্য্যে বৃত্ত হইয়া জাহাঙ্গীর পাদশাহের দরবারে গমন করেন। বিজাপুরাধিপতির পক্ষ হইতে আকবরের

মৃত্যুতে শোক ও জাহান্নীরের রাজ্যাভিষেকে আনন্দপ্রকাশ করাই তাঁহার মোগল দরবারে গমনের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া জেনারল ব্রিগস্ সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন । জাহান্নীর ভূস্বর্গ কাশ্মীরে গ্রীষ্মকাল অতি-বাহিত করিবার জন্য রাজধানী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, ফেরিস্তা পথিমধ্যে লাহোর নগরে পাদশাহের সাক্ষাৎকার লাভ করেন । লাহোর হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় । তিনি একস্থানে নির্দেশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের যে সকল দুর্গ দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রোটাস দুর্গই সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় । ফেরিস্তা ভ্রমণোপলক্ষে এক সময় বদক্ষাণ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ; এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের ফলে তিনি ভূয়োদর্শন লাভ এবং স্বীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

ফেরিস্তার মৃত্যুর সময় কোন স্থানে লিপিবদ্ধ নাই । জেনারল ব্রিগস্ সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, অর্থাৎ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন । পক্ষান্তরে জুলস্মোল সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তিনি ১৬২৩ খৃষ্টাব্দেও স্বীয় গ্রন্থ সংশোধনে ব্যাপৃত ছিলেন । মোল সাহেবের মতে ফেরিস্তা ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মপরিগ্রহ করেন ; তাহা হইলে ফেরিস্তা অন্ততঃ ৭৩ বৎসর জীবিত ছিলেন ।

ফেরিস্তা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ইতিহাসের খসড়া এব্রাহিম আদিল শাহকে অর্পণ করেন ; ইহার পর তিনি আবশ্যিক মত সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এই খসড়াটিকে সম্পূর্ণ গ্রন্থে পরিণত করিবার জন্য জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন । ফেরিস্তা গ্রন্থের শেষ-ভাগে যে সকল ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পর্তুগিসগণ

কর্তৃক সুরাট নগরে কুঠী সংস্থাপনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । ১৬১১ খৃষ্টাব্দে সুরাট নগরে পর্তুগিসদের কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল । জেনারল ব্রিগস্ সাহেব এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, ফেরিস্তা ১৬১১ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে ইতিহাস সমাপ্ত করেন, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই কালগ্রাসে পতিত হন । কিন্তু ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের, এমন কি তাহার দশ বৎসর পরের ঘটনার বিবরণও তদীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এজন্য ব্রিগস্ সাহেবের নির্দেশ আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না ।

ফেরিস্তা স্বপ্রণীত ইতিহাসের নাম গোল-মন-ই এব্রাহিমি ও নৌরস-নামা রাখিয়াছিলেন । তিনি বিজাপুরের অধিপতি এব্রাহিম শাহের নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; তাঁহার নামের অনুকরণেই উহার প্রথমোক্ত নামকরণ হইয়াছিল । অনেকে তাঁহার ইতিহাসকে তারিখ-ই এব্রাহিমি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন । এব্রাহিম ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে নৌরস নামক এক নূতন রাজধানীর পত্তন করেন ; ফেরিস্তা আপনার সুরক্ষার সম্ভাব্যবিধান জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নামের সঙ্গে স্বপ্রণীত গ্রন্থের নাম সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন । ইহাই তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় নামের কারণ ।

উপক্রমণিকা, ছাদশ অধ্যায় ও উপসংহার, এই চতুর্দশ ভাগে ফেরিস্তার ইতিহাস বিভক্ত । আমরা এখানে প্রত্যেক ভাগের সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদান করিলাম ;—

উপক্রমণিকা,—

হিন্দু রাজস্ববর্গের ও প্রাচীন মোসলমান জাতির ভারতে আগমনের বৃত্তান্ত ।

১ম অধ্যায়,—

গজনি ও লাহোরের নবপ্রতিগণের বৃত্তান্ত ।

২য় অধ্যায়,—

দিল্লীর সুলতানগণের বৃত্তান্ত ।

৩য় অধ্যায়,—	দক্ষিণাপথের ইতিহাস । এই অধ্যায় ছয় ভাগে বিভক্ত । (১) কুল বারগা, (২) বিজাপুর, (৩) আমেদ নগর, (৪) তেলিঙ্গা, (৫) বিয়ারি, (৬) বিদার ।
৪র্থ অধ্যায়,—	গুজরাটের নরপতিগণের বৃত্তান্ত ।
৫ম অধ্যায়,—	মালবদেশের নরপতিগণের বৃত্তান্ত ।
৬ষ্ঠ অধ্যায়,—	ধন্দেশের নরপতিগণের বৃত্তান্ত ।
৭ম অধ্যায়,—	বঙ্গদেশ ও বিহারের নরপতিগণের বৃত্তান্ত ।
৮ম অধ্যায়,—	মুলতানের শাসনকর্তৃগণের বৃত্তান্ত ।
৯ম অধ্যায়,—	সিন্ধুদেশের শাসনকর্তৃগণের বৃত্তান্ত ।
১০ম অধ্যায়,—	কাশ্মীরের নরপতিগণের বৃত্তান্ত ।
১১শ অধ্যায়,—	মালবারের বিবরণ ।
১২শ অধ্যায়,—	ভারতবর্ষের সাধুগণের বিবরণ ।
উপসংহার,—	ভারতবর্ষের ভৌগলিক ও জলবায়ুর বিবরণ ।

ফেরিস্তা প্রদত্ত হিন্দুরাজত্ববর্ণের বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ ও নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ । ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংস্কৃত সাহিত্যে নিবদ্ধ, সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতা নিবন্ধন ফেরিস্তা বাধ্য হইয়াই কেবলমাত্র পূর্ববর্তী মোসলমান ইতিহাসবেত্তাগণের গ্রন্থ অনুসরণ পূর্বক এ অংশ সংকলন করিয়াছিলেন । এই সকল ইতিহাসবেত্তা হিন্দুধর্ম-বিষেধী ছিলেন, তাঁহারা সরলভাবে হিন্দুজাতির গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করিতে সর্বদাই কুণ্ঠিত ছিলেন । বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্রাদিতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অধিকার ছিল না । কেহ কেহ বা হিন্দুর ইতিবৃত্ত পাঠ করিতেন ; কিন্তু তদনুগত মানবজাতির আদিবৃত্তান্ত এসলাম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহা তাঁহারা ধর্মবিষয়ক সমদর্শিতার অভাবে

গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে মোসলমান লিখিত হিন্দুযুগের বিবরণ অসম্পূর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল। তাদৃশ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ফেরিস্তা যে নানারূপ ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাহা বিদ্যুন্মাত্রও বিচিত্র নহে।

মোসলমানযুগের আরম্ভ হইতেই ফেরিস্তার ইতিহাসের উৎকর্ষের সূচনা। ফেরিস্তা খ্যাত ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণস্বল তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসে শাখা-মোসলমান রাজবংশসমূহের বিবরণও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকর্তা যে অবস্থায় ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাদৃশ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিবার পক্ষে অসুকূল ছিল। ফেরিস্তা ভূমিকার লিখিয়াছেন যে, তিনি ৩৫ খানি বিভিন্ন ইতিহাস হইতে প্রচলিত পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু পুস্তকের গর্ভে আরও বহুসংখ্যক ইতিহাসের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফেরিস্তা এই সকল গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য ঘটনা সকল এমন সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন করা অনাবশ্যক। এজন্য ফেরিস্তা যে সকল গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। একস্থানে সমুদায় মোসলমান ইতিহাসের সারসংগ্রহ প্রদান করাতে যেমন একদিকে সুবিধা হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে উহাতে কিয়ৎ পরিমাণে দোষের স্পর্শও ঘটিয়াছে। তথ্যের পর তথ্য উপর্যুপরি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; এজন্য ঘটনাসমূহ উপযুক্ত সমালোচনা সহকারে পরিব্যক্ত না হওয়াতে কোন কোন অংশ প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও প্রাক্কল হইতে পারে নাই।

ফেরিস্তার ইতিহাস অন্যান্য মোসলমান ইতিহাস-লেখকগণের ইতি-

হাসের ঋায় পক্ষপাত অথবা কুসংস্কারহীন নহে ; এমন কি, তিনি যে
রপতির অনুমতানুসারে ও অর্থসাহায্যে গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাঁহা-
ও অথবা তোষামোদবাক্যে লেখনীর অপব্যবহার করেন নাই । কিন্তু
সম্রাটুল সম্বন্ধে কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার সময় ধর্মবিদ্বেষের হাত
ইতে একবারে পরিত্রাণলাভ করিতে পারেন নাই, এবং মোসলমান
সত্ত্ব কর্তৃক নির্দোষ হিন্দুগণের রক্তপাতের বর্ণনাতেও কিয়ৎ পরিমাণে
গাড়ামি প্রদর্শন করিয়াছেন । তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই
ই বিষয়েই তাঁহার অপরাধ তদীয় স্বধর্মাবলম্বিগণের সঙ্গে তুলনার
নামান্ত । শ্রীযুক্ত ডো সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থই নির্দেশ করিয়া-
ছেন,—“বোধ হয় তিনি ধর্ম সম্বন্ধে বৈরাগ্য পক্ষপাতশূন্য ছিলেন, রাজ-
নতিক তোষামোদ অথবা ভয় সম্পর্কেও তত্ত্বল্য নির্দোষ ছিলেন ।
তিনি প্রত্যেক সংকার্য্যের তদুপযুক্ত প্রশংসা না করিয়া কখনও কাস্ত
কিতেন না, অথবা কেহ কোন অপকর্ম্ম করিলে, অনুরূপতা সর্ব্বাপেক্ষা
উচ্চ পদস্থই হউন না কেন, তাহার যথোপযুক্ত নিন্দা না করিয়া বিরত
হইতেন না ।”

শ্রীযুক্ত ডো সাহেব ১৭৬৭—৭২ খৃষ্টাব্দে ফেরিস্তার ইতিহাসের
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন । কিন্তু সে অনুবাদ
সম্পূর্ণ মূলানুগত হয় নাই । পারসী পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ সম্বন্ধে
যে সকল মহাত্মা অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডো
সাহেব একজন ; সে জন্য তদীয় গ্রন্থে ভুলভ্রান্তি থাকি কিয়ৎ পরিমাণে
স্বাভাবিক । কাপ্তেন স্কট সাহেব দক্ষিণাপথের বিবরণাংশের অনুবাদ
প্রচার করিয়া ঐতিহাসিক সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । জেনারেল
বগন্ সাহেব চারিখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার
দান করিয়া অক্ষর কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন । ইংরাজী অভিজ্ঞ

পাঠকগণ বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে ভারতীয় মোসলমান শাসনের যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন, তৎসমুদায়ই ত্রিগম্ সাহেবের গ্রন্থে এক স্থানে সম্মিলিত আছে। ত্রিগম্ সাহেব আবশ্যকীয় তথ্যপূর্ণ কয়েকটি পরিশিষ্ট মূল গ্রন্থের অশ্রুবাচ্যের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।

খাফি খাঁ ।

মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণবিকাশকালে বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক তাহার পৌরবশ্যিত শাসন বিবরণ কীর্তন করিতে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিকগণ মধ্যে শীর্ষোক্ত খাফি খাঁ একজন প্রধান ব্যক্তি। তৎপ্রণীত ইতিহাস তাহার সারল্য ও ঘটনার পক্ষপাতশূন্য বিশদ বর্ণনার পাঠকবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঈদৃশ ইতিহাস-প্রণেতার জীবনের আখ্যান জানিবার জন্য স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মে। কিন্তু সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার কোন উপায় নাই। গ্রীষ্মক ডোসন বহু অশ্রুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিতে পারেন নাই।

প্রাণ্ডক্ত ঐতিহাসিকের নাম মোহাম্মদ কানিম। খাফি খাঁ উপাধি মাত্র। খাফি খাঁ দিল্লীর এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তদীয় পিতা খাজে মীর রাজকুমার মুরাদবক্সের অধীনে কোন বিশিষ্টকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুরাদবক্সের ভাগ্যচক্র নিম্নগামী হইলে খাজে সাহেব আওরঙ্গজেবের অধীনে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খাফি খাঁও তাঁহার অধীনেই শিক্ষানবিশী করেন, পাদশাহ তাঁহার গুণবাহি সন্দর্শন করিয়া একান্ত প্রীত হন, এবং তাঁহাকে সৈন্য ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত উচ্চ কার্যে নিযুক্ত করেন। খাফি খাঁর পিতা ইতিহাস-রসিক ছিলেন; ইতিহাস রচনার তাঁহার বখেটে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। পিতার গুণ পুত্রও বর্তিরাছিল। খাফি খাঁ সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া আওরঙ্গজেব পাদশাহের রাজত্বের ইতিহাস রচনার মনঃসংযোগ করেন; কিন্তু এ কার্যে

প্রবল অস্ত্রায় উপস্থিত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব কুটিলহৃদয় শাসন-পতি ছিলেন। তাঁহার কার্যাবলী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করিয়া কেহ লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থিত করে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। একান্ত তিনি তাঁহার রাজত্বের কোনরূপ বিবরণ সংগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করেন। কিন্তু খাফি খাঁর উৎসাহনীর প্রকৃতি তাদৃশ প্রবল বাধাতেও দমিত হয় নাই। তিনি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় ভদ্রীয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে খাফি খাঁ নিজে যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাঁহার সারমর্ম প্রদান করিতেছি।

“রাজত্বের দশম বর্ষ অতিবাহিত হইলে পাদশাহ লেখকদিগকে তাঁহার শাসনকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও কতিপয় যোগ্য লেখক নিরস্ত হন নাই। এই সকল লেখকের মধ্যে মুস্তাইদ খাঁ ও বৃন্দাবনের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুস্তাইদ খাঁ অতি সংগোপনে দক্ষিণাপথের সংক্ষিপ্ত বৃদ্ধবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ দেশ ও দুর্গজয়ের কথাতেই পরিপূর্ণ, তাহাতে যুদ্ধকালে পাদশাহকে যে সকল দুর্দশার পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বৃন্দাবনের গ্রন্থে পাদশাহের রাজত্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশ বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাদশাহের রাজত্ব ন্যূনাধিক পঞ্চাশবৎসর স্থায়ী ছিল। প্রথম দশ বৎসরের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু অবশিষ্ট চল্লিশ বৎসরের সুখানুপুখ্য বিবরণ আমি কোন স্থানে দেখি নাই। পাদশাহের রাজত্বের দ্বিতীয় দশ বৎসরের বিবরণ সন তারিখ নিরূপণ অস্তে ধারাবাহিক-রূপে মদীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই। তাঁহার পরবর্তীকালের বিবরণ আমি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে সরকারী কাগজপত্র খাঁটির ও

শাদশাহের বিশ্বাসভাজন পুরাতন ভৃত্য এবং অন্যান্য শ্রেণীর সত্যবাদী ব্যক্তিদিগকে ছিঙ্কাসাবাদ করিয়া উদ্ধার করিয়াছি। এই সকল বিবরণ ও নিজে পূর্ণবয়স্ক হইলে অভিজ্ঞতাবলে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আপন স্মৃতিভাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এক্ষণ তৎসমুদায় লোকসমাজে প্রকাশ করিলাম।”

আওরঙ্গজেব তাঁহার শাসনকালের ইতিহাস রচনা করিতে নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিদশ কার্য্য ইতিহাস রচনার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল ; এবং তজ্জন্তু তাহা চিরকালই অপূর্ণার্থ্য বলিয়া নিন্দনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অপকার্য্যের অভ্যন্তরেও মঙ্গলের বীজ লুক্কায়িত ছিল। খাফি খাঁর ইতিহাস গোপনে সংকলিত হইয়াছিল বলিয়াই উহা তাদৃশ পক্ষপাতশূন্য বর্ণনায় পরিপূর্ণ। খাফি খাঁর গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন স্থানে আওরঙ্গজেবের শাসনকালের বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ, তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতশূন্য বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াই কীর্ত্তিমন্দিরে স্থানলাভ করিয়াছিলেন।

খাফি খাঁর গ্রন্থের নাম মুস্তা খাব-উল-লুবাব। তিনি উপক্রমণিকায় মোগল জাতির আদি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ; পরগণের নোয়ার জন্মকালে ইহার সূচনা ও বাবরের ভারতাক্রমণের প্রাক্কালে ইহার পরিসমাপ্তি। এই অংশে ঘটনাবলীর কেবলমাত্র রেখাপাত করা হইয়াছে। খাফি খাঁ মূলগ্রন্থের প্রথম ভাগে বাবর কর্ত্ত্বক ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রদান করিয়া হুমায়ূন ও আকবরের রাজত্বের ইতিহাস সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আকবরের পরলোকগমনের পর হইতেই বিস্তৃত বিবরণের আরম্ভ।

মোহাম্মদ শাহের রাজত্বের একাদশ বর্ষে মুস্তাখাব-উল-লুবার সমাপ্তি হয়। গ্রন্থসমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাসমূহও বর্ণিত হইয়াছে। খাফি খাঁ বহুযত্নে ও পরিশ্রমে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া মোহাম্মদ শাহকে উপহার প্রদান করেন। তিনি এই গ্রন্থপাঠে একান্ত প্রীতিনাভ করিয়া হকুমতকে খাফি খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন।

খাফি শব্দের অর্থ গুপ্ত। খাফি খাঁ গোপনে ইতিহাস সংকলন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে এই উপাধিপ্রদান করা হয়; তাঁহার রবর্তী ইতিহাসিকগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় ইতিহাসিকগণেরও এই মত। কিন্তু সুবিখ্যাত ডোসন সাহেব অন্যরূপ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে খাফি শব্দ খাফি খাঁর পূর্বপুরুষগণের যদি নিবাসভূমির নির্দেশ করিতেছে। খোরসানের একটি বিভাগের নাম খাফি; এইস্থান প্রসিদ্ধ নিশাপুরের নিকটবর্তী। খাফি শব্দ খাঁর অনেক ব্যক্তির নামের সঙ্গে জড়িত দেখা গিয়াছে। শেখ জিয়া উদ্দীন খাফি, ইমাম খাফি প্রভৃতি নাম প্রসিদ্ধ। ডোসন সাহেব বলেন, খাফি খাঁ খাফি ভাবে (সংগোপনে) গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন; একান্ত খাফি নাম সার্থক বলিয়া রহস্য করা মোহাম্মদ শাহের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

মুস্তাখাব-উল-লুবার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু এপর্যন্ত তাহার কোন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর যত্নে ও উদ্যোগে মূল পারসী গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ডোসন সাহেব ভারত ইতিহাস সংগ্রহ নামক পুস্তকে কিয়দংশের অনুবাদপ্রদান করিয়াছেন। মেজর গর্ডন নামক একজন সৈনিক পুরুষ মুস্তাখাব-উল-লুবার গ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মহাত্মা এল-ফনষ্টোন এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া আওরঙ্গজেবের বিবরণ সংকলন

করিয়া খীর ইতিহাসে প্রদান করেন। কিন্তু হুতাম্বা যশতঃ গর্ডন সাহেব এই অনুবাদ মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন নাই ; এতৎ উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গোলাম হোসেন ।

প্রবল প্রতাপ পাদশাহ আওরঙ্গজেবের পরলোকগমনের পর হইতে সুবিশাল যোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। বহুসংখ্যক ইতিহাস-লেখক যোগলের এই অধঃপতনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ইতিহাস-লেখকের মধ্যে খীর গোলাম হোসেন খাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ।

- গোলাম হোসেন অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গোলাম হোসেনের পিতা হিদারত আলী খাঁ বাঙ্গলার নবাব আলীবর্দী খাঁর পরমাত্মীয় ছিলেন। আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে তিনি বিহারের সহকারী শাসন কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় তদীয় পুত্র গোলাম হোসেন শাহজাহানাবাদে অবস্থিতি করিতেন। কোন কারণে আলিবর্দী খাঁর সঙ্গে মনোমালিখ উপস্থিত হওয়াতে হিদারত আলী খাঁ বিহারের কার্য পরিত্যাগ পূর্বক দিল্লীতে গমন করেন। এই সময় গোলাম হোসেন খাঁ শাহজাহানাবাদ হইতে বিহারে আগমন করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে তিনি বিহারে অবস্থান না করিয়া পূর্ণিয়ার আলিবর্দী খাঁর জামতা সৈয়দ আমেদের নিকট গমন করেন। দিল্লীর পাদশাহ হিদারত আলী খাঁকে পাণিপথ ও সোনপথের কৌশলদায় নিযুক্ত করেন। আলীবর্দী খাঁ ইহলোক হইতে অপমৃত হইলে বঙ্গদেশে রাজ-বিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং সে বিপ্লবে আলীবর্দীর বংশের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। একারণ গোলাম হোসেন দিল্লীতে গমন করেন। এই সময় দিল্লীর রাজশক্তি নিরতিশয় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল।

শাহ আয়েদ শাহের কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। অমাত্য গাজি উদ্দীন সর্বেসর্ব্বা ছিলেন। গাজি উদ্দীন শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা গ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, পাদশাহ এবং রাজকুমারগণের সঙ্গেও নানাপ্রকার দুর্ব্যবহার করিতেন। একারণ জ্যেষ্ঠ রাজকুমার আলীগহের (পরে শাহ আলম) কোশলে তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে বাত্মা করেন। এই সময় হিয়াদত আলী খাঁ মিরবকীর এবং গোলাম হোসেন মির মুনশীর পদগ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্ভিাব্যাহারী হন। কিন্তু শাহ আলমের আর্থিক অবস্থা অচিরে প্রত্যন্ত অসচ্ছল হইয়া উঠাতে তাঁহারা কার্য্য পরিত্যাগ করেন। অতঃপর হিয়াদত আলী খাঁ বিহারের অন্তর্গত স্বীয় জায়গীরে বাস করিতে থাকেন, এবং গোলাম হোসেন মুন্সেরে গমন করেন। গোলাম হোসেন মুন্সেরে উপনীত হইলে নবাব মীর কাসিম তাঁহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা প্রেরণ করেন। এই সূত্রে তিনি ইংরেজ চারিগণের সঙ্গে পরিচিত হন। অচিরে তাঁহার সঙ্গে ইংরেজ কন্সল চারিগণের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। একারণ, মীর কাসিম তাঁহাকে প্রমুখ্যত্ব করেন। ইহার পর তিনি ইংরেজের অধীনে নানা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি জেনারল গোভার্ডের সঙ্গে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। গোলাম হোসেন জেনারলের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি জেনারলের নিকট যথোচিত অনুগ্রহলাভ করিতেন।

কলিকাতা সহরে অবস্থিতিকালে গোলাম হোসেন স্বীয় চিরখ্যাত ইংহাস প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা ভূমিকা হইতে ইংরাজ উদ্ধৃত করিতেছি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতে কেহ ইংরাজের রাজত্বগণের ইতিহাস প্রণয়ন না করার আমি নিজে যাহা

অবগত আছি, অথবা বিশ্বাসযোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। যদি পরবর্তীকালে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রাচীন ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে অতিনাশী হন, তবে যেন তিনি পূর্ব সময়ের সহিত আধুনিক সময়ের যোগস্থত্র ছিন্ন দেখিতে না পান, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। অতএব ঐশ্বরিক কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাই কোন প্রকার আড়ম্বর না করিয়া সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিব। যদি আমার কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি হয়, তবে আমার কৈফিয়ৎ স্পষ্ট; যাহারা আমাকে ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা ই দায়ী।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে গোলাম হোসেনের ইতিহাস সমাপ্ত হয়। তিনি স্বীয় গ্রন্থের নাম সায়ের মুতাকরিণ রাখেন। সায়ের মুতাকরিণ শব্দের অর্থ আধুনিক সময়ের দৃশ্য। সায়ের মুতাকরিণে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা ক্যাডে, এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণের প্রথম পৃষ্ঠার সূচীর অনুবাদ প্রদান করিতেছি। সায়ের মুতাকরিণ অর্থাৎ আধুনিক কালের ইতিহাস। এ গ্রন্থে ১১১৮ হিজিরী সন হইতে ১১৯৪ হিজিরী সন পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুস্থানের শেষ সাতজন সম্রাটের বিবরণ সাধারণ ভাবে ও বঙ্গদেশে ইংরেজদের যুদ্ধের বিবরণ বিশেষভাবে এবং তদনুসঙ্গক্রমে বাঙ্গলা ও অযোধ্যার শেষ রাজবংশসম্বৃত সিরাজদৌলা এবং সুজাদৌলার পারিবারিক বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল বিবরণের সঙ্গে প্রত্নকর্তা ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ গবর্ণমেন্টের ও তাহার রাজনীতির সমালোচনা মূলক বিবরণ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

এই বৃহদায়তন ইতিহাসের বাঙ্গলার অংশই সর্বোৎকৃষ্ট, এবং এই অংশ
কুরিয়াই গোলাম হোসেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । শ্রীযুক্ত ডোসন
লিখিয়াছেন, গ্রন্থকর্তা যেক্ষণ নিরপেক্ষতা এবং তেজস্বিতা সহকারে
এবং সরল ভাষায় অত্যাৱশ্যকীয় ঘটনাসমূহের বর্ণনা কুরিয়াছেন,
ইউরোপীয় ঐতিহাসিক কুলেও ছল্লভ । বিগ্রস্ সাহেব লিখি-
য়াছেন, এই ইতিহাস সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনবৃত্তের প্রণালীতে
লিখিত হইয়াছে । এই প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হইলেই সর্বাপেক্ষা
স্বাভাৱিক ও সুখপাঠ্য হয় । মোসলমানের ধর্ম ও স্বভাব-সুলভ দোষ-
গুণি বাদ দিলে আমরা ইহার কোন অংশই ইউরোপের এই প্রণালীতে
ইতিবৃত্ত অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ করি না । ডক ডিসালি,
ক্লরেনডন্ অথবা বিশপ বারনেটও ঈদৃশ রচনাপ্রকাশ করিতে
ক্ষম্য হইতেন না ।

হাজি মুস্তাফা নামক একজন ফরাসী ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সায়ের মুতা-
ফার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন । হাজি মুস্তাফার প্রকৃত
নাম রমণ । রমণও স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া
ইসলাম ধারণ করিয়াছিলেন । হাজি মুস্তাফার পরে বিগ্রস্ সাহেব
সুতাকরিণের কিয়দংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন । এই
উক্তক অনুবাদই এতদিন ছাপা পাই ছিল । সম্প্রতি কলিকাতার ক্যাম্ব্রি
এণ্ড কোম্পানী হাজি মুস্তাফার অনুবাদের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ
করিয়া ঐতিহাসিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন ।



